কুয়াশার রাগ

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

শেখর বসু

প্রীতিভাজনেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

নাগমিথুন

নটী নয়নতারা

সূত্রপাত

জয়দীপ অভ্যাসমতো খুব ভোরে ময়দানে জগিং করতে এসেছিল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতার বুকের ভেতরটা তত কিছু ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু ময়দানের খোলামেলায় শীতের মুখোমুখি পড়তে হয়। এ দিন কুয়াশাও ছিল ঘন।

অন্যদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনাসামনি কোথাও গাড়ি রেখে জয়দীপ ময়দানে যায়। আজ সে গেল রেড রোডে।

গত দু'দিনই কিছু বিরক্তিকর ঘটনা ঘটেছে। এক ধরনের টিজিং বলা চলে। পরনে নীলচে রঙের হাফস্লিভ ব্যাগি সোয়েটার এবং জিন্‌স্‌, গলায় সোনালি চেন, মাথার লম্বা চুল ঘাড়ের কাছে গোছা করে বাঁধা এক যুবক জয়দীপের সঙ্গে বেয়াড়া রসিকতা করেছে। জগিংয়ের সময় কখনও সে জয়দীপের প্রায় পিঠের কাছে, কখনও তার পাশাপাশি, আবার কখনও হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে এক চক্কর ঘুরে আবার পাশে চলে এসেছে। বিশেষ করে পাশাপাশি দৌড়নোর সময় জয়দীপের গা ঘেঁষে চলে আসা বেশি বিরক্তিকর।

জয়দীপ শান্তশিষ্ট ভদ্র প্রকৃতির বলেই কোনও প্রতিবাদ করেনি। গতকাল একবার শুধু বলেছিল, 'কী হচ্ছে?'

'লেট্‌স্‌ হ্যাভ ফান, ম্যান?'

তারপর আর কোনও কথা নয়। বিরক্ত জয়দীপ তার গাড়ির কাছে ফিরে গিয়েছিল। ইংরেজি উচ্চারণ শুনে এবং চেহারা দেখে জয়দীপের মনে হয়েছিল যুবকটি সম্ভবত অ্যাংলোইণ্ডিয়ান। জয়দীপের চেয়ে ফর্সা চামড়া। কিন্তু একটু পোড়খাওয়া, রুক্ষ, লাবণ্যহীন। চোখের দৃষ্টিতে কৌতুকের আড়ালে কেমন যেন নিষ্ঠুরতা ওত পেতে আছে। একটু গা ছমছম করছিল জয়দীপের।

আজ রেড রোডে পৌঁছে গাড়ি ঘুরিয়ে ময়দানের দিকের ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড় করাল জয়দীপ। তারপর চাবি এঁটে বাঁদিকে ময়দানে গেল। জগিং শুরু করল। এদিকটাতেও স্বাস্থ্যকামীদের আনাগোনা আছে। ঘন কুয়াশার ভেতর কাছে ও দূরে সঞ্চরমান কিছু ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল তার। প্রায় মিনিট কুড়ি একটানা দৌড়নোর পর শরীরে উষ্ণতা ফিরে এল। জয়দীপ রেড রোডের দিকে সারবন্ধ গাছের কাছাকাছি একটু থামল। তখনই তার চোখে পড়ল গাছের নিচে শুকনো নালায় একটা মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে আছে।

এভাবে মোটরসাইকেল রাখাটা অদ্ভুত। ফুটপাতের ধার ঘেঁষে এবং ওপরেও কিছু গাড়ি ও মোটরবাইক রাখা আছে। কিন্তু নালায় ওটা রাখার মানে কী? বেশি সতর্কতা?

তবে এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মানে হয় না। জয়দীপ আর এক চক্কর

দৌড় শুরু করল নালার সমান্তরালে। প্রায় শ'দুই মিটার দৌড়নোর পর হঠাৎ সে দেখল সেই বখাটে যুবকটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কুয়াশার মধ্যেও চিনতে ভুল হয়নি জয়দীপের। জয়দীপ বাঁদিকে ঘুরল কিন্তু ততক্ষণে যুবকটি তার পাশে এসে গেছে।

আজ জয়দীপ বেয়াদপি বরদাস্ত করতে পারল না। সে থমকে রুখে দাঁড়াল ঘুঁষি মারার জন্য। অমনই তার ক্লান্ত ও স্পন্দিত হৃদ্‌পিণ্ডে একঝলক রক্ত উপচে এল যেন।

যুবকটির হাতে ছোরা।

সে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে জয়দীপ মাথার ঠিক রাখতে পরল না। আশেপাশে মানুষজন ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু কুয়াশার জন্যই কেউ হয়তো সন্দেহজনক কিছু ঘটতে দেখছে না। জয়দীপ তার গাড়ি লক্ষ্য করে দৌড়তে থাকল। এই দৌড় জগিং নয় প্রাণভয়ে ছুটে পালানো।

যুবকটি তাকে অনুসরণ করেছে।

জয়দীপ এক লাফে নালা পেরিয়ে ফুটপাতে পেঁছিল। আততায়ী তখন তার পিছনে কয়েক'হাত দূরে। ঘুরে দেখামাত্র দিশেহারা জয়দীপ রেড বোডে গিয়ে পড়ল।

তারপরই ঘটে গেল একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। ব্রেকের কুৎসিত ও বিপজ্জনক শব্দ স্তব্ধতা খান খান করে ফেলল।

এই রাস্তায় সব গাড়িই দ্রুত যাতায়াত করে। কুয়াশার জন্য ভোরে সব গাড়িরই হেডলাইট জ্বলে। যে গাড়িটা জয়দীপকে ধাক্কা দিল, তার কোনও আলো ছিল না এবং সেটা একটা ট্রাক। জয়দীপের শরীর ছিটকে গিয়ে পড়ল ফুটপাতের ওপর। ট্রাকটা কুয়াশার মধ্যে দ্রুত উধাও হয়ে গেল।

শব্দটা শুনেই স্বাস্থ্যকামীদের অনেকে চমকে উঠেছিল। তারা হইচই করে দৌড়ে এল। সেই যুবকটি তখন জয়দীপের থ্যাঁতলানো রক্তাক্ত শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। কেউ কেউ দাঁড় করানো গাড়িগুলোর কাছে ছুটে গিয়েছিল। জয়দীপকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাভাবিক মানবিক আকুতিতে। কিন্তু সব গাড়িই লক করা। একটা গাড়িতে ড্রাইভার ছিল। কিন্তু তাকে টলানো গেল না। তার মালিক ময়দান থেকে না ফেরা পর্যন্ত কিছু করার নেই। চাকরি চলে যাবে।

জয়দীপের গাড়ির পেছনে একটা গাড়ি ছিল। এই গাড়িতে ছিলেন এক প্রৌঢ় এবং একজন যুবক। যুবকটি ছিল স্টিয়ারিঙে। দুর্ঘটনার ব্যাপারটা বুঝতে তাঁদের একটু সময় লেগেছিল। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ় বলে উঠেছিলেন, 'কুইক! কুইক! হাঁ করে কী দেখছ?'

গাড়িটা জোরে এগিয়ে জয়দীপের কাছে পৌঁছল। তারপর যুবকটি বলে উঠল, 'বব চলে যাচ্ছে!'

'ওকে ফলো করো!'

বব ভিড় থেকে বেরিয়ে জগিংয়ের ভঙ্গিতে নালায় রাখা মোটরসাইকেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় গাড়ির হর্ন এবং 'বব' ডাক শুনে সে এক লাফে মোটরসাইকেলে চেপে বসল। তারপর স্টার্ট দিয়ে সোজা ময়দানে উঠল। তারপর উধাও হয়ে গেল।

প্রৌঢ় লোকটি খাপ্পা হয়ে চাপা গর্জন করলেন, 'নেমকহারাম! বিশ্বাসঘাতক!'

'তার হাতে রিভলভার ছিল। যুবকটি বলল, 'আর্মস্ লুকিয়ে ফেলুন স্যার! পেছনে পুলিশের গাড়ি এসে গেছে।'

পুলিশের একটি পেট্রলভ্যান ততক্ষণ দুর্ঘটনার জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেছে। সার্জেন্ট ভদ্রলোক ট্রাকের নাম্বার নেওয়া হয়নি শুনে রুষ্টমুখে বললেন, 'আপনাদের সিভিক সেন্স নেই বলেই তো—বেঁচে আছে, না মরে গেছে?'

একজন অভিজাত চেহারার ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বললেন, 'এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। পি জি-তে নিয়ে যান। মনে হচ্ছে এখনও মারা যায়নি।'

কনস্টেবলরা এবং ভিড়ের কিছু লোক ধরাধরি করে জয়দীপের শরীরটাকে পুলিশ ভ্যানের খোঁদলে তুলে দিল। পুলিশ ভ্যান পি জি হাসপাতালের দিকে চলে গেল। সার্জেন্ট নোটবই বের করে প্রত্যক্ষদর্শীদের স্টেটমেন্ট নিতে থাকলেন।

সেই গাড়িটি ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। প্রৌঢ় লোকটি সমানে ক্রুদ্ধ ও চাপা গর্জন করছেন। যুবকটি বলল, 'আমি ভাবতেই পারিনি বব এমন করবে। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে বজ্জাতটা কিছু আঁচ করেছিল।'

প্রৌঢ় লোকটি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'দ্যাট্স্ অ্যাবসার্ড্। তুমি যদি ওকে কিছু দৈবাৎ মুখ ফসকে বলে থাকো!'

'কী বলছেন স্যার? আমি শুধু ওকে—'

'থামো! এখন বলো, শুয়োরের বাচ্চা মোটরসাইকেল পেল কোথায়?'

'সেটা জানতে দেরি হবে না স্যার! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'ওর ডেরা তো তুমি চেনো?'

'চিনি। ওর বন্ধুদেরও চিনি।'

'কাজটা তুমিই ওকে দিয়েছিলে মাইন্ড দ্যাট। তোমারই সব দায়িত্ব।'

'নিশ্চয়। আপনি ভাববেন না।'

গাড়ি বাঁদিকে বাঁক নেওয়ার পর প্রৌঢ় বললেন, 'পি জি হয়ে চলো।

জয়দীপ ব্যানার্জিকে একবার দেখে সিওর হতে চাই, বব সাকসেসফুল হয়েছে কিনা! বুঝতে পেরেছ? আমরা জয়দীপের আত্মীয় কেমন?'······

॥ এক ॥

'ম্যান ক্যান নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন!' আমার প্রাজ্ঞ বন্ধু তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন। 'মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না। কথাটা কার বলো তো জয়ন্ত?'

বললাম, 'হঠাৎ এ কথা কেন?'

'তুমি সাংবাদিক। এই ঐতিহাসিক উক্তি কার তা তোমার জানা উচিত ছিল। তা ছাড়া আজকাল যা লক্ষ্য করছ, সাংবাদিকরা যেন একেকটি আস্ত এনসাইক্লোপিডিয়া।' বলে উনি কফিতে চুমুক দিলেন। মুখে সৌম্য-শান্ত ঋষিতুল্য আদল। তারপর একটু হাসলেন। 'কথাটা যীশু খ্রিস্টের। মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না।'

'কর্নেল! আমি সিওর আপনি আজ সকাল-সকাল খুব তৃপ্তি সহকারে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছেন।'

'ঠিক বলেছ ডার্লিং!'

'আপনার আজ যে-কোনও কারণে হোক, বড্ড বেশি খিদে পেয়েছিল।'

'হুঁউ। ঠিক বলেছ।'

'হাই ওল্ড ম্যান! এ বয়সে নতুন করে জগিং শুরু করেননি তো? বিশেষ করে এ বছর কলকাতায় খ্রিসমাসের সঙ্গে শীতটাও প্রচণ্ড ভাবে এসে গেছে।'

কর্নেল মাথা দোলালেন। 'নাহ্ জয়ন্ত! গোয়েন্দাগিরিতে তুমি বরাবরই কাঁচা। একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যাও। আমাদের হালদারমশাই হলে এতক্ষণ ঠিকই ধরে ফেলতেন।' বলে উনি কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন। 'তোমার জানা উচিত কলকাতায় আমি কদাচ মর্নিংওয়াক করি না। ততক্ষণ আমাকে ছাদের বাগানে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়।'

'তা তো রোজই করেন। তাতে এমন কিছু সাংঘাতিক খিদে পায় না যে ছাদ থেকে নেমে এসেই ষষ্ঠীকে ব্রেকফাস্টের টেবিল—'

'ওয়েট, ওয়েট!' কর্নেল হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর চোখ বুজে চুরুটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। একটু চুপচাপ থাকার পর বললেন, 'ছাদের বাগানে বিচ্ছিরি রকমের জঞ্জাল জমে ছিল। আজ ষষ্ঠীকে নিয়ে সব সাফ করেছি। তো হ্যাঁ—তুমি ঠিকই ধরেছ। সকালের দিকে খাটা-খাটুনিতে খিদেটা বেশ বেড়ে যায়। আর্মি লাইফের কথা মনে পড়ছিল।'

এবার ওঁর সামরিক জীবনের চর্বিতচর্বণ শোনার আশঙ্কায় ঝটপট বললাম,

'কিন্তু যীশু খ্রিস্টের কথাটা এতে আসছে কেন?'

'ব্রেকফাস্টের সময় কথাটা মাথায় এল। অমনই মনে হলো, যীশু খ্রিস্টের প্রখ্যাত এই উক্তির অন্য একটা দিকও আছে। মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না, তা ঠিক। কিন্তু রুটি না খেলেও তো মানুষ বাঁচে না! দিস ইজ মোর ফান্ডামেন্টাল জয়ন্ত! আগে রুটি, তারপর অন্য কিছু। তাই না?'

ওঁর গাম্ভীর্য দেখে হেসে ফেললাম। 'ও বস! আপনি এতদিনে রাজনীতিতে নাক গলাতে যাচ্ছেন না তো? আজকাল রাজনীতি ভীষণ বিপজ্জনক।'

'জয়ন্ত! রাজনীতি যত বিপজ্জনক হয়ে উঠুক না কেন রুটির জন্য—হ্যাঁ, আবার বলছি, বেঁচে থাকার এই ফান্ডামেন্টাল কারণের জন্য যা খুশি করা উচিত। যারা তা করে, করছে বা করতে চায়, আমি তাদের সঙ্গে আছি। হোয়াই নট? অস্তিত্ব রক্ষার এ একটা নিজস্ব লজিক। আদিম লজিক।'

এই সময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল চোখ বুজে টাকে হাত বুলোচ্ছেন। গলার ভেতর বললেন, 'ফোনটা ধরো জয়ন্ত।'

ফোন তুলে সাড়া দিতেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদার ওরফে কে কে হালদার অর্থাৎ আমাদের প্রিয় হালদারমশাইয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।' 'কেডা? কর্নেলস্যাররে দিন।'

রসিকতা করে বললাম, 'বলছি।'

'নাহ্। রং নাম্বার। টেলিফোনেরে ভূতে ধরছে।'

দ্রুত বললাম, 'আপনি কত নাম্বার চাইছেন?'

হালদারমশাই কর্নেলের নাম্বার আওড়ে বললেন, 'আপনার নাম্বার কত?

'যে নাম্বার চাইছেন।'

'অ্যাঃ! কন কী? কিন্তু আপনি কর্নেল স্যার নন। ষষ্ঠীও না। কেডা?'

'আপনি তো বিচক্ষণ ডিটেকটিভ। বলুন!'

এবার ওঁর অনবদ্য খি খি হাসি ভেসে এল। 'তাই কন! জয়ন্তবাবু? কী কান্ড! আসলে আমার মাথা বেবাক গন্ডগোল হইয়া গেছে। মাইনষে রুটি খায়। রুটি মাইনষেরে খাইলে কী হয় বুঝুন!'

অবাক হয়ে বললাম, রুটি? তার মানে, ম্যান ক্যান নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন—'

'কী কইলেন, কী কইলেন?'

'এখনই কর্নেল কথাটা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।'

'কন কী? আমার ক্লায়েন্ট তা হলে আগে ওনারে অ্যাপ্রোচ করছিল।'

'ব্যাপার কী হালদারমশাই? কেসটা কি রুটিঘটিত?'

'জয়ন্তবাবু! প্লিজ কর্নেলস্যাররে দিন।'

কর্নেলের দিকে ঘুরতেই উনি তুম্বোমুখে বললেন, 'ওঁকে এখনই আমার

কাছে আসতে বলো। ওঁর ক্লায়েণ্টকে যেন সঙ্গে আনেন।'

হালদারমশাইকে কথাটা জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, 'আধঘণ্টার মধ্যে যাইতাছি। জয়ন্তবাবু! হেভি মিস্ট্রি। কর্নেলস্যাররে কইবেন য্যান।'

ফোন রেখে বললাম, 'মাই গুডনেস! আপনি তাহলে একটা রুটিসংক্রান্ত রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তাই রুটি নিয়ে অতক্ষণ গুরুগম্ভীর বুকনি? ছাদের বাগানের জঞ্জাল সাফ এবং প্রচণ্ড খিদে পাওয়া—ওঃ কর্নেল! হেঁয়ালি করার এই অভ্যাসটা সত্যিই মাঝে মাঝে আমার বড্ড খারাপ লাগে।'

'হেঁয়ালি?' কর্নেল ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। 'না জয়ন্ত! তোমার বোঝা উচিত, রুটি কথাটা আসলে খাদ্যের প্রতীক। প্রাণীমাত্রের বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য চাই-ই। আজ ব্রেকফাস্টের সময় এই কঠিন সত্যটা নতুন করে আমাকে ভাবিয়েছে। যাই হোক, হালদারমশাইয়ের জন্য অপেক্ষা করা যাক।'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ব্যাপারটা কাকতালীয় বলে মেনে নিতে পারছি না কিন্তু।'

আমার প্রাজ্ঞ বন্ধু একটু হেসে বললেন, 'না। একেবারে কাকতালীয় নয়। খাদ্য এবং খিদে সম্পর্কে আমার নতুন উপলব্ধির পেছনে আজকের কাগজের একটা খবরও দায়ী। তবে তুমি নিজে সাংবাদিক হয়ে সংবাদপত্র খুঁটিয়ে পড়ো না এটাই সমস্যা। হ্যাঁ—তোমার এ বিষয়ে বক্তব্য আমার জানা। কাজেই তা আর ব্যাখ্যা করতে বলছি না। সত্যিই তো! কাগজে কত কিছু ছাপা হয় সবই খুঁটিয়ে পড়ার মানে হয় না। কিন্তু মজাটা হলো, হেলাফেলা করে ছাপা একরত্তি কোনও খবরের আড়ালেও অনেক গুরুতর সত্য থাকে।'

'খবরটা কী বলুন তো?'

কর্নেল কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন ইউরোপীয় ভঙ্গিতে। 'কাটিং রাখিনি। এই তো কাগজগুলো টেবিলে পড়ে আছে।'

'আহা! মুখেই বলুন না!'

'কাল বিকেলের ঘটনা। একটা লোক দৌড়ে এসে আচমকা একটা দোকান থেকে একপাউণ্ড সাইজের পাঁউরুটি তুলে নেয়। দোকানদার পয়সা চাইলে সে গ্রাহ্য করে না। বুঝতেই পারছ, এসব ক্ষেত্রে যা হয়। বচসা, হল্লা, ভিড়। তাতে ওটা বস্তি এলাকা।'

'এটা আবার এমন কী খবর!'

'তোমাদের দৈনিক সত্যসেবকও ছেপেছে।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'জানেন তো? সাংবাদিক মহলে একটা জোক চালু আছে: আজ-কিছু-আছে-নাকি-দাদা-খবর! তার মানে, কাগজের অফিসের টেবিলে বসে পুলিশকে ফোন করে পাওয়া খবর।'

কর্নেল তেমনই গম্ভীর মুখে বললেন, 'হ্যাঁ, পুলিশ সোর্সেরই খবর।'

'লোকটা তা হলে বেপাড়ার মস্তান।'

'খবরে তা বলা হয়নি। লোকটাকে মারমুখী ভিড় ঘিরে ধরতেই সে নাকি রুটিতে কামড় দেয় এবং চিৎকার করে বলে, ম্যান ক্যান নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন। বাট ক্যান এনি ম্যান লিভ উইদাউট ব্রেড? সম্ভবত ইংরেজি শুনেই সব ভড়কে যায়। তবে বোঝা যায় দোকানদারটি জেদী এবং ঝানু। এটা মেনে নিলে ভবিষ্যতেও একইভাবে তার রুটি ছিনতাই হওয়ার আশঙ্কা আছে।'

'ঠিক ধরেছেন। তাই সে ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এই তো?'

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু কল্পনা করো জয়ন্ত তাকে যখন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখনও সে পাঁউরুটি কামড়ে খাচ্ছিল। অবশ্য পুলিশ বলেছে, রুটি ছিনতাইকারী আসলে মানসিক রোগী।'

'আপনি বলছিলেন এই খবরে গুরুতর সত্য আছে। সত্যটা কী?'

'কী অসাধারণ প্রশ্ন! ক্যান এনি ম্যান লিভ উইদাউট ব্রেড?'

'ওঃ কর্নেল! ফিলোসফির ভূতটাকে কাঁধ থেকে নামান প্লিজ!'

'ফিলোসফি নয় ডার্লিং, হার্ড ট্রুথ।' বলে কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা নোটবই বের করলেন। তারপর পাতা উল্টে দেখে টেলিফোন টেনে নিলেন। ডায়াল করে সাড়া পাওয়ার পর বললেন, 'ও সি বিনয় ঘটক আছেন নাকি?...বলুন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার কথা বলবেন।...বিনয়! কনগ্র্যাচুলেশন!...না, না। তুমি তো জানো...কবে জয়েন করছ?...ভালো খুব ভাল। তো শোনো। আজ কাগজে দেখলাম তোমার থানায় একজন রুটিছিনতাইকারীকে...হ্যাঁ, আমি ইন্টারেস্টেড। পরে বলব'খন।...বলো কী? তারপর?...হ্যাঁ, ঠিকই করেছ। ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা...জাস্ট্ এ মিনিট! লিখে নিচ্ছি।...কার্ডে নিশ্চয় ফোন নাম্বার আছে?...হ্যাঁ বলো।' কর্নেল সেই নোটবইয়ের পাতায় কোণার দিকে কার নাম-ঠিকানা টুকে নিলেন। তারপর টেলিফোন রেখে আমার দিকে ঘুরে বসলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন থানা?'

'বিনয় ঘটককে তোমার চেনা উচিত। তুমি সাংবাদিক। ডক এরিয়ায় গত বছর একটা বড় স্মাগলিং র‍্যাকেট গুঁড়িয়ে দিয়ে তুলকালাম করেছিল। শেষে সেই র‍্যাকেটের রাজনৈতিক মুরুব্বিরা ওকে সেখান থেকে হটিয়ে দিয়েছে কড়েয়া থানায়। তাতেও ক্ষান্তি নেই। নখদন্তহীন স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে প্রমোশন দিয়ে আবার সরাচ্ছে। বললাম বটে কনগ্র্যাচুলেশন, কিন্তু এই পদোন্নতির মানে একজন সৎ দক্ষ অফিসারকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দেওয়া।'

'বুঝলাম। কিন্তু এবার দেখছি রহস্য ঘনীভূত। হালদারমশাই বলছিলেন হেভি মিস্ত্রি!'

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে অভ্যাস মতো চোখ বুজে মৃদুস্বরে বললেন, 'পুলিশ কাগজকে সব কথা বলেনি। কোনও সময়ই বলে না। হ্যাঁ, রুটিছিনতাইকারীর আচরণ-হাবভাবে পাগলামি ছিল। সে একজন যুবক। বাংলা বলতে পারে না। ভাঙা ভাঙা হিন্দি জানে। ইংরেজি তার মাতৃভাষা। পুলিশের ধারণা, সে আংলোইণ্ডিয়ান এবং কলকাতায় সদ্য এসেছে। মাথায় হিপিদের মতো চুল। তাকে সার্চ করে শ'তিনেক টাকা পাওয়া যায়। হাতে দামী একটা বিদেশি ঘড়িও ছিল। অতএব পাগল। দোকানদারকে তার টাকা থেকে পাঁউরুটির দাম মিটিয়ে বুঝিয়েসুঝিয়ে বিদায় দেওয়া হয়। তারপর ডিউটি অফিসার তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে লকআপে ঢোকান। কিছুক্ষণ পরে একজন হোমরাচোমরা গোছের বাঙালি ভদ্রলোক গিয়ে হাজির। তাঁর সঙ্গে দু'জন লোক ছিল। কার্ড দেখিয়ে বলেন তিনি সাইকিয়াট্রিক ডাক্তার। তাঁর নার্সিং হোম থেকে একজন সাংঘাতিক রোগী পালিয়েছে। তার পেছনে গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করেছিলেন। রোগী যে-বস্তি এলাকায় ঢুকেছিল, এইমাত্র সেখানে তিনি খবর পেয়েছেন একজন পাগলকে নাকি এই থানায় ধরে আনা হয়েছে। রোগীর চেহারার বর্ণনাও তিনি দেন। তারপর তাঁকে লকআপে নিয়ে যাওয়া হয় রোগীকে শনাক্ত করতে। তিনি বলেন, হ্যাঁ—এই সেই রোগী।'

কর্নেল হঠাৎ চুপ করলে বললাম, 'ইণ্টারেস্টিং। তারপর?'

কর্নেল ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তাঁকে দেখামাত্র যুবকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলে, ও গড! হি হ্যাজ কাম টু কিল মি। হি ইজ এ কিলার। প্লিজ সেইভ মি ফ্রম দা ন্যাস্টি ডগ। হি ইজ ফলোয়িং মি সিন্স্ এ লং টাইম ইত্যাদি। ডিউটি অফিসার অগত্যা বলেন, ও সি ডিসিশন নেবেন। আপনি অপেক্ষা করুন। ভদ্রলোক রাগ করে চলে যান। হ্যাঁ যাওয়ার সময় তাঁর নেমকার্ড ফেরত চেয়েছিলেন। বুদ্ধিমান অফিসার সেটি ফেরত দেননি। তো বিনয় থানায় ফেরে রাত দশটা নাগাদ। সব শুনে সে যুবকটিকে লকআপ থেকে এনে জেরা শুরু করে। কিন্তু যুবকটি কোনও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ক্রমাগত আওড়ায়, ম্যান ক্যান নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন। বাট ক্যান এনি ম্যান লিভ উইদাউট ব্রেড? বিনয়ের ধারণা হয়, যুবকটি সত্যিই মানসিক রোগী। তারপর বিনয় সেই ডাক্তারকে ফোন করতে টেলিফোন তুলেছে, আচমকা যুবকটি পালিয়ে যায়। তাকে তাড়া করে নাগাল পাওয়া যায়নি।'

হেসে ফেললাম, 'পাগলই বটে।' বিনয়বাবু ডাক্তারকে ফোন করে নিশ্চয়

ব্যাপারটা জানিয়েছেন?'

'বিনয় পাগল নয়। থানা থেকে আসামি পালানোর মানে কী বুঝতে পারছ না? দাগী ক্রিমিন্যাল হলে কথা ছিল। গা করতেই হতো। তবে সেক্ষেত্রে সে ঘটনাটা চেপে গেছে। এদিকে আমি এ ব্যাপারে আগ্রহী। আমাকে বিনয় ভালই চেনে। কাজেই আমাকে সব খুলে বলল। নাহ্—সেই ডাক্তারের সঙ্গে সে যোগাযোগ করেনি। করতেও চায় না। ডাক্তারও এখন পর্যন্ত আর থানায় যোগাযোগ করেননি। বিনয় বলল, তার একটু খটকা লেগেছে অবশ্য। আমার কথায় খটকাটা বেড়ে গেল। তবে ও এখন নিজের ব্যাপারে বেশি ব্যস্ত। প্রমোশন পেয়ে অন্য দফতরে বদলিতে বিনয় খুশি হয়নি।'

এতক্ষণে ডোরবেল বাজল। কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন 'ষষ্ঠী!'

কর্নেলের এই প্রশস্ত ড্রয়িংরুমের এক কোণে বাইরের দিকে একটা ছোট্ট ওয়েটিং রুম মতো আছে। অ্যাপার্টমেন্টের বাইরের দরজা সেই ঘরটাতে। একটু পরে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইয়ের অমায়িক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। 'প্লিজ কাম ইন ম্যাডাম!' তারপর চাপা স্বরে—'ওনারে বুড়া ভাববেন না। লুকিং বুড়া। বাট স্ট্রং অ্যান্ড হাড়ে-হাড়ে বুদ্ধি। কাম ইন প্লিজ!'

পর্দা তুলে হালদারমশাই বললেন, 'মর্নিং কর্নেল স্যার! আলাপ করাইয়া দিই। মিসেস শ্রীলেখা ব্যানার্জি। আর মিসেস ব্যানার্জি, একজন জিনিয়াসের কাছে আপনারে লইয়া আইছি। আমাগো গুরুদেব কইতে পারেন। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। অ্যান্ড—ইনি হইলেন গিয়া দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী!'

মহিলাদের বয়স অনুমান করতে গিয়ে আমি বরাবর ঠকেছি। তবে এঁকে পূর্ণ যুবতী বলা চলে। উপমায় বলতে হলে বলব পূর্ণিমার চাঁদ। তার মানে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয় আসন্ন। তবে পূর্ণ চন্দ্রিমাটি যেন ঈষৎ মেঘে ঢাকা। তাই উজ্জ্বলতা কম। কিন্তু চোখ দুটি চশমার ভেতরও ধারালো। চেহারায় স্মার্টনেস স্পষ্ট। ছিপছিপে গড়ন। পরনে নীলচে শাড়ি ব্লাউস। একটা কালো মোটাসোটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলছিল। সেটা নামিয়ে পায়ের কাছে রাখলেন।

কর্নেল ওঁকে দেখছিলেন। বললেন, 'আমি সম্ভবত ভুল করছি না। ক'দিন আগে একটা কাগজে আপনার ইন্টারভিউ পড়েছি এবং ছবিও দেখেছি। আপনি শ্রী এন্টারপ্রাইজের প্রোপ্রাইটার। জাপান থেকে কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার আমদানি করে আপনার কোম্পানি পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরি করে। আরব এবং পশ্চিম এশিয়ায় ইতিমধ্যে আপনার কোম্পানি বড় মার্কেট

পেয়ে গেছে।'

হালদারমশাই উত্তেজিত ভাবে নস্যি নিচ্ছিলেন দ্রুত, বললেন, 'আপনারে কইছিলাম ম্যাডাম—'তাঁকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, 'আপনার স্বামী—ইণ্টারভিউতে আপনিই বলেছেন, সম্প্রতি রেড রোডে পথ-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন!'

শ্রীলেখা মৃদুস্বরে বললেন, 'ময়দানে জগিং করতে গিয়েছিল। সেদিন ভোরে প্রচণ্ড কুয়াশা ছিল। ওর পকেটে একটা ক্লাবের মেম্বারশিপ কার্ড ছিল। তাতে ঠিকানা পেয়ে পি জি হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে আমাকে খবর দেওয়া হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, এবার বলুন কী ব্যাপারে আপনি ওঁর ডিটেকটিভ এজেন্সিতে গেলেন?'

হালদারমশাই কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন। বললেন না। শ্রীলেখা বললেন, 'পুলিশকে জানাতে সাহস পাইনি। কারণ—' একটু থেমে আস্তে শ্বাস ছেড়ে বললেন ফের, 'গোড়া থেকে বলা উচিত। আমার স্বামীর মৃত্যুর পরদিন থেকে যখন-তখন উড়ো ফোনে কেউ আমাকে একটা উদ্ভট কথা বলে টিজ করছিল। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিলাম না।'

'কী কথা?' বলেই কর্নেল হাসলেন। 'ম্যান ক্যান নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন। বাট ক্যান এনি ম্যান লিভ উইদাউট ব্রেড?'

শ্রীলেখার দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠল। হালদারমশাইয়ের গোঁফ উত্তেজনার সময় তিরতির করে কাঁপে লক্ষ্য করেছি। এতক্ষণে সেই কাঁপন দেখতে পেলাম। শ্রীলেখা বললেন, 'আপনি কী করে জানলেন?'

কর্নেল সকৌতুকে হালদারমশাইকে দেখিয়ে বললেন, 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদারকে আমরা হালদারমশাই বলে থাকি। উনি চৌত্রিশ বছর পুলিশে কাজ করে অবসর নেওয়ার পর ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। ওঁর সাহস, দক্ষতা, বুদ্ধিসুদ্ধি সত্যিই অসাধারণ। তবে উত্তেজনার ঝোঁকে উনি অনেক-সময় কিছু কথাবার্তা বলে ফেলেন—না, না হালদারমশাই আপনার সংকোচের কারণ নেই। মিসেস ব্যানার্জিকে নিয়ে আসার সময় আপনি বলছিলেন, বুড়ার হাড়ে-হাড়ে বুদ্ধি—'

হালদারমশাই ম্রিয়মাণ হয়ে বললেন, 'ভেরি সরি কর্নেল স্যার! ক্ষমা চাইছি। আমার এই এক ভেরি-ভেরি ব্যাড হ্যাবিট। আসলে মাদারটাং ছাড়তে পারিনি এখনও। তাই মুখ দিয়ে বুড়া বেরিয়ে যায়।'

'নাহ্! শব্দটার মানে তো একই। বুড়া বলুন, বুড়ো বলুন বৃদ্ধ বলুন। এনিওয়ে! তবে বলা হয় বটে হাড়ে-হাড়ে বুদ্ধি, আসলে বুদ্ধির ডেরা মগজের কোষে কোষে। মিসেস ব্যানার্জি, আমার এই তরুণবন্ধু সাংবাদিক জয়ন্ত

চৌধুরী আমাকে মুখোমুখি ওল্ডম্যান বলে সম্ভাষণ করে। হ্যাঁ—ওল্ড ইজ গোল্ড। ষষ্ঠী! কফি নিয়ে আয়।'

ষষ্ঠীচরণ বোঝে, তার 'বাবামশাই' কাকে বা কাদের কফি দিয়ে আপ্যায়ন করবেন। সে নেপথ্যে তৈরিই ছিল যেন। তখনই ট্রেতে কফির সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হলো।

শ্রীলেখা ঘড়ি দেখে বললেন, 'আমি কিন্তু চা বা কফি কিছু খাই না।'

কর্নেল পেয়ালায় কফি ঢালতে ঢালতে বললেন, 'ডাক্তাররা যা-ই বলুন, আমি দেখেছি কফি নার্ভ চাঙ্গা করে। তবে আপনাকে ইন্‌সিস্ট্ করব না। জয়ন্ত! হালদারমশাই! হিজ হিজ হুজ হুজ তৈরি করে নিন।'

কফিতে চুমুক দিয়ে হালদারমশাই বললেন, 'ম্যাডাম! আপনার কেস হিস্ট্রি শুরু করুন।'

শ্রীলেখা কর্নেলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'উড়ো ফোনের ঘটনাটা নিশ্চয় মিঃ হালদার আপনাকে জানিয়েছেন?'

হালদারমশাই ঝটপট বললেন, 'না ম্যাডাম! আমি কিছু কই নাই।'

কর্নেল বললেন, 'আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া আমার অভ্যাস। আপনি উড়ো ফোনে অদ্ভুত কথা শুনতে পান। অদ্ভুত কথা—এটাই আমার কানে বিঁধেছে। যাই হোক। তাহলে দেখা যাচ্ছে কেউ আপনাকে ওই কথাগুলো বলে উত্যক্ত করছে। এই তো? নাকি আরও কিছু ঘটেছে?'

শ্রীলেখা বললেন, 'দু'দিন আগে চৌরঙ্গিতে আমার কোম্পানির অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, তখন প্রায় ছ'টা বাজে—হঠাৎ একটা লোক কাছ ঘেঁষে এসে বলে উঠল আপনার স্বামীর রিস্টওয়াচটা কি ফেরত পেয়েছেন? পার্কিং জোনের ওখানটাতে আলো কম ছিল। তবে বয়স্ক লোক মনে হলো। বললাম, কে আপনি? লোকটা চাপা গলায় বলল, ফেরত পেয়েছেন কি না জানতে চাইছি মিসেস ব্যানার্জি! আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আমার স্বামীর অনেকগুলো রিস্টওয়াচ আছে। কিন্তু কে আপনি? কেন এ কথা জানতে চাইছেন? তখন সে হুমকি দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, নীলডায়াল রোমার রিস্টওয়াচটা আমিই জয়কে দিয়েছিলাম। ওটা ফেরত চাই। আমি চড়া গলায় বললাম, আর একটা কথা বললে গার্ডদের ডাকব। অমনই লোকটা চলে গেল। দেখলাম, ফুটপাতে গিয়ে সে একটা গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল। সত্যি বলতে কী, আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

'নীলডায়াল রোমার রিস্টওয়াচ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু জয়ের তেমন কোনও ঘড়ি আমি দেখিনি।'

'জগিংয়ের সময় ওঁর হাতে ঘড়ি থাকত নিশ্চয়। থাকা উচিত। তো হাসপাতাল থেকে ওঁর কোনও ঘড়ি আপনাকে দেওয়া হয়নি?'

'না।'

হালদারমশাই বললেন, 'অ্যাকসিডেণ্টের সময় ওনার হাতে ঘড়ি থাকলে গঁড়া হওনের কথা। যে পুলিশ অফিসার অ্যাকসিডেণ্টের তদন্ত করছিলেন, তিনি কইতে পারেন।'

আমি বললাম, 'ঘড়ি ভেঙে গেলেও রিস্টে চেন বা ব্যাণ্ড্ আটকে থাকা উচিত। হয়তো হাসপাতাল-স্টাফ তা ফেলে দিয়েছিল!'

শ্রীলেখা বললেন, 'আমিও তা-ই ভেবেছি কারণ তন্নতন্ন খুঁজে তেমন কোনও ঘড়ি দেখতে পাইনি। তো গতকাল দুপুরে অফিসে আবার একটা উড়ো ফোন এল। না—যে 'ম্যান ক্যান নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন' বলে সেই লোকটা নয়। অন্য লোক। দু'দিন আগে সন্ধ্যায় যে আমাকে হুমকি দিচ্ছিল, সম্ভবত সে-ই। বলল, কেউ যদি আমাকে রোমার রিস্টওয়াচটা বেচতে যায়, আমি যেন তাকে আটকে রেখে এই নাম্বারে ফোন করি। হঠাৎ সেই সময় মনে পড়ল নিউজপেপারে হালদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপন দেখেছি। বাড়ি ফিরে বিজ্ঞাপনটা খুঁজে বের করে মিঃ হালদারকে রিং করলাম। উনি বললেন, আপনাকে আসতে হবে না। ঠিকানা বলুন। আমি এখনই যাচ্ছি।'

হালদারমশাই বললেন, 'হঃ। সার্কাস অ্যাভেনিউয়ে তখনই গিয়া হাজির হইলাম।'

কর্নেল বললেন, 'সেই ফোন নাম্বারটা আমাকে দিন। আপনার নেমকার্ডও দিন। আমি আজ সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ আপনার বাড়িতে যাব। আর এই নিন আমার নেমকার্ড। নতুন কিছু ঘটলে তখনই জানাবেন।'…

॥ দুই ॥

হালদারমশাই তাঁর মক্কেলকে বিদায় দিতে নিচে গেলেন। দেখলাম কর্নেল চোখ বুজে স্বগতোক্তি করছেন, 'নীলডায়াল রোমার রিস্টওয়াচ! রোমার! বিখ্যাত জাপানি ওয়াচ কোম্পানির তৈরী ঘড়ি। শ্রী এণ্টারপ্রাইজের সঙ্গে জাপানের কারবারি যোগাযোগ আছে। এদিকে যে লোকটা শ্রীলেখা ব্যানার্জিকে একটা রোমার ঘড়ির জন্য হুমকি দিচ্ছে, তার বক্তব্য—ঘড়িটা নাকি সে-ই জয়দীপ ব্যানার্জিকে দিয়েছিল। এটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েণ্ট।'

বললাম, 'কর্নেল! ঘড়ি-টড়ি পরে। আগে সেই পাগলাটার কথা ভাবুন।'

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, 'মিসেস ব্যানার্জিকে সে-ই টিজ করে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন করে সেটাই প্রশ্ন।'

'ওঁকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, হিপিটাইপ চেহারার ওই রকম অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবককে উনি চেনেন কি না। আপনি কড়েয়া থানার ব্যাপারটা ওঁকে বললেন না কেন?'

'ধীরে জয়ন্ত, ধীরে।' বলে কর্নেল ড্রয়ার থেকে নোটবই বের করে পাতা ওল্টালেন। তারপর টেলিফোন তুলে ডায়াল করলেন। একটু পরে বললেন, 'চেতনা নার্সিংহোম? ...ডাঃ প্রতুল বাগচী আছেন? ...শুনুন, আমি কড়েয়া থানা থেকে বলছি। দিস ইজ আর্জেন্ট।...নমস্কার ডাঃ বাগচী।...হ্যাঁ। আপনি সেই পালিয়ে যাওয়া পেশেণ্টকে কি খুঁজে পেয়েছেন?...সে কী! আপনার কোনও পেশেণ্ট...কিন্তু গতকাল আপনি থানায় এসেছিলেন। আপনার নেমকার্ড দিয়ে গেছেন।...আই সি! হ্যাঁ, দ্যাট্স রাইট। নেমকার্ড আপনি কতজনকে দিতেই পারেন...না, না। আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। এ নিয়ে আপনার চিন্তার কারণ নেই। জাস্ট এ রুটিন এনকোয়ারি।...হ্যাঁ। আজকাল সর্বত্র প্রতারকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্লিজ ডোণ্ট ওয়ারি। রাখছি।'

কর্নেল টেলিফোন রেখে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম,। 'ওঁর কোনও রোগী পালায়নি?'

'নাহ্। কাজেই ওঁর থানায় যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না'।

'কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডাঃ বাগচী সেজে কাল যে থানায় গিয়েছিল, যুবকটিকে তার খুবই দরকার। এদিকে যুবকটি তাকে দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল। তাই না?'

কর্নেল দাড়ি নেড়ে সায় দিলেন। এই সময় হালদারমশাই ফিরে এলেন। ধপাস করে সোফায় বসে আবার একটিপ নাস্য নিয়ে বললেন, 'ফোনে জয়ন্তবাবু আমারে কইছিলেন ম্যান ক্যান নট লিভ—'

'পাগল!' বলে কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

হালদারমশাই অবাক হয়ে বললেন, 'কেডা পাগল? জয়ন্তবাবু পাগল হইবেন ক্যান?'

কর্নেল হাসলেন। 'জয়ন্ত নয়, সেই লোকটা।'

'হঃ! আমি মিসেস ব্যানার্জিরে তা-ই কইয়া দিছি। পাগলের কথায় কান দেবেন না। কিন্তু তখন জয়ন্তবাবু ফোনে পাগলের কথা অবিকল রিসাইট করলেন। কর্নেলস্যার! আমার হেভি খটকা বাধছে।' হালদারমশাই সন্দিগ্ধদৃষ্টে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, 'কর্নেল! ঘটনাটা হালদারমশাইকে জানানো উচিত।'

কর্নেল বললেন, 'উচিত বৈকি! তবে উনি এখনও উত্তেজিত। একটু ধাতস্থ হতে দাও ওঁকে।'

হালদারমশাই খি খি করে তাঁর অনবদ্য হাসি হেসে বললেন, 'আই অ্যাম অলওয়েজ কাম অ্যাণ্ড কোয়াইট কর্নেলস্যার! কন, শুনি।'

একটু চুপ করে থাকার পর কর্নেল আস্তে সুস্থে পাগল যুবকটির ঘটনা সবিস্তারে হালদারমশাইকে বললেন। শোনার পর হালদারমশাই আবার উত্তেজিত

হয়ে পড়লেন। চাপা স্বরে বললেন, 'অল ক্লিয়ার! মিসেস ব্যানার্জিরে ঘড়ির জন্য যে থেট্রন্ করেছে, সেই রাস্কেল থানায় গেছিল।'

কর্নেল বললেন, 'ঠিক। দু'দিন আগে সে মিসেস ব্যানার্জিকে হুমকি দিতে গিয়েছিল। পরে সে জানতে পেরেছে, ঘড়িটা ওই পাগল যুবকের কাছে আছে। এখন প্রশ্ন হলো, জয়দীপ ব্যানার্জির ঘড়ি যুবকটি পেল কী ভাবে?

বললাম, 'ভদ্রমহিলা তো তাঁর স্বামীর তেমন কোনও ঘড়ি ছিল কি না জানেন না!'

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তার চেয়ে বড় কথা, কী আছে ঘড়িটাতে?'

'আচ্ছা কর্নেল! লোকটাকে তো ফাঁদে ফেলা সোজা।'

'কী ভাবে?'

'মিসেস ব্যানার্জিকে সে ফোন নাম্বার দিয়েছে। কাজেই একটা ফাঁদ পেতে তাকে ধরা যায়।'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হঠাৎ খি খি করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'রিস্ক লইয়া গত রাত্রে দুইবার, মর্নিংয়েও কয়বার রিং করছি। খালি কয়, দা নাম্বার ইউ হ্যাভ ডায়াল্‌ড্ ডাজ নট একজিস্ট্! কর্নেলস্যার রিং করতে পারেন।'

কর্নেল ডায়াল করার পর টেলিফোন রেখে বললেন, 'হ্যাঁ। ভুয়ো নাম্বার দিয়েছে। তা আপনি কি মিসেস ব্যানার্জিকে কথাটা জানিয়েছেন?'

'ইয়েস? শি ইজ মাই ক্লায়েন্ট। তারে না জানাইলে চলে? আপনি তো জানেন কর্নেলস্যার, আমি প্রোফেশোনাল এথিক্স মেইনটেন করি!'

বললাম, 'উত্তেজনার ফলে নাম্বার টুকতে মিসেস ব্যানার্জির ভুল হয়নি তো?'

'ভেরি স্ট্রং নার্ভের মহিলা। কইলেন, ভুল হয় নাই।'

কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ। হালদারমশাইয়ের কাছে নাম্বারটা ভুয়ো শুনেও মিসেস ব্যানার্জি যখন আমাকে ওই নাম্বারই দিয়ে গেলেন, তখন বোঝা যাচ্ছে, টুকতে উনি ভুল করেননি।'

'আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে। এইমাত্র নিচে ক্লায়েন্টের লগে কনসাল্ট করলাম।' হঠাৎ হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন, 'সব খরচ উনি দিতে রাজী। নিউজপেপারে বিজ্ঞাপন দিমু।'

'কী বিজ্ঞাপন?'

'পথে একটি রিস্টওয়াচ কুড়াইয়া পাইয়াছি। মালিক উপযুক্ত প্রমাণাদি দিয়া ফেরত লইয়া যান।' প্রাইভেট গোয়েন্দা আবার একচোট হেসে বললেন, 'নামঠিকানা দিমু না। বক্সনাম্বারে বিজ্ঞাপন। দেখি, হালায় ফান্দে পা

দেয় কি না।'

'ব্রিলিয়াণ্ট আইডিয়া! দেরি করবেন না হালদারমশাই! জয়ন্ত কাগজের লোক। দরকার হলে ওর সাহায্য নিন, যাতে শীগগির বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ার মতো জায়গায় ছাপা হয়।'

বললাম, 'আমি শুধু আমাদের কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগে বলে দিতে পারি। কিন্তু বক্সনাম্বারের বিজ্ঞাপনের জবাব পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। বরং ভুয়ো নাম দিয়ে হালদারমশাই তাঁর বাড়ির ঠিকানা দিন। কিংবা এক কাজ করতে পারেন। নামঠিকানার বদলে শুধু ফোন নাম্বার দিয়ে যোগাযোগ করতে বলুন।'

হালদারমশাই কর্নেলের দিকে তাকালেন। 'আপনি কী কন কনেলস্যার?'

কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত মন্দ বলেনি। তবে আপনার ডিটেকটিভ এজেন্সির নাম্বার দেবেন না। আপনি তো প্রায়ই আপনার এজেন্সির বিজ্ঞাপন দেন। বাড়ির ফোন নাম্বার দেবেন বরং। কেউ যোগাযোগ করলে আমাকে তখনই জানিয়ে দেবেন কিন্তু। আর একটা কথা হালদারমশাই! হিপিটাইপ পাগলের যে ঘটনা আপনি শুনলেন, তা যেন ঘুণাক্ষরে আপনার ক্লায়েণ্টকে জানাবেন না। জানালে আমি এই কেস থেকে সরে দাঁড়াব।'

'পাগল?' বলে হালদারমশাই উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অভ্যাসমতো 'যাই গিয়া' বলে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'হালদারমশাই সত্যি বিচক্ষণ মানুষ। তবে ওঁর ওই এক দোষ হঠকারিতা। আমার ধারণা, লোকটি সেয়ানা। এত সহজে ফাঁদে পা দেবে না। তবে যদি বলো, হালদারমশাইকে নিষেধ করলাম না কেন —আমি বলব, নিষেধ করলেও উনি শুনতেন না। বরাবর দেখে আসছি, ওঁর মাথায় একটা আইডিয়া এলেই তা-ই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন।'

ঘড়ি দেখে বললাম, 'এগারোটা বাজে! উঠি।'

'একটু বসো। আমিও উঠব। কারণ এতক্ষণ শুধু ইজিচেয়ারে বসে একটা রহস্যের জট ছাড়াতে ঘিলু জল করেছি। হ্যাঁ—প্রচুর তথ্য হাতে এসে গেল, তা ঠিক। কিন্তু পথে না নামলে জট ছাড়ানোর খেইটা পাওয়া যাবে না।'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালে বললাম, 'আমার আজ এখানে লাঞ্চের নেমন্তন্ন। তারপর অফিস।'

'ডার্লিং! তুমি এলেই ষষ্ঠী তোমাকে লাঞ্চ সার্ভ করতে উদ্যোগী হয়। ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারো।' বলে কর্নেল মিটিমিটি হাসলেন। 'সেই ভুয়ো টেলিফোনের নাম্বারের মতো তোমার ওই নেমন্তন্নও ভুয়ো নয় তো?'

'হাই ওল্ড ম্যান! আমাকে আজ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবেন বোঝা যাচ্ছে।'

'রহস্য জয়ন্ত, রহস্য! রহস্য জড়িয়ে পড়ার চেয়ে আনন্দ আর কিসে?

এক মিনিট। পোশাক বদলে আসি।'...

কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নিচে নেমে এলাম। লনের এককোণে আমার গাড়ি পার্ক করা ছিল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললাম, 'কোথায় যাবেন এখন ?'

কর্নেল বললেন, 'তুমিই বলো এখন কোথায় যাওয়া উচিত !'

'মিসেস ব্যানার্জির অফিসে।'

কর্নেল হাসলেন। 'পাগল যুবকটিকে মিসেস ব্যানার্জি চেনেন কি না এই প্রশ্ন তোমাকে হন্ট্ করছে। তবে তোমাকে বলেছি, ধীরে। এখন আমরা যাব হেস্টিংস থানায়।'

রাস্তায় পৌঁছে বললাম, 'হেস্টিংস থানায় কী ব্যাপার ?'

'গড়ের মাঠের পশ্চিমে রেড রোডের অংশটা ওই থানার আওতায় পড়ে।'

'আপনি জয়দীপ ব্যানার্জির দুর্ঘটনায় মৃত্যু সম্পর্কে আগ্রহী তাহলে ?'

'দ্যাটস রাইট।'

'কর্নেল ! আপনি কি মিসেস ব্যানার্জিকে—'

'নো, নো ! শি ইজ ইনোসেন্ট্। মহিলা পাক্ষিকে ওঁর ইন্টারভিউ পড়ে দেখো।'

'কিন্তু আমার একটা খট্কা লাগছে।'

'বলো।'

'ভদ্রমহিলা স্মার্ট, শিক্ষিতা এবং মডার্ন। নিশ্চয় স্বামীর সঙ্গে নানা দেশে ঘুরেছেন।'

'হুঁউ।'

'এ ধরনের দম্পতিকে একসঙ্গে জগিং করতে দেখেছি। জয়দীপ একা জগিং করতে গিয়েছিলেন কেন ?'

'তার একশো একটা কারণ থাকতেই পারে।'

'কিন্তু স্বামীর কোনও নীলডায়াল রোমার ঘড়ি ছিল কিনা স্ত্রীর অবশ্য জানা উচিত।'

'হ্যাঁ। এটা একটা পয়েন্ট। তবে এ মুহূর্তে হেস্টিংস থানা ছাড়া আর কিছু ভাবছি না।'

কর্নেল সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। বুঝলাম, এখন আর মুখ খুলতে রাজী নন। কিন্তু আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না, জয়দীপ ব্যানার্জির পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু ওঁকে কোন সূত্র যোগাবে ? মহিলা পাক্ষিক পত্রিকায় শ্রীলেখা তাঁর স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে কী বলেছেন আমি [illegible] এখনও [illegible] না। তবে এখন মনে হচ্ছে নিশ্চয় এমন কিছু বলে থাকবেন [illegible] আমার প্রাজ্ঞ [illegible]কা সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।
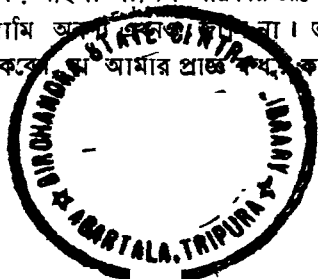
হেস্টিংস থানায় পৌঁছতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগল। সারা পথ ট্র্যাফিক জট। শীতের কলকাতা, পেট থেকে তার সব মানুষজন এবং যানবাহনকে যেন রাস্তাঘাটে উগরে দেয়। থানার পাশে গাড়ি দাঁড় করাতে বলে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। বললেন, 'দেরি হবে না। এখনই আসছি।'

কৌতূহল চেপে বসে থাকতে হলো। কর্নেল ফিরলেন প্রায় মিনিট কুড়ি পরে। গাড়িতে ঢুকে বললেন, 'পথদুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির কাছে পাওয়া জিনিসপত্রের একটা লিস্ট থানায় রাখার নিয়ম আছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি এবং নামঠিকানা নেওয়াও নিয়ম। কিন্তু সব নিয়মই যে মানা হয়, এমন নয়। ট্র্যাফিক সার্জেণ্ট আব্দুল করিম দুর্ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে গিয়ে পড়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে বলছিলেন একটা ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে জগিং করছে ময়দানে, সে কেন হঠাৎ রাস্তায় ট্রাকের মুখে পড়বে? এর একটা উত্তর করিমসাহেবের রিপোর্টে আছে। জয়দীপ জগিং করার পর তাঁর গাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। ঘন কুয়াশা থাকায় দৈবাৎ রাস্তায় নেমেই—নাহ্ জয়ন্ত! এটা যুক্তিসঙ্গত ঠেকছে না। বডি ছিটকে গিয়ে ফুটপাথে পড়েছিল তা ঠিক। কিন্তু পরে শ্রীলেখা তাঁর স্বামীর গাড়ির খোঁজ করলে সেখানে পুলিশ যায়। তখন উজ্জ্বল রোদ ফুটেছে। বেলা প্রায় দশটা। রাস্তার মাঝখানে খানিকটা রক্ত আবিষ্কার করে পুলিশ। তার মানে জয়দীপকে ট্রাকটা ধাক্কা মারে রাস্তার মাঝখানে। অথচ দেখ, জয়দীপের গাড়ি রাখা ছিল ময়দানের দিকের ফুটপাথের পাশেই।'

ততক্ষণে গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছি এবং যেদিক থেকে এসেছি, সেইদিকেই গাড়ি ঘুরিয়েছি। আমি চুপ করে আছি দেখে কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত আমার পয়েণ্টটা যুক্তিসঙ্গত নয়?'

বললাম, 'হ্যাঁ। একেই বলা হয়, ডালমে কুছ কালা হ্যায়।'

কর্নেল হাসলেন। 'তোমার এই প্রবচনটি লাগসই।'

'জয়দীপের হাতে ঘড়ি ছিল কি না পুলিশের লিস্টে নেই?'

'নাহ্। ছিল না। এবং এ-ও একটা পয়েণ্ট। কারণ যারা নিয়মিত জগিং করে, তারা সময় বেঁধেই করে। কাজেই জয়দীপের হাতে একটা ঘড়ি থাকা উচিত ছিল। তিনি নিয়মিত জগিং করতে আসতেন। শ্রীলেখার ইণ্টারভিউয়ে কথাটা আছে।'

'আর কোথাও কি যেতে চান?'

কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, 'রেসকোর্সের উল্টোদিকে মেঘালয় আবাসনে।'

'সেখানে কী?'

'দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা সচরাচর ঝামেলা এড়ানোর জন্য ভুল নামঠিকানা দেয়। কিন্তু জয়দীপের দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে একজন রিটায়ার্ড আই

এ এস অফিসার আছেন। তিনি অবশ্য জগিং করতে যাননি। বয়স্ক মানুষ। গাড়ি করে রেড রোডে যান এবং ফুটপাথে ঘণ্টাখানেক হাঁটাচলা করে বাড়ি ফেরেন। দুর্ঘটনার সময় তিনি কাছাকাছি ছিলেন।'...

মেঘালয় আবাসনের ভেতর ঢুকে পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড় করালাম। কর্নেল সহাস্যে বললেন, 'এবার তুমি আমার সঙ্গে আসতে পারো। তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি তুমি এখন প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে উঠেছ।'

বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে গাড়ি লক করলাম। কর্নেলের কথাটা ঠিক। প্রশ্নটা তীব্র হয়ে উঠেছে। কেন জয়দীপ মাঝরাস্তায় গিয়েছিলেন?

মেঘালয় আবাসনের বাড়িগুলো বহুতল। সিকিউরিটি অফিস আছে। ই ব্লকের ছ'তলায় লিফটে উঠে কর্নেল একটা অ্যাপার্টমেন্টের ডোরবেলের সুইচ টিপলেন। দেখলাম নেমপ্লেটে লেখা আছে : এ কে ঘোষ আই এ এস। ব্র্যাকেটে "রিটায়ার্ড" লেখা।

একটি মধ্যবয়সী লোক দরজা খুলে অবাক চোখে কর্নেলের দিকে তাকালো। গৃহভৃত্য বলে মনে হলো তাকে। কর্নেল তার হাতে নেমকার্ড দিয়ে বললেন, 'মিঃ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তুমি কার্ডটা দেখালেই হবে।'

সে একটু ইতস্তত করে বলল, 'আপনারা ভেতরে এসে বসুন স্যার।'

বসার ঘরে রুচির ছাপ আছে। বইয়ের র‍্যাক, চিত্রকলা, টুকিটাকি ভাস্কর্য সুন্দর সাজানো। আমরা সোফায় বসার একটু পরেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক বৃদ্ধ এসে সম্ভাষণ করলেন। অমায়িক কণ্ঠস্বরে ইংরেজিতে বললেন, 'বলুন কী করতে পারি আপনাদের জন্য?'

এটা একটা কেতা। ভদ্রলোক কর্নেলের মুখোমুখি বসে কার্ডটার দিকে তাকিয়ে ফের বললেন, 'কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। নেচারিস্ট। বাহ্! আমারও একসময় নেচার-বাতিক ছিল। যখন নর্থ বেঙ্গলে ছিলাম—'

কর্নেল দ্রুত বললেন, 'আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি। গত ১৪ ডিসেম্বর ভোরে রেড রোডে পথদুর্ঘটনায় এক ভদ্রলোক মারা যান। ওই সময় আপনি ঘটনাস্থলে ছিলেন।'

মিঃ ঘোষ ভুরু কুঁচকে তাকালেন। 'ছিলাম। বাট এনিথিং রং?'

'ইট ডিপেণ্ডস্।'

'আপনি একজন রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। আই থিংক, দা ভিকটিম ওয়াজ অ্যান আর্মিম্যান?'

কর্নেল হাসলেন। 'না, না মিঃ ঘোষ! আমি তার ফ্যামিলিফ্রেণ্ড। আমি আপনার কাছে কিছু কথা জানতে এসেছি।'

সতর্ক মিঃ ঘোষ বললেন, 'কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য না বললে আমি মুখ

খুলতে রাজী নই। কারণ পুলিশ এ পর্যন্ত আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেনি। কিছু গণ্ডগোল থাকলে নিশ্চয় করত।'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'ভিকটিমের নাম জয়দীপ ব্যানার্জি। একটা ট্রেডিং কোম্পানির ওনার ছিল সে। তার স্ত্রীর নামে কোম্পানির ওনারশিপ উইল করা আছে। তাই জয়দীপের আত্মীয়েরা গণ্ডগোল বাধাতে চাইছে। তাদের বক্তব্য স্ত্রীর দুর্ব্যবহারেই জয়দীপ আসলে স্যুইসাইড করেছে।'

'হুঁ! আমারও স্যুইসাইড মনে হয়েছিল। কারণ সে মাঠের দিক থেকে ছুটে এসে আমার প্রায় নাকের ডগা দিয়ে রাস্তায় নেমেছিল। ঘন কুয়াশা ছিল বটে, কিন্তু আমার ইন্সটিংক্ট্ বলতে পারেন—ট্রাকের সামনে পড়ামাত্র মনে হয়েছিল স্যুইসাইড করল নাকি লোকটা? তবে পুলিশকে আমি সে-কথা বলা উচিত মনে করিনি।'

'একটু ডিটেলস বলুন প্লিজ!'

'দেখুন কর্নেল সরকার! আমি কিন্তু কোর্টে সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড়াতে রাজী নই। তবে যদি কোর্ট থেকে সমন আসে, আমি পুলিশকে যা বলেছি, তার একটা কথাও বেশি বলব না।'

'না, না। সমন আসবে না। যদি আসে, যা খুশি বলবেন। কিন্তু আমি প্রকৃত ঘটনা জানতে চাই।'

'বেশ আর কী জানতে চান বলুন।'

'বডি কোথায় পড়েছিল? প্লিজ ডিটেলস বলুন।'

মিঃ ঘোষ নির্লিপ্ত মুখে বললেন, 'আমি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। ট্রাকটা খুব জোরে আসছিল। বডি কোথায় পড়ল, সেই মুহূর্তে লক্ষ্য করিনি। পরে দেখলাম, আমার পিছনে কয়েক হাত দূরে ফুটপাথে বডিটা পড়ে আছে। বেশ কিছু লোক ওখানে হাঁটাচলা এবং জগিং করছিল। তারা দৌড়ে এল। তারপর—' মিঃ ঘোষ একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, 'হুঁ। প্রথমে একজন লোক বডিটাকে চিৎ করে শোয়াতে চেষ্টা করছিল। তার পেছনটা চোখে পড়েছিল। লম্বা চুল—যাকে বলে হর্সটেলের মতো বাঁধা। হিপি বলেই মনে হয়েছিল। মাত্র কয়েক হাত দূরে তো! পরনে হাফস্লিভ ব্যাগি সোয়েটার। শুধু এটুকুই মনে পড়ছে। আমি কিন্তু ভিড়ে ঢুকিনি।'

কর্নেল শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'হিপি?'

'হ্যাঁ। আমি প্রতিদিন মর্নিংয়ে ওদিকটায় হাঁটাচলা করি। মাঝে মাঝে হিপিদের দেখতে পাই।'

'সে জয়দীপের বডি চিৎ করে শোয়ানোর চেষ্টা করছিল?'

'করছিল। সেটা স্বাভাবিক। তারপর ভিড় জমে গেল।'

'থ্যাঙ্কস মিঃ ঘোষ। চলি।'

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘর থেকে বেরুলেন। আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম। লিফটের সামনে না গিয়ে উনি সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন। গতিতে দ্রুততা ছিল। উত্তেজিত মনে হচ্ছিল ওঁকে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললাম, 'কর্নেল! তা হলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে এল দেখছি! একটা ভাইটাল ক্লু।'

কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন, 'একটা ভাইটাল যোগসূত্র বলা উচিত।'

'রুটি ছিনতাইকারী পাগল সেদিন ভোরে রেড রোডে কী করছিল?'

'জগিং।'

হেসে ফেললাম। 'ভ্যাট! পাগলরা জগিং করে নাকি?'

'সার্জেন্ট আব্দুল করিমকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিল, দুজনকে মাঠ থেকে দৌড়ে আসতে দেখেছে। তার সামনে দিয়েই ওরা ছুটে যায়। ভিকটিমের পেছনের লোকটার চুল দেখে সে তাকে হিপি ভেবেছিল। পরে আর হিপিটাকে সে দেখতে পায়নি। বোঝা যাচ্ছে, হিপিটাইপ চেহারা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।'

'তার নামঠিকানা নিশ্চয় নেওয়া হয়েছিল?'

'হ্যাঁ!' বলে কর্নেল পকেট থেকে নোটবই বের করলেন। 'বাবুয়া। কেয়ার অব রামধন। ঠিকানা বাবুঘাট। পেশা ঠিকা শ্রমিক।'

'বাবুঘাটে যাবেন নাকি?'

'নাহ্। বাবুঘাটে কোনও এক রামধন বা বাবুয়াকে খুঁজে বের করা সহজ নয়। ওখানে বিচিত্র পেশার অসংখ্য মানুষ থাকে। থাকে বলছি বটে, কিন্তু সে-থাকাও ডেরা বেঁধে থাকা নয়। সার্জেন্ট ভদ্রলোক নেহাত রুটিন ওয়ার্ক করেছেন। পথদুর্ঘটনা তো প্রতিদিনই হচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে কী ভাবে দায়-সারাগোছের কাজকর্ম চলে, তুমি সাংবাদিক হিসেবে ভালই জানো। তাছাড়া ভিকটিমের পক্ষ থেকে ভালভাবে তদন্তের জন্য চাপ দেওয়া হয়নি।'

'কেন হয় নি, সেটা কি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়?'

কর্নেল হাসলেন। তোমার সন্দেহের কাঁটা শ্রীলেখা দেবীর দিকে ঘুরে আছে।'

'সেটা অমূলক নয়, বস্!'

'কর্নেল আরও জোরালো হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যা ৭টায় মুখোমুখি শ্রীলেখার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে। তুমি ঝোপ বুঝে কোপ মেরে দেখতে পারো। তুমি সাংবাদিক। কাজেই তোমার সুযোগের অভাব হবে না।'...

কর্নেলের ইলিয়ট রোডের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে প্রায় দেড়টা বেজে গেল। ষষ্ঠীচরণ দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'কড়েয়া থানা থেকে বাবামশাইকে ফোং

করেছিল !'

তাকে কিছুতেই ফোন বলাতে পারেন না কর্নেল। কিংবা আমার সন্দেহ সে ইচ্ছে করেই ফোং বলে। কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, খিদে পেয়েছে।'

ষষ্ঠী বলল, 'সব রেডি। আমিও রেডি হয়ে আছি। কিন্তু থানার পুলিশ বলছিল, সাহেব এলেই যেন ফোং করেন।'

কর্নেল টেলিফোন তুলে ডায়াল করলেন। তারপর বললেন, 'কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।...বলো বিনয়!...তাই বুঝি? আসলে আমিই ডাঃ বাগচীকে ফোন করে জানতে চেয়েছিলাম...হ্যাঁ। ঠিক করেছ। চেপে যাও। ...যথাসময়ে জানতে পারবে। ছাড়ছি।'

বললাম, 'সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ বাগচী থানায় যোগাযোগ করেছিলেন নাকি?'

কর্নেল হাসলেন। 'হ্যাঁ। সেটা স্বাভাবিক। পুলিশকে কে না ভয় পায়? যাই হোক, ভাগ্যিস বিনয় থানায় ছিল। বুদ্ধি করে ম্যানেজ করেছে। কার্ডটা ওঁকে দেখায়নি। বলেছে, স্রেফ ভুল বোঝাবুঝি।'

'সেই ডিউটি অফিসারকে দিয়ে ডাঃ বাগচীকে শনাক্ত করা উচিত ছিল, কাল উনিই থানায় গিয়েছিলেন কিনা!'

'বিনয় তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান। নাহ্, ডাঃ বাগচী সেই লোকটি নন। সে ছিল প্রৌঢ় শক্তসমর্থ গাট্টাগোট্টা চেহারার লোক। চিবুকে দাড়ি। এদিকে ডাঃ বাগচীর বয়স তার চেয়ে কম। রোগা গড়ন।' বলে কর্নেল বাথরুমে ঢুকলেন।

তবে স্নানের জন্য নয়, সেটা জানি। কলকাতায় থাকতে গ্রীষ্মে নাকি সপ্তাহে দু'দিন এবং শীতে নাকি মাসে একদিন স্নান করেন। বাইরে গেলে অন্যরকম। কর্নেলের এই স্বাস্থ্যবিধি আমার কাছে আজও রহস্যময়। এ বয়সে অত কফি এবং চুরুট টানা সত্ত্বেও সবসময় তাজা থাকেন। কখনও জ্বর জ্বালাও দেখিনি। অবশ্য একবার ঠাণ্ডা লেগে স্বরভঙ্গ হয়েছিল দেখেছি।...

লাঞ্চের পর আমার ভাত ঘুমের অভ্যাস বহুদিনের। ষষ্ঠী তা জানে বলে ড্রয়িংরুমের সোফায় একটা বালিশ এবং কম্বল রেখেছিল। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে একটা গাবদা বই খুলে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়েছিলেন। বইটা যে প্রজাপতি পোকামাকড় সংক্রান্ত, তা ছবি দেখেই বোঝা গিয়েছিল।

ষষ্ঠীর ডাকে ঘুম ভেঙে দেখি, ঘরে আবছায়া ঘনিয়েছে। ষষ্ঠী কফির পেয়ালা রেখে বলল, 'বাবামশাই একটু বেরিয়েছেন। বলে গেছেন, দাদাবাবুকে যেন আটকে রাখবি। আলো জ্বালব নাকি দাদাবাবু?'

'নাহ্। থাক।'

কফিতে চুমুক দেওয়ার পর ক্রমে শরীরের ম্যাজমেজে ভাবটা কেটে গেল। সাড়ে পাঁচটা বাজে। শীতকালে এখন সন্ধ্যাবেলা। রাস্তার আলোর আভাস জানালার পর্দার ফাঁকে ফুটে উঠছে।

কফি শেষ করেছি, সেইসময় টেলিফোন বাজল। হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে সাড়া দিলাম। হালদারমশাইয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'কেডা? কর্নেলস্যারেরে চাই।'

সকালের মতো রসিকতা না করে বললাম, 'আপনার কর্নেলস্যার একটু বেরিয়েছেন হালদারমশাই।'

'জয়ন্তবাবু নাকি? বিজ্ঞাপন দিয়া ফ্যালাইছি। একখান ইংরাজি, দুইখান বাংলা। কিন্তু এদিকে এক কাণ্ড বাধছে।'

'বলুন!'

'এইমাত্র কোন হালায় আমারে থেট্টেন করছিল। কয় কী, হার্ট ফুটা করব।'

'বলেন কী!'

'হঃ। ট্যার পাইয়া গেছে। আই ডাউট জয়ন্তবাবু, মর্নিংয়ে আমাগো ফলো করছিল। আর কর্নেলস্যারের কথাও কইছিল। ওই বুড়ারও টাক ফুটা করব। কইলাম—কী কইলাম কনতো? খি খি খি—'

'খি খি খি—মানে শুধু হাসলেন?'

হালদারমশাইয়ের কণ্ঠস্বর গম্ভীর শোনাল। 'কইয়া দিলাম, পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে!'

'আজ সন্ধ্যায় আপনার ক্লায়েন্টের ওখানে যাবার কথা।'

'হঃ! কর্নেলস্যারেরে কইবেন, আমি ম্যাডামের বাড়িতে উপস্থিত থাকব।'

'হালদারমশাই! ছদ্মবেশে বেরুবেন কিন্তু!'

জয়ন্তবাবু! আই হ্যাভ আ লাইসেন্সড্ গান দ্যাট ইউ নো ভেরিওয়েল।'

'আচ্ছা, রাখছি।'

বুঝলাম প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোক আমার ওপর চটে গেলেন। এতক্ষণে ষষ্ঠী এসে আলো জেলে দিল।

কর্নেল ফিরলেন ছ'টা নাগাদ। ফিরেই টুপি খুলে রেখে হাঁকলেন, 'ষষ্ঠী! কফি। আমরা বেরুব।'

উনি ইজিচেয়ারে বসে হেলান দিলেন। বললাম, 'গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়েছিলেন?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'কতকটা। কোনও ফোন এসেছিল নাকি?'

হালদারমশাইয়ের কথা বললাম। কর্নেল টাকে হাত বুলোতে থাকলেন। ষষ্ঠী শীগগির কফি আনল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, 'হঠাৎ একটা আইডিয়া মাথায় এসেছিল। কড়েয়া থানায় গিয়েছিলাম সেই রুটির দোকানের খোঁজে। বিনয় ছিল না। তবে তাতে আমার অসুবিধে হয়নি। প্রথমে জেনে নিলাম সো-কল্ড্ পাগলের হাতে

নীলডায়াল ঘড়ি ছিল কি না। ছিল না। ছিল দামী জাপানি ঘড়ি সিটিজেন। সাদা ডায়াল। তো থানার অফিসারদের চেয়ে কনস্টেবলদের থানা এরিয়াটা নখদর্পণে থাকে। কাজেই দোকানটা খুঁজে বের করা সম্ভব হলো। দোকানদার ফজল মিয়া সত্যিই তেজী এবং রগচটা মানুষ। বললেন, স্যার! ও পাগল-টাগল নয়। স্রেফ বদমাশ। কারণ কাছেই বড় রাস্তার মোড়ে তাঁর ভাতিজার টেলারিং শপ আছে। সেই ভাতিজা দেখেছে, বদমাশটা মোটরসাইকেলে চেপে এসে ওর দোকানের সামনে নামে। তারপর মোটরসাইকেলে চাবি দিয়ে গলিতে এগিয়ে যায়। তারপর ফজল মিয়ার ভাতিজা রাত সাড়ে দশটা নাগাদ দোকান বন্ধ করছে, তখন দেখে সেই বজ্জাতটা দৌড়ে এসে মোটরসাইকেলে চাপল। চেপে হাওয়া হয়ে গেল। ফজল মিয়ার ভাতিজা কালকের ঝামেলার কথা শুনেছিল। কিন্তু দোকান থেকে বেরোয়নি। আজ সকালে চাচাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। সে থাকে পার্ক সার্কাসের ওদিকে।'

'অদ্ভুত তো!'

'অদ্ভুত। কিন্তু জলবৎ তরল।'

'বুঝলাম না।'

'কাল ডাঃ বাগচী দুটো লোক নিয়ে গাড়িতে করে ওকে তাড়া করেছিলেন। মোটরসাইকেল রাস্তার মোড়ে রেখে তাই সে গলিতে ঢুকে পড়ে। ধুরন্ধর বুদ্ধি! এরপর সে আত্মরক্ষার জন্য রুটি তুলে নিয়ে লোক জড়ো করে। বস্তি এরিয়ার ব্যাপার। নিমেষে লোকারণ্য হয়ে যায়। এবার সে পাগল সাজতে বাধ্য হয়। আত্মরক্ষার কৌশল!'

'কিন্তু কর্নেল, একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। যারা তাকে গাড়ি চেপে তাড়া করে আসছিল, তারা কী ভাবে জানল সে পাগল সাজবে, তাই আগেভাগে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তারের নেমকার্ড যোগাড় করে রেখেছিল?'

কর্নেল হাসলেন। 'বুদ্ধিমানের প্রশ্ন। আসলে এটা দুই ধুরন্ধরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নমুনা।'

'বুঝলাম না।'

'ধরো, জাল পাগলের নাম এক্স এবং তার প্রতিপক্ষের নাম ওয়াই। ওয়াই যখন দেখল এক্স পাগল সেজেছে এবং রুটিওয়ালা সদলবলে তাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে, তখন ওয়াই বুঝল যে, থানার লকআপে এক্সকে ঢোকানো হবেই। পুলিশের রীতিনীতি ওয়াইয়ের জানা। কার না জানা? অতএব ওয়াই দ্রুত ফন্দি আঁটল। ডাঃ বাগচীর নার্সিংহোম পাম অ্যাভেনিউতে। ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি চেপে পৌঁছতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। কাজেই ওয়াই তৎক্ষণাৎ ডাঃ বাগচীর কাছে ছুটে যায় এবং কল্পিত কোনও মানসিক রোগীকে ভর্তি করানোর কথা তোলে। ডাঃ বাগচীর একটা নেমকার্ড চেয়ে নেয়। যে-কোনও

ডাক্তারই তা দিয়ে থাকেন। নেমকার্ড হাতিয়ে ওয়াই ছুটে আসে কড়েয়া থানায় এবার বাকিটা তোমার জানা।'

'ওঃ! কী সেয়ানা লোক!'

কর্নেল অট্টহাসি হেসে বললেন, 'হঁ্যা। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি বলে একটা কথা আছে। তবে এক্ষেত্রে সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই। ওয়াই হেরে ভূত!'...

॥ তিন ॥

শ্রীলেখা ব্যানার্জির বাড়ি সার্কাস অ্যাভেনিউয়ে একটা সংকীর্ণ গলিরাস্তার ভেতর দিকে। সাবেক আমলের দোতলা বাড়ি। সামনের প্রাঙ্গণে উঁচু-নিচু কিছু গাছ-লতা-গুল্মের সজ্জা আছে। পোর্টিকোর মাথায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় প্রাঙ্গণে আলো-ছায়া মিলেমিশে কেমন গা-ছমছমকরা রহস্য—অবশ্য এটা আমারই অনুভূতি। তাছাড়া পবিবেশ সুনসান স্তব্ধ। গলিরাস্তাটায় আলো নেই বললেই চলে। লোকজনেরও আনাগোনা কম। একটা রিকশা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

গেটের কাছে হর্ন দিতেই একটা লোক দৌড়ে এসে গেট খুলে দিয়েছিল এবং হালদারমশাইয়ের সাড়া পেয়েছিলাম। 'প্লিজ কাম ইন কর্নেলস্যার! ম্যাডাম ইজ অ্যাংশাসলি ওয়েটিং ফর ইউ।' সেইসময় কুকুরের গর্জন শুনলাম। হালদার-মশাই পাল্টা গর্জে বললেন, 'বদ্রীনাথ! কুত্তা সামাল দাও। কাম নাই, খালি চেঁচায়।'

নিচের তলায় বনেদি ধরনে সাজানো বসার ঘর। হালদারমশাই আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন। বারান্দায় শ্রীলেখা দাঁড়িয়েছিলেন। নমস্কার করে আমাদের একটা ঘরে ঢোকালেন। এই ঘরটা আধুনিক রীতিতে সাজানো। ছোট্ট একটা টি ভি আছে কোণের দিকে। আমাদের বসতে বলে শ্রীলেখা সম্ভবত আপ্যায়নের জন্য ভেতরের ঘরে যাচ্ছিলেন। কর্নেল বললেন, 'মিসেস ব্যানার্জি, প্লিজ বসুন। আগে কিছু জরুরি কথাবার্তা সেরে নিই।'

শ্রীলেখাকে সকালের চেয়ে নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। পুতুলের মতো বসলেন। আস্তে বললেন, 'আমাকে আজ দুপুরে অফিসে সেই লোকটা টেলিফোনে হুমকি দিয়েছে। কেন আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়েছি বলে ধমক দিল। তারপর মিঃ হালদারের কাছে শুনলাম, ওঁকেও হুমকি দিয়েছে।'

হালদারমশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল ইশারায় তাঁকে থামিয়ে বললেন, 'প্রথমে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'বলুন।'

'আপনার এ বাড়িতে কে কে থাকে?'

'ফ্যামিলির ওল্ড সারভ্যাণ্ট সুরেন, দারোয়ান বদ্রীনাথ আর মালতী। মালতী রান্নাবান্না ইত্যাদি করে। এরা বাড়িতেই নিচের তলায় থাকে। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর মালতী আমার পাশের ঘরে থাকে। তবে মর্নিংয়ে আমার পি এ সুদেষ্ণা আসে। কোম্পানির কিছু প্রাইভেট অ্যাণ্ড কনফিডেন্সিয়াল কাজকর্ম আছে। সব সেরে সে এখানেই খেয়ে নেয় এবং আমার সঙ্গে অফিসে যায়। বিকেল পাঁচটায় তাকে ছেড়ে দিই। অবশ্য আর্জেণ্ট কিছু কাজ থাকলে তাকে আমার সঙ্গে এ বাড়িতে আসতে হয়। শি ইজ স্মার্ট, এফিসিয়্যাণ্ট অ্যাণ্ড রিলায়েব্‌ল্‌।'

'সুরেন, বদ্রীনাথ, মালতী আপনার বিশ্বস্ত?'

'ও! দে আর রিয়ায়েব্‌ল্‌। আমার শ্বশুরমশাইয়ের আমল থেকে ওরা ফ্যামিলির লোক হিসেবে গণ্য।'

কর্নেল শ্রীলেখার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আপনার স্বামী কি প্রতিদিন জগিং করতে যেতেন?'

'হ্যাঁ। বিয়ের পর থেকেই জয়ের এ অভ্যাস দেখে আসছি।'

'আপনাদেব বিয়ে হয়েছে কতদিন আগে?'

শ্রীলেখা আস্তে শ্বাস ফেলে বললেন, 'প্রায় দু বছর। আমাদের দুজনের মধ্যে তার আগে থেকেই একটা এমোশনাল সম্পর্ক ছিল। দুজনে একই কম্পিউটার ট্রেনিং সেণ্টারের স্টুডেণ্ট ছিলাম। সেই সূত্রে আলাপ।'

'আপনার শ্বশুরমশাইয়ের নাম কী?'

'সুশোভন ব্যানার্জি। জয়ের মাকে অবশ্য আমি দেখিনি। জয়ের ছেলেবেলায় তিনি মারা যান।'

'সুশোভনবাবু সম্ভবত ব্যবসা করতেন।' বলে কর্নেল একটু হাসলেন। 'কারণ চাকরি করে আগের দিনে এমন বাড়ি করা সম্ভব ছিল না।'

'হ্যাঁ। আমার শ্বশুরমশাইয়ের ঘড়ির বিজনেস ছিল।'

'ঘড়ি?'

'সুদক্ষিণা ওয়াচ কোম্পানি। আমার বিয়ের আগেই তাঁর কোম্পানি উঠে যায়। জয়ের কাছে শুনেছি, এবং নিজেও দেখেছি খুব রাগী মানুষ ছিলেন। ব্যবসাবুদ্ধি ততকিছু ছিল না। কর্মচারীদের বড্ড বেশি বিশ্বাস করতেন। তারা তাঁকে ঠকাত। আসলে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন জমিদার। সেই আভিজাত্য বজায় রেখে চলতেন।'

'মিসেস ব্যানার্জি, আপনার জগিংয়ের অভ্যাস নেই?

এই অতর্কিত প্রশ্নে শ্রীলেখা হকচকিয়ে উঠবেন ভেবেছিলাম। কিন্তু তেমন

কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম না। শ্রীলেখা নিষ্পলক দৃষ্টিতে বললেন, 'খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন, কর্নেল সরকার! না, আমি জয়ের সঙ্গে জগিং করতে যেতাম না। কারণ জগিং কেন, জোরে হাঁটাচলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বছর সাতেক আগে কলেজ থেকে ফেরার সময় রাস্তার একটা ম্যানহোলে আমার ডান পা ঢুকে যায়। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমেছিল। ম্যানহোলটা ছিল খোলা।' শ্রীলেখা চাপা শ্বাস ফেলে বললেন, 'হিপজয়েণ্টে ক্র্যাক হয়েছিল। প্রায় ছ'মাস প্লাস্টার বাঁধা অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলাম। দ্যাটস এ লং স্টোরি! আমার অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের সেখানেই শেষ। যখন হাঁটাচলা সম্ভব হলো, তখন বাবা আমাকে অগত্যা কম্পিউটার ট্রেনিং সেণ্টারে ভর্তি করে দিলেন।'

'আপনার বাবা বেঁচে আছেন?'

'না। মা-ও বেঁচে নেই। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান।' একটু চুপ করে থাকার পর শ্রীলেখা ঠোঁটের কোণে কেমন একটু হেসে বললেন, 'প্রশ্নটা আপনি তুলবেন আমি জানতাম। তাই সেই পুরোনো দুর্ঘটনার মেডিক্যাল রিপোর্ট খুঁজে বের করে রেখেছি। যদি দেখতে চান—'

কর্নেল দ্রুত বললেন, 'আপনি ইনটেলিজেণ্ট। তবে না—কোনও মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখার প্রয়োজন আমার নেই। আপনাকে প্রশ্ন করতে এসেছি। শুধু উত্তর দেওয়াই যথেষ্ট। আচ্ছা মিসেস ব্যানার্জি, কোনও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান যুবককে কি আপনি চেনেন—মাথায় লম্বা চুল এবং পেছন দিকে হস টেলের মতো বাঁধা?'

'না তো! তবে—' শ্রীলেখা হঠাৎ থেমে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন।

'বলুন!'

'জয় তার মৃত্যুর আগের দিন রাত্রে কথায় কথায় বলছিল, ময়দানে একজন হিপি টাইপের যুবক তাকে জগিংয়ের সময় টিজ করে। আবার টিজ করলে সে পুলিশকে জানাবে।' শ্রীলেখা চশমার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকালেন কর্নেলের দিকে। 'ডু ইউ নো দ্যাট গাই?'

'নাহ্। চিনি না। তবে জানতে পেরেছি, সে একজন পাগল।'

'একজ্যাক্টলি! জয় বলছিল, পাগল ছাড়া ওভাবে কেউ টিজ করে না। জগিংয়ের সময় বারবার নাকি সে জয়ের পাশ ঘেঁষে আসত। কখনও পেছন থেকে জয়ের পিঠে খোঁচা মেরে দূরে সরে যেত। আপনাকে বলা উচিত, জয় নিরীহ ভীতু মানুষ ছিল।'

'আচ্ছা মিসেস ব্যানার্জি, জগিং করতে যাওয়ার সময় মিঃ ব্যানার্জির হাতে নিশ্চয় ঘড়ি থাকত।'

'লক্ষ্য করিনি। সে উঠত খুব ভোরে। তখন আমি ঘুমিয়ে থাকতাম।

বেডরুমে ল্যাচ কি আছে। ভেতরে থেকে খোলা যায়। বাইরে থেকে খুলতে হলে চাবি লাগে। জয় এসে আমার ঘুম ভাঙাত।'

'আপনার স্বামীর কতগুলো রিস্টওয়াচ ছিল?'

'গুনে দেখিনি। আমার শ্বশুরমশাই ওয়াচ কোম্পানির মালিক ছিলেন। কাজেই জয়ের ঘড়ির সংখ্যা অনেক। ওই দেখুন, শো-কেসে কত রিস্টওয়াচ সাজানো। অনেকগুলোই অচল এবং পুরনো। আপনি নীলডায়াল রোমার ঘড়ির কথা বলছিলেন। তেমন কোনও ঘড়ি কখনও দেখিনি। কোথাও খুঁজে পাইনি। বিলিভ মি!'

'কিন্তু তাঁর একটা নীলডায়াল রোমার রিস্টওয়াচ অবশ্যই ছিল।'

'ছিল তো গেল কোথায়?'

'দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর সময় ওটা ছিনতাই হয়ে গেছে।'

শ্রীলেখা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'আপনি কী ভাবে জানলেন?'

হালদারমশাই বলে উঠলেন, 'কর্নেলস্যারের কিছু অজানা থাকে না। আপনারে কইছিলাম না?'

কর্নেল হাসলেন। 'বরং খুলে বলুন হালদারমশাই, তদন্ত করেই জানতে পেরেছি।'

'হঃ!'

শ্রীলেখা বললেন, 'এবার কফি বলি। আপনি কফির ভক্ত।'

কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ। এবার কফি খাওয়া যাক।'

শ্রীলেখা বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল ঘরের ভেতরটা দেখতে দেখতে কোণের সেই ছোট্ট টি ভি-র দিকে আঙুল তুলে চাপা স্বরে বললেন, 'হালদারমশাই, বলুন তো ওটা কী?'

হালদারমশাই বললেন, 'ক্যান? টি ভি।'

কর্নেল হাসলেন। এতক্ষণে যন্ত্রটা খুঁটিয়ে দেখলাম। বললাম, 'কম্পিউটার। তবে ঘরে ঢুকেই মনে হচ্ছিল টি ভি।'

হালদারমশাই উঠে গিয়ে কম্পিউটারটা দেখে এলেন। বললেন, 'ঠিক কইছেন। কিন্তু কম্পিউটার অফিসের কামে লাগে। বাড়িতে কম্পিউটার কী কামে লাগব?'

কর্নেল বললেন, 'এটা কম্পিউটারের যুগ হালদারমশাই! অদূরে ভবিষ্যতে ঘরে ঘরে এই যন্ত্র কেনা হবে। বিশেষ করে ওটা পার্সোনাল কম্পিউটার। মিসেস ব্যানার্জির কোম্পানিরই তৈরি সম্ভবত।'

কর্নেল কম্পিউটার নিয়ে বকবক শুরু করলেন। একটু পরে শ্রীলেখা এবং তাঁর পিছনে পরিচারিকা মালতী ঘরে ঢুকল। মালতীর হাতে বিশাল ট্রে।

বয়সে প্রৌঢ়া এবং শক্ত-সমর্থ গড়ন। বোঝা যায়, শ্রীলেখাকে গার্ড দেওয়ার উপযুক্ত সে। ট্রে রেখে সে চলে গেল।

শ্রীলেখা কফি তৈরি করতে করতে বললেন, 'আপনারা কম্পিউটার নিয়ে আলোচনা করছেন কানে এল। ওটা জয়ের নিজস্ব ডিজাইনে তৈরি। পার্সোনাল কম্পিউটারই বটে। তবে একটু স্পেশালিটি আছে।'

কর্নেল বললেন, 'জানতে আগ্রহ হচ্ছে। বলুন!'

'ওতে জয়ের ফ্যামিলির অনেক তথ্য কোডিফায়েড করা আছে। তার জন্য বিশেষ বিশেষ কোড আগে জেনে রাখা দরকার। না জানলে ওটা ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য সাধারণ কম্পিউটারের মতোও ওটা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সেই বিশেষ কোড জানলে তথ্যগুলো পেপারশিটে টাইপ্‌ড্‌ হয়ে বেরিয়ে আসবে।'

কর্নেল বলে উঠলেন, 'আপনি জানেন না?'

শ্রীলেখা কর্নেলের হাতে কফির পেয়ালা দিয়ে আস্তে বললেন, 'না। জয় বলেছিল, পাঁচটা লেটার অব্দি ডেটা ফিড করাতে পেরেছে। ওই লেটার গুলোকে বলা চলে কী ওয়ার্ড। আরও কয়েকটা কী ওয়ার্ড দিয়ে ডেটা ফিড করাতে পারলে সংশ্লিষ্ট পুরো তথ্য কোডিফায়েড হবে। আমি ওর সমস্যা বুঝতাম। কম্পিউটার ব্রেন বলে একটা কথা শুনে থাকবেন। সেই ব্রেনের নিজস্ব নার্ভ আছে—না, নার্ভ বলছি উপযুক্ত শব্দের অভাবে—ববং চ্যানেল অব এ সার্টেন সিস্টেম বললে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। কতকটা যেন নির্দিষ্ট রাগের সবগমের মতো। আপনি বাজাবেন পূরবী। হয়তো একটা কড়ি বা কোমল স্বরের হেরফেরে সেটা হয়ে গেল পূরিয়া।' শ্রীলেখা হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন যেন। 'উপমা দিয়ে এসব বোঝানো যায় না। প্রাইমারী 'নলেজ ইজ নেসেসারি।'

কর্নেল বললেন, 'সেই পাঁচটা লেটারের কী ওয়ার্ড মিঃ ব্যানার্জি আপনাকে বলেননি?'

'না জয় বলেছিল সেই কী ওয়ার্ড অসম্পূর্ণ। আমি জানলেও কোনও লাভ হতো না।'

'কম্পিউটারটা কি ঘরে বসেই তৈরী করেছিলেন মিঃ ব্যানার্জি?'

'হ্যাঁ। তবে ফ্যাক্টরী থেকে মেটারিয়াল নিয়ে এসেছিল।'

'আপনি ওটা কি ব্যবহার করেছেন সাধারণ কাজকর্মে?'

'করার সাহস পাইনি। খুব সেনসিটিভ কম্পিউটার। অটোমেটিক এয়ারকুলার ফিট করা আছে। সব সময় এয়ারকুলার চালু রাখতে হয়। লোড-শেডিং হলে অটোমেটিক চার্জারের সাহায্যে এয়ারকুলার চালু থাকে।'

একটু চুপ করে থাকার পর কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ। আপনি যে ফোন

নাম্বারটা দিয়েছেন, সেটা ফল্‌স্‌ নাম্বার।'

'কইয়া দিছ ওনারে।' হালদারমশাই বলে উঠলেন। 'জোক করছে হা—' বলে থেমে গেলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। ম্যাডামের সামনে শব্দটা উচ্চারণ করতে বাধল।

আমি হেসে ফেললাম। কর্নেল বললেন, 'এ ঘরে টেলিফোন আছে?'

শ্রীলেখা বললেন, 'আছে। ওই তো।'

কর্নেল চোখ বুজে কিছু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, 'মিসেস ব্যানার্জি! তবু পরীক্ষা করে দেখা যাক। নাম্বারটা আপনি ডায়াল করুন। দা নাম্বার ইউ হ্যাভ ডায়ালড ডাজ নট এক্‌জিস্ট শুনলেও ফোন ছাড়বেন না। ক্রমাগত আপনিও বলে যাবেন আমি শ্রীলেখা ব্যানার্জি বলছি। এই নিন সেই নাম্বার। আগে দেখে নিন আমি ঠিক টুকছি কিনা।'

'এক মিনিট' বলে শ্রীলেখা পাশের ঘরে গেলেন। একটা স্লিপ নিয়ে এসে মিলিয়ে দেখে বললেন, 'ঠিক আছে।' তারপর হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুলে ডায়াল করলেন।

শ্রীলেখা কর্নেলের কথামতো 'আমি শ্রীলেখা ব্যানার্জি বলছি' আওড়াতে শুরু করলেন। বার দশেক বলার পর লক্ষ্য করলাম ওঁর মুখে চমক খেলে গেল। 'হ্যাঁ, আমি শ্রীলেখা ব্যানার্জি বলছি। তোমার ঘড়িটা···শুনুন! হিপিটাইপ একটা লোক আজ আমার অফিসে দেখা করেছে। সে বলছিল, আমার স্বামীর অ্যাকসিডেন্টের জায়গায় সে ঘড়িটা কুড়িয়ে পেয়েছে।··পাঁচ হাজার টাকা চাইছিল। দিস ইজ অ্যাবসার্ড! আমি অত টাকা··কী আশ্চর্য! আপনি অকারণ আমাকে··ওকে! ওকে! মেনে নিচ্ছি আপনারই রিস্টওয়াচ। তো আপনি খুঁজে বের করুন।··ডিটেকটিভ? প্লিজ লিস্‌ন্‌! মিঃ হালদার আমার শ্বশুরের বন্ধু। তাই ন্যাচারালি··কর্নেল নীলাদ্রি সরকার-··ডু ইউ নো হিম?···খুলে বলি শুনুন! কর্নেল সায়েবের কাছে গিয়েছিলাম অন্য একটা ব্যাপারে!···না, না। আপনার ব্যাপারে মোটেই নয়। ···হ্যাঁ, উনি এখন নিচের ঘরে আছেন। বাট হোয়াই আর ইউ শ্যাডোয়িং মি, ম্যান? এ সব আমার বিজনেস সংক্রান্ত ব্যাপার।··দেন ইউ গো টু হেল!'

ফোন রেখে দিলেন শ্রীলেখা। নাসারন্ধ্র স্ফীত। মুখে আগুন জ্বলছে। বুঝলাম, যতটা নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল ভদ্রমহিলাকে, ততটা মোটেই নন। প্রয়োজনে রণরঙ্গিনী মূর্তিও ধরতে পারেন।

কর্নেল গম্ভীর। হালদারমশাই হতবাক হয়ে নস্যি নিচ্ছিলেন। এবার বললেন, 'কী কাণ্ড!'

কর্নেল কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, 'এ ঘরে নো স্মোকিং লেখা আছে। কম্পিউটারের প্রাণরক্ষার জন্য। যাই হোক, চুরুট খাওয়ার জন্য

বাইরে যাব বরং।'

শ্রীলেখা বললেন, 'আপনি যে এ বাড়িতে এসেছেন লোকটা তা জানে। তার মানে ওর চরেরা নজর রেখেছে।'

শোনামাত্র হালদারমশাই সবেগে বেরিয়ে গেলেন। ওঁকে বাধা দেওয়ার সুযোগই দিলেন না কাউকে। কর্নেল হাসলেন। 'আমার ধারণা ঠিকই ছিল দেখা যাচ্ছে। ধড়িবাজ লোক। কিন্তু হালদারমশাই আবার অকারণ ঝামেলা না বাধান। মিসেস ব্যানার্জি, আপনি প্লিজ আপনার দারোয়ান বা সারভ্যাণ্টকে হালদারমশাইয়ের খোঁজে বেরুতে বলুন। উনি সম্ভবত গলির ভেতরই কোথাও ওত পাততে গেলেন।'

শ্রীলেখা বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে মালতী এসে ট্রে গুছিয়ে নিয়ে গেল। তার মুখ কেন যেন এখন বেজায় গম্ভীর।

কর্নেল চোখ বুজে আওড়ালেন, 'ম্যান ক্যান নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন। বাট ক্যান এনি ম্যান লিভ উইদাউট ব্রেড?'

বললাম, 'সাবধান কর্নেল! আপনি কিন্তু সত্যি পাগল হয়ে যাবেন। আজ সকাল থেকে ব্রেড আপনাকে ভূতে পাওয়ার মতো পেয়ে বসেছে।'

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। 'কী বললে? কী বললে?'

'বলছি ব্রেড আপনাকে—'

'ব্রেড! বি আর ই এ ডি। ফাইভ লেটারস! মাই গুডনেস!' বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সোজা কম্পিউটারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

চাপা গলায় বললাম, 'আপনি কম্পিউটারটার বারোটা বাজাবেন কিন্তু! আপনি কখনও কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়েছেন বলে শুনিনি।'

কর্নেল কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকেছেন, এমন সময় শ্রীলেখা ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন, 'কর্নেল সরকার! প্লিজ ডোণ্ট টাচ। ভেরি সেনসিটিভ কম্পিউটার।'

'মিসেস ব্যানার্জি! আপনার স্বামীর ফাইভ লেটারস কী ওয়ার্ড আমি জানি। প্লিজ লেট মি সি হোয়াট দা মেশিন স্পীকস টু মি।'

শ্রীলেখা আবার বললেন, 'প্লিজ ডোণ্ট টাচ দা মেশিন কর্নেল সরকার।'

কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না। খটাখট্ শব্দ শুনলাম। ভিসন স্ক্রিনে নিমেষে নীল রঙ এবং সেই রঙের ওপর সারবন্ধ কালো বর্ণমালা ফুটে উঠল। তারপর কর্নেল পাশ থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে বোতাম টিপে যন্ত্রটা বন্ধ করলেন।

শ্রীলেখা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কর্নেল কাগজটা পড়ে নিয়ে বললেন, 'মিঃ ব্যানার্জির নীলডায়াল ঘড়িটা পেলে অসম্পূর্ণ তথ্য সম্পূর্ণ হবে। ঘড়িটার ডায়ালের উল্টোদিকে কিছু সংখ্যা আছে। তবে আই অ্যাম ভেরি সরি মিসেস ব্যানার্জি—সত্যের খাতিরে বলছি, আপনার স্বামী

আপনাকে ইদানীং বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কেন পারছিলেন না, তা আপনারই জানার কথা।'

শ্রীলেখা সোফায় বসে পড়লেন। ভাঙা গলায় বললেন, পেপার শিটটা দেখতে পারি?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। কেন আপনি আপনার স্বামীর আস্থা হারিয়েছিলেন?'

'জয় একথা লিখেছে?' কাঁপা-কাঁপা গলায় কথাটা বলে শ্রীলেখা ঠোঁট কামড়ে ধরলেন।

'হ্যাঁ।' বলে কর্নেল কাগজটা ভাঁজ করে জ্যাকেটের ভেতরপকেটে চালান করে দিলেন। তারপর এগিয়ে এসে আগের জায়গায় বসলেন। 'কোনও মহিলার ব্যক্তিগত গোপনীয় ব্যাপার জানার একটুও আগ্রহ আমার নেই মিসেস ব্যানার্জি! আপনি অন্তত আভাসে জানাতে পারেন। আমার জানা দরকার। কারণ আমি এই রহস্যের জট ছাড়াতে নেমেছি। আমার এই এক অভ্যাস। শেষ পর্যন্ত না পৌঁছতে পারলে নিজেকে ব্যর্থ মানুষ মনে হয়।'

শ্রীলেখা ঈষৎ ঝুঁকে দু হাতে মুখ ঢাকলেন।

'মিসেস ব্যানার্জি, আমি আপনার হিতৈষী।'

আত্মসম্বরণ করে চোখের জল মুছে শ্রীলেখা বললেন, 'জয়কে আমি খুব লিবারাল অ্যান্ড মডার্ন ভাবতাম। জানতাম না, হি ওয়াজ সো জেলাস অ্যান্ড—সো ফুলিশ, সো মিনমাইন্ডেড পার্সন।'

'আমার ধারণা আপনি এমন কারও সঙ্গে মেলামেশা করতেন, মিঃ ব্যানার্জি যাকে পছন্দ করতেন না। অথবা এমনও হতে পারে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল আপনি তার সঙ্গে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত?'

শ্রীলেখা তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বরে বললেন, 'কিসের চক্রান্ত?

কর্নেল আস্তে বললেন, 'ঘড়িটা পেলে তা খুঁজে বের করতে পারব। তবে মিঃ ব্যানার্জির সন্দেহ করার শক্ত কারণ থাকা সম্ভব। আপনি কি কারও সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতেন বা এখনও করেন?'

'বাট হি ওয়াজ হিজ ডিয়ারেস্ট ফ্রেন্ড!' শ্রীলেখা ক্ষুব্ধভাবে বললেন। 'তা ছাড়া সে তো এখন আমেরিকা চলে গেছে। আর মেলামেশার কথা যদি বলেন, জয়ই তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা ঠিক। কিন্তু তা বন্ধুতার সম্পর্ক মাত্র। তার এতটুকু বেশি নয়।'

'কে তিনি? কী করতেন?'

'অনীশ রায়। একটা বিজনেস কনসালট্যান্সি ফার্ম খুলেছিল। চলেনি।

বন্ধ করে দিয়ে মাসখানেক আগে বোস্টনে গিয়ে একটা কাজ জুটিয়েছে। যাওয়ার পর আমাদের দুজনকে একই সঙ্গে একটা চিঠি লিখেছিল। দ্যাটস অল।'

'অনীশ ছাড়া আর কোনও—'

শ্রীলেখা শক্তমুখে বললেন, 'না।'

'একটু ভেবে বলুন।'

'না। অনীশ ছাড়া আমি কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে মিশিনি। এখনও মিশি না।'

'তাহলে মিঃ ব্যানার্জির এই গোপনীয়তার ব্যাপারটা অন্য দিক থেকে ভেবে দেখতে হবে।'

'বাট হোয়াট আর দোজ কী লেটারস?'

'আপনার নিরাপত্তার স্বার্থে এখন তা জানানো উচিত হবে না।' কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। 'আমার চুরুটের নেশা পেয়েছে। আর হালদার-মশাই কোথায় গেলেন তাও দেখা দরকার। মিসেস ব্যানার্জি, কথা দিচ্ছি— শুধু কী ওয়ার্ডস কেন, সবকিছু আপনাকে জানাব। কিন্তু আমার অনুরোধ, এখন থেকে এই ঘরটা লক করে রাখুন। কেউ যেন এ ঘরে না ঢোকে। এমন কি, আপনার পি এ সুদেষ্ণাকেও এ ঘরে ঢুকতে দেবেন না। আপনি একা ঢুকতে পারেন। কিন্তু সাবধান! আপনার কথাতেই বলছি, ডোণ্ট টাচ দা মেশিন।'

শ্রীলেখা আগের মতো নিষ্প্রভ! উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাকে বলছি, ওই কম্পিউটার আমি ব্যবহার করার সাহস পাইনি। আমার ভয় ছিল, ভুল লেটারে আঙুল পড়লে সব কোডিফায়েড ডেটা নষ্ট হতে পারে।'

'একজ্যাক্টলি। যাই হোক, ওয়েট অ্যান্ড সি। চিন্তার কারণ নেই।'

আমরা পোর্টিকোতে নেমে গিয়ে আবার কুকুরের গর্জন শুনলাম। শ্রীলেখা ডাকলেন, 'সুরেনদা!'

গেটের কাছ থেকে সাড়া এল। 'আমি এখানে আছি দিদিভাই! বদ্রী আমাকে এখানে থাকতে বলে গেল, এদিকে মোড়ে কী গণ্ডগোল হচ্ছে শুনছি।'

কর্নেল বললেন, 'কোনদিকের মোড়ে?'

'ডানদিকের মোড়ে স্যার!'

কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত! গাড়ির দরজা খোলো।'

আমি লক খুলে স্টিয়ারিঙের সামনে বসলাম। কর্নেল বাঁদিকে বসলেন। স্টার্ট দিয়ে বেরুনোর সময় দেখলাম, শ্রীলেখা একটা প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ানের গলার চেন ধরে গেটের দিকে আসছেন। সুরেন গেট খুলে দিল। শ্রীলেখা

বললেন, 'সুরেনদা ! তুমি গিয়ে বদ্রীকে ডেকে আনো। গেট বন্ধ করে যাও।'

আমরা এসেছিলাম বাঁদিক থেকে। কর্নেলের নির্দেশে ডানদিকে চললাম। সুরেন আমাদের গাড়ির পেছনে আসছিল। তাগড়াই চেহারার লোক।

বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেখলাম একটা ছোটখাটো রকমের ভিড় জমেছে। একটা মোটরসাইকেল কাত হয়ে পড়ে আছে সেখানে। হালদারমশাই হাত-মুখ নেড়ে ভিড়কে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছেন। আমাদের দেখেই বলে উঠলেন, 'বান্দরটা মোটরসাইকেল ফ্যালাইয়া পলাইয়া গেল। সেই হিপি, কর্নেলস্যার !'

কর্নেল নেমে গিয়ে মোটরসাইকেলটা দেখে নোট বইয়ে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার টুকে নিলেন। এই সময় একটা লোক কর্নেলকে সেলাম দিয়ে বলল, 'আমি বদ্রী আছে স্যার ! আমি না এলে এই বাবুসায়েবের বহত মুশকিল হতো।'

হালদারমশাই তেড়ে এলেন। 'শাট আপ ! তুমি আমাকে আচমকা না ধরলে হালার ঠ্যাঙে গুলি করতাম !'

কর্নেল বললেন, 'সেই হিপিকে দেখেই গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছিলেন নাকি ?'

হালদারমশাই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'না বান্দরটারে তো আমিই বাঁচাইয়া দিছি। এখানে মোটরসাইকেল টার্ন দিছে, আমিও আসতাছ, আচমকা একটা লোকে এই গাছের আড়াল থেকে অরে অ্যাটাক করতে ছুটল। তার হাতে ড্যাগার ছিল। আমি তখনই রিভলভার তুলছি। হঃ ! একখান গুলি ছুঁড়ছি। জাস্ট টু থ্রেটেন দা অ্যাসাসিন।' বলে হালদারমশাই ভিড়ের দিকে তর্জনী তুললেন। 'দা ফুলিশ মব ! আমারে গুণ্ডা ভাবছে। কয় কী, আমি মোটরসাইকেল ছিনতাই করছিলাম।'

'কে কোনদিকে পালাল বলুন ?'

'দুইজনই গলি দিয়া গেছে। আমি ফলো করব কী—এই ফুলিশ মব আমারে আটকাইল। দেন দিস ফুলিশ ম্যান আমারে জাপটাইয়া ধরল।' বলে গোয়েন্দাপ্রবর বদ্রীর দিকে তর্জনী তুললেন।

বদ্রীনাথ বলল, 'হাঁ, হাঁ। আমি কেমন করে জানব কী ঝামেলা হচ্ছে ? তো দো আদমি আমার পাশ দিয়ে আগে পিছে ভেগে গেল।'

হালদারমশাই এতক্ষণে সুযোগ পেলেন এবং গলিরাস্তায় সবেগে উধাও হয়ে গেলেন। কর্নেল বললেন, 'বদ্রী ! তুমি আমার এই কার্ড নিয়ে থানায় চলে যাও। ।ও সি বা ডিউটি অফিসার যাকে পাও, কার্ড দেখিয়ে শীগগির আসতে বলো। কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে, আমি এখানে আছি। একটা ঝামেলা হয়েছে। ব্যস ! আর কিছু বলবে না।'

বদ্রী চলে গেল। ততক্ষণে আরও লোক এসে জড়ো হয়েছে। নানা জল্পনা চলছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা রঙ ছড়িয়ে ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে। কর্নেল পকেট থেকে ছোট্ট টর্চ বের করে মোটরসাইকেলটা আবার খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন।

সুরেন বলল, 'স্যার! দিদিভাই ওয়েট করছেন! আমি গিয়ে খবরটা দিই।'

কর্নেল চাপা গলায় বললেন, 'হুঁ্যা। তুমি যাও। তবে তোমার দিদিভাই যদি এখানে আসতে চান, বারণ করবে। ওঁকে বলবে, আমি বলেছি উনি যেন বাড়ি থেকে রাত্রে বের না হন।'

সুরেন হন্তদন্ত চলে গেল।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'জয়ন্ত! গাড়িতে গিয়ে বসো।'…

মিনিট দশের মধ্যেই পুলিশের জিপ এল। বুঝলাম থানা এখান থেকে দূরে নয়। জিপ থেকে একজন অফিসার নেমে সহাস্যে বললেন, 'আবার কী ঝামেলা বাধালেন কর্নেলসায়েব?'

'বিনয়! এই মোটরসাইকেলটা সিজ করে নিয়ে যাও! কালকের মধ্যে মোটরভেহিকেলস থেকে জেনে নেবে এর মালিক কে?'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

কর্নেল হাসলেন। 'আমি ঘটনার পরে এসেছি। কাজেই প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জেনে নাও। আমি চলি। থানায় ফিরে আমাকে রিং কোরো অথবা আমিও রিং করতে পারি। আচ্ছা, চলি!'…

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল অভ্যাসমতো 'কফি' হাঁকলেন না। ইজিচেয়ারে বসে হেলান দিয়ে জ্বলন্ত চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর মিটিমিটি হেসে বললেন, 'তুমি বলছিলে আমি কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়েছি কিনা।'

বললাম, 'নিয়েছেন বুঝতে পেরেছি। তবে বলেননি এই যা!'

'কম্পিউটারের যুগ। আমি পাখি প্রজাপতি ক্যাকটাস অর্কিড ইত্যাদি বিষয়ে এ যাবৎ যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার পরিমাণ কম নয়। কিন্তু ক্ল্যাসিফিকেশন এবং অ্যানালিসিস করে সেগুলো সাজাতে পারলে প্রকৃতি এবং জীবজগৎ সম্পর্কে নতুন কথা জানা যাবে—এটা আমার বিশ্বাস। কিন্তু সেই পেপার ওয়ার্ক করা খুব পরিশ্রমসাধ্য। একটা কম্পিউটার থাকলে কাজটা খুব সহজ হয়। কাজেই সপ্তাহে চারদিন আমি কাছেই একটা ট্রেনিং সেন্টারে যাই। প্রাইমারি কোর্স শেষ করেছি। পরের কোর্স শেষ হলে একটা কম্পিউটার কিনে ফেলব। না—শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজ থেকে নয়। ওঁদের পার্সোনাল কম্পিউটার আমার কাজের উপযুক্ত নয়।'

ষষ্ঠীচরণ পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে বলল, 'বাবামশাই, কফি খাবেন না?'

'আধঘণ্টা পরে।'

ঘড়ি দেখে বললাম, 'প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। এত রাতে ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে আমাকে ফিরতে হবে।'

কর্নেল হাসলেন। 'তবু তোমার তাড়া দেখছি না। কারণ তুমি মিঃ ব্যানার্জির কম্পিউটারাইজড্ স্টেটমেণ্ট সম্পর্কে আগ্রহী।'

ওঁর ভঙ্গি নকল করে বললাম, 'দ্যাটস রাইট।'

কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে কাগজটা বের করে আমাকে দিলেন। তারপর চোখ বুজে হেলান দিলেন। কাগজের ভাঁজ খুলে দেখি, ইংরেজিতে টাইপ করা কিছু বাক্য—যার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়ঃ

"কোনও মানুষ জানে না পরের মুহূর্তে কী ঘটতে পারে। তাই আমি আমাদের পারিবারিক গোপন তথ্য এই কম্পিউটারে কোডিফায়েড করে রাখলাম। ৭টা সংখ্যা এর সংকেত। সংখ্যাগুলো পাছে ভুলে যাই, তাই বাবার নীলডায়াল রোমার হাতঘড়ির পেছনে খোদাই করেছি। শ্রীলেখার কাছে আমার গোপন করা উচিত হচ্ছে না। কিন্তু তার প্রতি আস্থা রাখতে পারলাম না। ইদানীং তার আচরণ-হাবভাব দেখে মনে হয়েছে, সে আগের শ্রীলেখা নয়। আমার সন্দেহ, সে আমার আড়ালে এমন কিছু করে, যা আমার পক্ষে ক্ষতিকর। আমি জানি শ্রীলেখা অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে—বিপজ্জনক ভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী (ডেঞ্জারাসলি অ্যাম্বিসাস)। তার অসাধ্য কিছু নেই।'...

কাগজটা কর্নেলকে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ। ভদ্রমহিলা সম্পর্কে আমারও ধারণা হয়েছে শি ইজ ডেঞ্জারাসলি অ্যাম্বিসাস।'

কর্নেল বললেন, 'মহিলা অমন একটা কোম্পানি চালাচ্ছেন বলে? ডার্লিং! তোমার মধ্যে মেল শোভিনিজম লক্ষ্য করেছি। জগৎটা কী দ্রুত বদলাচ্ছে, তা তোমার চোখে পড়ে না।'

'শ্রীলেখার অফিসে খোঁজ নিন। দেখবেন কোনও পুরুষমানুষ ওঁর গার্জেন হয়ে উঠেছেন।' আমি উঠে দাঁড়ালাম! 'হালদারমশাই শেষ অব্দি কী করলেন, জানার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি ভীষণ ক্লান্ত।'

কর্নেল দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে অভ্যাসমতো বললেন, 'গুড-নাইট! হ্যাভ এ নাইস স্লিপ।'...

সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন বিছানায় শুয়েছি, তখন হঠাৎ মাথায় এল, হিপিটাইপ সেই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান যুবক কি ফাইভ লেটারস কী ওয়ার্ডের কথা জানে? কেন সে ওই কথাগুলো আওড়ায় এবং টেলিফোনেও শ্রীলেখা ব্যানার্জিকে কথাগুলো বলে উত্ত্যক্ত করে?

এই পয়েন্টটা আগে মাথায় এলে কর্নেলকে বলতাম। হালদারমশাই বলছিলেন 'রুটি-রহস্য।' সত্যিই তা-ই। রুটি—'ব্রেড' শব্দটাই শেষাবধি এই রহস্যের একটা চাবিকাঠি হয়ে উঠল!…

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যাচ্ছি, তখন টেলিফোন বাজল। বিরক্ত হয়ে ফোন তুলে অভ্যাসমতো বললাম 'রং নাম্বার!'

'রাইট নাম্বার, ডার্লিং!

'সরি! মর্নিং, ওল্ড বস্!'

'মর্নিং জয়ন্ত! সাড়ে আটটা বাজে। এখনই চলে এস। আমার এখানে ব্রেকফাস্ট করবে।'

'কী ব্যাপার? হালদারমশাইয়ের—'

'না। গতরাতে তোমার ঘুম ভাঙাতে চাইনি। কিন্তু যে ভয় করেছিলাম, তা-ই হয়েছে। সেই অ্যাংলোইন্ডিয়ান যুবক গত রাতে খুন হয়েছে। আততায়ী তার পিঠে ছুরি মেরেছিল। সেই অবস্থায় সে পাঁচিল ডিঙিয়ে শ্রীলেখা ব্যানার্জির বাড়িতে ঢোকে। তারপর—না, ফোনে বলে বোঝাতে পারব না। তুমি এখনই চলে এস।'…

চার

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি, হালদারমশাই মনমরা হয়ে বসে আছেন। কর্নেলের মুখে যে ঘটনা শুনলাম, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনই সাংঘাতিক।

তখন রাত প্রায় এগারোটা। শ্রীলেখা ব্যানার্জির অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা রাত্রে ছাড়া থাকে। বদ্রীনাথের ঘরে সুরেন মোটরসাইকেলের ঘটনাটা নিয়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছিল সেই সময় কুকুরটা প্রচণ্ড গর্জন শুরু করে। ওরা দুজনেই বেরিয়ে দেখে কুকুরটা পাঁচলের ওপর ওঠার চেষ্টা করছে। ওখানে ঘন ঝোপ-ঝাড় এবং একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে। আলো কম। দুজনে দুটো লাঠি আর টর্চ নিয়ে দৌড়ে যায়। সেই মুহূর্তে একটা লোক পাঁচিল থেকে হুড়মুড় করে ঝোপে পড়ে যায়। সুরেন কুকুরটাকে আটকায় এবং টর্চের আলো ফেলে চমকে ওঠে।

কিন্তু তখনও দুজনে জানত না, লোকটার পিঠে একটা ছুরি বিঁধে আছে। সে যন্ত্রণার্ত কন্ঠস্বরে অতি কষ্টে বলে, 'মাড্যামকো বোলাও!'

শ্রীলেখা তখনও শুয়ে পড়েননি। দোতলার ব্যালকনি থেকে জানতে চান কী হয়েছে। তারপর নেমে আসেন। পাঁচিলের কাছে গিয়ে তিনিও

চমকে ওঠেন। হিপিটাইপের এক অ্যাংলোইন্ডিয়ান যুবক ঝোপের ভেতর হাঁটু দুমড়ে বসে আছে। সে জড়ানো গলায় বলে, 'টেক ইট! টেক ইট!'

তার হাতে ছিল একটা ঘড়ি। সেই নীলডায়াল রোমার রিস্টওয়াচ।

ঘড়িটা কম্পিত হাতে শ্রীলেখা তার হাত থেকে নেন। তারপরই যুবকটি উপুড় হয়ে পড়ে যায়। তখন ওঁরা দেখতে পান তার পিঠে একটা ছুরি বিঁধে আছে।

শ্রীলেখা বুদ্ধিমতী। পুলিশকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু ঘড়িটার কথা বলেননি। সুরেন এবং বদ্রীনাথকেও কিছু বলতে নিষেধ করেন। পুলিশ সুরেন বা বদ্রীকে জেরা করার পর আবিষ্কার করে, যুবকটিকে ছুরি মারা হয়েছে বাইরে। ওদিকটায় একটা মোটর গ্যারেজ এবং পোড়ো এক টুকরো জায়গা আছে। সেখান থেকে রক্তের ছাপ এগিয়ে এসেছে পাঁচলের দিকে। পুলিশ বলেছে, এই সেই রুটি ছিনতাইকারী পাগল।

হালদারমশাই ওদিকটায় ঘোরাঘুরি করেছিলেন বটে, কিন্তু মোটর গ্যারেজের পাশে পোড়ো জায়গায় অন্ধকার ছিল। ওখানে কী ঘটছে গলির মোড় থেকে তা তাঁর চোখে পড়ার কথাও নয়। তিনি প্রায় ঘন্টাখানেক পরে তাঁর মক্কেলের বাড়ির কাছে এসে টের পান, বাড়িতে একটা কিছু ঘটেছে। পরে পুলিশ তাঁকে জেরা করেছে। কিন্তু বুদ্ধিমতী শ্রীলেখা তাঁর একজন আত্মীয় বলে পরিচয় দেন।

হালদারমশাই ওখান থেকেই কর্নেলকে ফোন করেছিলেন। কর্নেল তখনই বেরিয়ে পড়েন। নোনাপুকুর ট্রামডিপোর কাছে একটা ট্যাক্সি পেয়ে যান। শ্রীলেখার বাড়িতে তখনও পুলিশ ছিল। রক্তাক্ত যুবকটিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেছেন তাকে। কর্নেল শ্রীলেখাকে ডেকে নিয়ে দোতলায় যান। ঘড়িটা ওঁর কাছে চেয়ে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে কম্পিউটারের সামনে বসেন। ঘড়ির পিছনে কয়েকটা সংখ্যা খোদাই করা ছিল। আতসকাচে সেগুলো দেখে সাবধানে সংখ্যা-গুলোর বোতাম টেপেন। আগের মতো একটা টাইপকরা কাগজ বেরিয়ে আসে। কাগজটা তিনি শ্রীলেখাকে পরে দেখাবেন বলেছেন। শ্রীলেখা ওই অবস্থায় তাঁকে অবশ্য পীড়াপীড়ি করেননি। তবে শ্রীলেখার অগোচরে দুটো কোডিফায়েড ডেটাই কর্নেল কম্পিউটার থেকে মুছে নষ্ট করে দিয়েছেন।

কর্নেলের ড্রয়িংরুমেই ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে ঘটনাটা শুনলাম। কালকের মতো আজও কর্নেল সকাল-সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে নিলেন। হালদার-মশাইয়ের খুব ধকল গেছে। তবু পুলিশ জীবনের ট্রেনিং এখনও কাজে লাগে। আসার পথে ব্রেকফাস্ট করেছেন। ষষ্ঠী এবার কফি আনলে বেশি দুধমেশানো ওঁর নির্দিষ্ট পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। আপনমনে

শুধু বললেন, 'ভেরি স্যাড!'

বললাম, 'দুটো প্রশ্ন আমার মাথায় আসছে।'

কর্নেল গলার ভেতর বললেন, 'বলো!'

'এক ঃ যুবকটি ম্যান ক্যান নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন ইত্যাদি আওড়াত। তার মানে সে ওই কম্পিউটারের ফাইভ লেটারস কী ওয়ার্ড ব্রেড কথাটা জানত। কিন্তু কেমন করে সে জানতে পেরেছিল? দুই ঃ কড়েয়া থানায় তাকে পুলিশ সার্চ করে কোনও রোমার ঘড়ি পায়নি। ঘড়িটা তখন সে কোথায় রেখেছিল?'

'যে যুবক মোটরসাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াত, তার একটা নির্দিষ্ট ডেরা থাকতে বাধ্য। ঘড়িটা সেখানে লুকিয়ে রাখত সে।' বলে কর্নেল মাথা নাড়লেন। 'না এখনও এর প্রমাণ পাইনি। কিন্তু তোমার প্রথম প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর এ ছাড়া আর কী হতে পারে? আর ব্রেড—হ্যাঁ। এই কথাটা সে জানত। মিসেস ব্যানার্জিকে তার উড়ো ফোনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তাঁর দিক থেকে একটা আগ্রহ সে আশা করেছিল। কিন্তু আমরা জানি, উনি তার উড়ো ফোন শুনে একটুও আগ্রহ দেখাতে চাননি। তৎক্ষণাৎ ফোন নামিয়ে রাখতেন। কেন এমন করতেন, তা-ও স্পষ্ট। কেউ তাঁকে উত্ত্যক্ত করছে ভাবতেন। কোনও যুবতীর পক্ষে এটাই কি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নয়? আজকাল টেলিফোনে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার খবর প্রায়ই বেরোয়।'

হালদারমশাই বললেন, 'আমার ক্লায়েন্টেরে কেউ ঘড়ির জন্য থেটেন না করলে উনি আমার লগে যোগাযোগ করতেন না। তাই না কর্নেলস্যার?'

'তা ঠিক। তবে ব্রেড শব্দের রহস্য যুবকটি জানত। জয়ন্ত যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন তুলেছে। কী ভাবে জেনেছিল? কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ প্রশ্নের উত্তর অন্তত তার মুখ থেকে আর পাওয়া যাবে না। হি ইজ ডেড।' কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, 'মিসেস ব্যানার্জিকে সে চিঠি লিখেই বা কোনও কথা জানায়নি কেন? এ-ও আশ্চর্য?'

বললাম, 'তার আচরণ অদ্ভুত! সরাসরি ওঁর সঙ্গে দেখা করতেও পারত।'

'সাহস পায়নি। শ্রীলেখার অফিস এবং বাড়িতে তার প্রতিপক্ষ সারাক্ষণ নজর রেখেছিল, এটা স্পষ্ট। গত রাতে মরিয়া হয়ে শ্রীলেখার সঙ্গে দেখা করতে যায় সে। তাই তাকে মারা পড়তে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! ঘড়িটা সে শ্রীলেখাকে শেষ পর্যন্ত ফেরত দিতে পেরেছে। তার যেন একান্ত উদ্দেশ্য ছিল দুর্ঘটনার পর জয়দীপ ব্যানার্জির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ঘড়িটা তাঁর স্ত্রীকে ফেরত দেওয়া। তাই না?'

বুঝলাম প্রাজ্ঞ রহস্যভেদী তাঁর থিওরি সাজিয়ে ফেলেছেন এবং তাতে

কোনও দুর্বল পয়েন্ট আছে কি না বুঝতে চাইছেন। হালদারমশাই অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হুঃ!' আমি বললাম, 'জয়দীপকে সে জগিংয়ের সময় উত্ত্যক্ত করত—শ্রীলেখা বলেছিলেন। দুর্ঘটনার আগের মুহূর্তে তাকে জয়দীপের পেছনে দৌড়তে দেখা গেছে—জনৈক ঠিকা শ্রমিক বাবুয়ার স্টেটমেন্ট অনুসারে হেস্টিংস থানার ট্রাফিক সার্জেন্ট আপনাকে একথা বলেছেন। কর্নেল!' উত্তেজনায় আমি নেড়ে উঠলাম। 'সে কি জানত জয়দীপের হাতের ঘড়িটা সে ছিনিয়ে না নিলে অন্য কেউ ছিনিয়ে নেবে এবং ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যই অন্য কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল?'

কর্নেল বললেন, 'তুমি বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন তুলেছ। ঠিক তা-ই।'

'তা হলে তাকে সৎ এবং বিবেকবান বলতে হয়।'

'সো ইট অ্যাপিয়ারস। আপাতদৃষ্টে তার আচরণ থেকে এরকম ধারণা অবশ্য করা চলে। কিন্তু যতক্ষণ না তার পুরো পরিচয় জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ তাকে ফুলমার্ক আমি দিতে পারছি না। আমাদের সামনে এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সে জয়দীপের কম্পিউটারে ফিড করা কোডিফায়েড ডেটা সম্পর্কে অবহিত ছিল। বাট হাউ?' বলে কর্নেল হালদারমশাইয়ের দিকে তাকালেন। 'হালদারমশাই! পুলিশ অফিসিয়াল প্রসেসে কাজ করে। পুলিশকে থ্রু প্রপার চ্যানেলে এগোতে হয়। এটা একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আপনি একবার বলেছিলেন মনে পড়ছে, মোটরভেহিকেলস ডিপার্টমেন্টে আপনার জানাশোনা লোক আছে।'

হালদারমশাই ঝটপট বললেন, 'আছে। আমার এক ভাগ্না।'

'আপনি মোটরসাইকেলটার মালিকের নাম ঠিকানা যোগাড় করে দিতে পারবেন?'

হালদারমশাই ঘড়ি দেখে নিয়ে যথারীতি 'যাই গিয়া' বলে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'বডি শনাক্ত হয়েছে কি না খবর নেওয়া উচিত। নিয়েছেন?'

কর্নেল বললেন, 'এখন পর্যন্ত সে-খবর পাইনি। পুলিশের অনেক ইনফরমার থাকে। দেখা যাক।'

'ওর পকেটে নিশ্চয় কোনও কাগজপত্র আছে?'

'কিছু পাওয়া যায় নি।'

'মোটরসাইকেলের ডকুমেন্টস, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পলিউশন সার্টিফিকেট—'

'নাথিং।'

'অদ্ভুত তো! আচ্ছা কর্নেল, গত পরশু কড়েয়া থানায় ওকে সার্চ করেছিল পুলিশ। তখনও কি কোনও কাগজপত্র পাওয়া যায়নি?'

'নাহ্‌। শুধু হিপপকেটে নগদ শ'তিনেক টাকা, ডান পকেটে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর বাঁ পকেটে একটা রুমাল। ডান পকেটে কিছু খুচরো পয়সাও ছিল। আর একটা লাইটার।'

'সিটিজেন রিস্টওয়াচ ছিল কিন্তু!'

'হুঁ। দ্যাট্‌স্‌ অল।'

'গত রাতের সেই রিস্টওয়াচটা ছিল না?'

'না।'

'মোটরসাইকেলটা সার্চ করা হয়েছে তো?'

কর্নেল হাসলেন। 'পার্টস বাই পার্টস অবশ্য খোলা হয়নি।'

'তার মানে কিছু পাওয়া যায়নি। অদ্ভুত! সত্যিই অদ্ভুত! কর্নেল! আপনি ওকে যতই ধুরন্ধর বা সেয়ানা বলুন, আমার এবার মনে হচ্ছে সত্যিই ওর মাথার গণ্ডগোল ছিল। ওই যে একটা কথা আছে, সেয়ানা পাগল!'

কর্নেল ঘড়ি দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো, বেরুনো যাক। শ্রীলেখা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আজ অফিস যাবেন না।'

নিচে গিয়ে গাড়িতে উঠে বললাম, 'জয়দীপের দ্বিতীয় ডেটা সম্পর্কে জানতে আগ্রহ হচ্ছে। কথায় কথায় ওটা ভুলে গিয়েছিলাম। সঙ্গে কাগজটা থাকলে দিন। চোখ বুলিয়ে নিই।'

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'আমার মাথাখারাপ যে সঙ্গে ওটা নিয়ে ঘুরব ভাবছ? তা ছাড়া তুমি গাড়ি ড্রাইভ করার সময় ওটা পড়বে এবং নির্ঘাত অ্যাকসিডেন্ট বাধাবে।'

'বলেন কী! ওতে কোনও সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর তথ্য আছে বুঝি?'

'থাক বা না থাক, ড্রাইভিংয়ের সময় অন্যমনস্কতা বিপজ্জনক।'

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে কর্নেল বললেন, 'জে সি বোড ধরে সোজা চলো। তারপর বাঁদিকে সার্কাস অ্যাভেনিউতে ঢুকে যাবে। একটা সাদা মারুতি সম্ভবত আমাদের ফলো করছে। না, না ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

ব্যাকভিউ মিররে পেছনে তেমন গাড়ি দেখতে পেলাম না। বললাম, 'গাড়িটা কোথায়?'

'পেছনে বাঁদিকে। একটা বড় ট্রাক ওকে এগোতে দিচ্ছে না। এক কাজ করো। থিয়েটার রোডের পরই বাঁদিকের গলিতে ঢুকে পড়ো। লুকোচুরি খেলা যাক।'

ভয় যে পাইনি, তা নয়। এই ভিড়ে আমার গাড়ির টায়ারে গুলি ছুঁড়ে ফাঁসানো সহজ। তারপর পেছনকার ট্রাক এসে আমার গাড়ির ওপর পড়লেই গেছি।

কিন্তু পেছনকার বিশাল ট্রাকের ড্রাইভার কোনও গাড়িকে পাশ কাটাতে

দিচ্ছে না। দ্বিমুখী রাস্তার মাঝ বরাবর ছোট ছোট আইল্যান্ড এবং উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির ঝাঁকও ঘন। থিয়েটার রোডের মোড়ে থামতে হলো। কর্নেল বাঁদিকের উইন্ডো দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে বললেন, 'সাদা মারুতিটা বাঁদিকের গলিতে ঢুকে গেল। তুমি বরং সিধে চলো। কারণ যে-গলিতে ও ঢুকল, তা বেজায় পেঁচালো। আমি সিওর এই এলাকা ওর অজানা। ওই গলিটার দুধারে মোটর গ্যারাজ, পুরনো পার্টসের ঘিঞ্জি দোকান। তা ছাড়া শেষপর্যন্ত যেখানে বেরুনোর রাস্তা পাবে, সেখানেও আবার পেঁচালো গলি।'

'আপনার কেন মনে হচ্ছে, ওই গাড়িটা আমাদের ফলো করছিল?'

'আজ সকালে জানালা থেকে লক্ষ্য করেছি গাড়িটা আমার অ্যাপার্টমেন্টের নিচে উল্টোদিকে একটা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেরুনোর সময়ও তাকে দেখলাম। তারপর সে আমাদের পিছু নিল।'

'নেমে গিয়ে বরং চার্জ করা উচিত ছিল। আপনার সঙ্গে তো লাইসেন্স্ড্ আর্মস আছে।'

কর্নেল প্রায় অট্টহাসি হাসলেন। 'রাস্তাঘাটে ফিল্মের নকল করতে বলছ ডার্লিং? এ বয়সে নাচন-কোঁদন ঢিসুম-ঢিসুম আমার সাজে না, অবশ্য তোমার তা সাজে। একজন হিরোইনও এক্ষেত্রে আছে।'

থিয়েটার রোডের মোড় পেরিয়ে গিয়ে বললাম, 'গাড়িটার নাম্বার নেওয়া উচিত ছিল। নিয়েছেন?'

'এ সব গাড়িতে ভুয়ো নাম্বারপ্লেট লাগানো থাকে।'

'আমাদের ফলো করে ওর কী লাভ?'

'আমার টাক ফুটো করবে বলেছিল হালদারমশাইকে! তবে—?'

'কর্নেল! আপনি ব্যাপারটা হালকাভাবে নেবেন না।'

কর্নেল এতক্ষণে গম্ভীর হলেন। বললেন, 'নাহ্। আর টাক ফুটো করবেন না। কারণ তা হলে জয়দীপ ব্যানার্জির গোপন তথ্য হাতানোর আশায় ছাই পড়বে। এখন ওর কাজ আমাকে শুধু ফলো করা।'

সার্কাস অ্যাভেনিউতে কিছুটা যাওয়ার পর কর্নেলের নির্দেশে ডানদিকের একটা গলিরাস্তায় ঢুকলাম। এবার চিনতে পারলাম বাড়িটা।

হর্ন শুনে বদ্রী গেট খুলে দিল। পোর্টিকোর তলায় গাড়ি রেখে দুজনে বেরোলাম। সুরেন দাঁড়িয়েছিল। সেলাম দিয়ে ওপরে নিয়ে গেল। গত সন্ধ্যায় যে ঘরে আমরা বসেছিলাম, সুরেন সেই ঘরে আমাদের ঢোকাল। একটু অবাক হয়ে বললাম, 'ঘরটা আপনি লক করে রাখতে বলেছিলেন!'

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, 'আজ সকালে ফোন করে বলেছি, আর লক করে রাখার দরকার নেই।'

কর্নেলের চোখে কৌতুক ঝিলিক দিল। দ্রুত বললাম, 'আপনি চাইছেন

এ ঘরে চোর এসে হানা দিক। ইজ ইট এ ট্র্যাপ, বস্ ?'

উনি ইশারায় চুপ করতে বললেন। শ্রীলেখা এলেন প্রায় পাঁচ মিনিট পরে। চেহারায় চঞ্চল বিভ্রান্ত ভাব। বললেন, 'আপনাদের বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত। আমার পি এ সুদেষ্ণা আজ আসেনি। মর্নিংয়ে অনেক জরুরি কাজ থাকে। আশ্চর্য ব্যাপার! ফোনেও জানাতে পারত। অগত্যা আমি রিং করলাম। কেউ ফোন ধরল না। দিস ইজ সামথিং অড।'

'সুদেষ্ণার পুরো নাম কী ?'

'সুদেষ্ণা দত্ত। আমার অবাক লাগছে, গত রাতে ওকে রিং করে আজ সাড়ে ছ'টার মধ্যে আসতে বললাম। এ-ও বললাম, একটা মিস-হ্যাপ হয়েছে। অফিস যাব না। তাই—'শ্রীলেখা বিরক্ত মুখে বললেন, 'সুদেষ্ণা এমন কখনও করে না। বর্ষার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি, রাস্তায় জল, রাফ ওয়েদার—তবু সে এসেছে।'

আমি বললাম, 'রিং হচ্ছে, কেউ ফোন ধরছে না। তার মানে, সুদেষ্ণা হয়তো বেরিয়েছিল এখানে আসার জন্য। পথে তার কোনও বিপদ হয়নি তো ?'

শ্রীলেখা চমকে উঠেছিলেন। আস্তে বললেন, 'কিন্তু ওর কী বিপদ হবে ? কেন হবে ?'

কর্নেল বললেন, 'সুদেষ্ণা কতদিন আপনার পি এ-র পোস্টে আছে ?'

'মাস দুয়েক। তার আগে অফিসে সে স্টেনোটাইপিস্ট ছিল। জয় আমার কাজে সাহায্যের জন্যই সুদেষ্ণাকে দিয়েছিল। শি ইজ সিনসিয়ার, অনেস্ট অ্যান্ড রিলায়েবল্ কর্নেল সরকার!'

'বিবাহিতা ?'

'না। নামের আগে মিস লেখে। ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলে।'

'সে থাকে কোথায় ?'

'গোবরা এরিয়ায়। ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজের ওদিকে—আমি চিনি না।'

'আপনি আর একবার রিং করে দেখুন।'

শ্রীলেখা টেলিফোন তুলে ডায়াল করে বললেন, 'রিং হয়ে যাচ্ছে আগের মতো। এই দেখুন।'

শ্রীলেখা কর্নেলের হাতে টেলিফোন দিলেন। কর্নেল একটু পরে ফোন রেখে বললেন, 'অবশ্য কলকাতার টেলিফোন হঠাৎ-হঠাৎ অচল হয়ে যায়। রিং ঠিকই হয়। কিন্তু আসলে লাইনটাই খারাপ। তো সুদেষ্ণার বয়স কত—আই মিন, আপনার চেয়ে নিশ্চয় কম ?'

'শি ইজ ইয়াং। অফিশিয়্যাল রেকর্ডে ঠিক কত বয়স লেখা আছে জানি না। জেনে বলতে পারি।'

'ঠিকানাটা আপনি জানেন ?'

'না। অফিস রেকর্ড থেকে ফোন করে জেনে নিতে পারি। কিন্তু আপনি কি ভাবছেন সত্যি তার কোনও বিপদ হয়েছে ?'

এই সময় মালতী তেমনই গম্ভীর মুখে ট্রেতে কফির পট পেয়ালা স্ন্যাকস ইত্যাদি নিয়ে ঘরে ঢুকল। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। শ্রীলেখা তাঁর কোম্পানি-অফিসে টেলিফোন করছিলেন। একটু পরে বললেন, 'শেখর···হ্যাঁ, শোনো! সুদেষ্ণা এখনও আসেনি। ওর বাড়ির ঠিকানাটা দরকার।···তুমি নিজে দেখ। কম্পিউটারাইজড করা আছে। দিস ইজ আর্জেন্ট। আমি ধরে আছি।···'

কিছুক্ষণ পরে একটা স্লিপে ঠিকানা লিখে শ্রীলেখা কর্নেলকে দিলেন। ফের বললেন, 'আপনি কি সত্যিই ভাবছেন সুদেষ্ণার কিছু হয়েছে ?'

কর্নেল মাথা নাড়লেন। 'নাহ্। জয়ন্তের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে আমার ভাবনাচিন্তা খুব কদাচিৎ মেলে। বাই দা বাই, এর আগে কখনও দরকার হলে আপনি সুদেষ্ণাকে কি রিং করেছেন ?'

'করেছি।'

'প্রতিবারই সুদেষ্ণা ফোন ধরেছে—নাকি কখনও অন্য কেউ ধরেছে ?'

'কখনও কখনও অন্য কেউ। সে সুদেষ্ণাকে ডেকে দিয়েছে।'

'মেল অর ফিমেল ?'

'মেল। সুদেষ্ণাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছিল, তার এক রিলেটিভ।' শ্রীলেখা ভুরু কুঁচকে কিছু স্মরণ করার পর ফের বললেন, 'সুদেষ্ণা বলেছিল, সে বাই চান্স বাইরে গেলে যে টেলিফোন ধরবে, তাকে যেন মেসেজটা দিই। তা হলে সুদেষ্ণা ফেরার পর আমাকে রিংব্যাক করবে। আমার ধারণা, শি ইজ লিভিং উইদ হার বয়ফ্রেন্ড। তবে ওর ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপারে আমি কোনও ইন্টারেস্ট দেখাইনি। জাস্ট ওর কথার সূত্রে আমার একটা প্রশ্ন মাত্র।'

'সুদেষ্ণা তার নাম বলেছিল ?'

'নাম—' শ্রীলেখা কর্নেলের দিকে তাকালেন। চশমার ভেতর থেকে তাঁর দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ দেখাল। 'কর্নেল সরকার! ডু ইউ ফিল এনিথিং রং উইদ মাই পি এ ?'

কর্নেল কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললেন, 'আই অ্যাম নট সিওর মিসেস ব্যানার্জি। আমার এই বদ অভ্যাস বলতে পারেন—যা কিছু জানতে চাই, তা যথাসাধ্য পুরোটা জেনে নিতে চেষ্টা করি।'

শ্রীলেখা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'মনে পড়ছে, সুদেষ্ণা একজ্যাক্টলি যা বলেছিল—বাই চান্স আমি বাইরে গেলে ববকে রিং করে মেসেজটা দেবেন।'

'বব ?'

'হ্যাঁ। সুদেষ্ণার সেই আত্মীয়ের ডাকনাম—দ্যাট ওয়াজ মাই ইম্প্রেশন্। তবে ঠিক এই নামটা শুনেও আমার মনে হয়েছিল বব ইজ হার বয়ফ্রেন্ড অ্যান্ড দে আর লিভিং টুগেদার।'

কর্নেল চুরুট বের করেই পকেটে ঢোকালেন। 'নো স্মোকিং' লেখা আছে একটা বোর্ডে, তা গতকাল সন্ধ্যায় দেখেছি। সেনসিটিভ পার্সোনাল কম্পিউটারের পক্ষে ধোঁয়া ক্ষতিকর। কর্নেল বললেন, 'বব বাংলায় না ইংরেজিতে কথা বলত?'

'ইংলিশ। সুদেষ্ণাও বাংলা খুব কম বলে।'

'ববের ইংলিশ উচ্চারণ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'পারফেক্ট প্রোনানসিয়েশন। আমার সন্দেহ হয়েছিল, সে বাঙালি কি না।'

'আই সি!' কর্নেল একটু হেসে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমার চুরুটের নেশা পেয়েছে। তা ছাড়া এখন আমি সত্যিই আপনার পি এ সম্পর্কে আগ্রহী।'

'বাট শি ইজ রিলায়েবল্ অ্যান্ড সিনসিয়ার, কর্নেল সরকার! এমনকি হতে পারে না সুদেষ্ণা তার সো-কল্ড বয়ফ্রেন্ড ববের সঙ্গে কোথাও যেতে বাধ্য হয়েছে? মে বি, হি ইনসিস্টেড হার টু অ্যাকম্প্যানি হিম, কর্নেল সরকার! খ্রিসমাস ইভে এটা খুব স্বাভাবিক।'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'সুদেষ্ণা দত্ত খ্রিশ্চিয়ান?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কী?'

'কথাটা গোড়ার দিকে জানলে আমি অন্তত দু'স্টেপ এগিয়ে যেতে পারতাম মিসেস ব্যানার্জি!'

'আপনি জিজ্ঞেস করেননি। করলে বলতাম।'

'আসলে অনেক সময় আমরা জানি না যে আমরা কী জানি!' বলে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ওঁকে অনুসরণ করলাম।

শ্রীলেখা আমাদের পিছনে আসছিলেন। সিঁড়িতে নামার সময় আর্ত-কণ্ঠস্বরে বললেন, 'কর্নেল সরকার! আপনি জয়ের ব্যক্তিগত কাগজপত্র খুঁজে দেখতে বলেছিলেন। আমি একটা অদ্ভুত চিঠি খুঁজে পেয়েছি। অনীশ রায়ের লেখা চিঠি। চিঠিটা দেখে যান।'

কর্নেল ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'এখন আমার প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান মিসেস ব্যানার্জি। আপনি অফিসে চলে যান। চিঠিটা নিয়ে যাবেন। আমি যথাসময়ে যাব। হ্যাঁ—আপনার অফিসে থাকা জরুরি। প্লিজ মিসেস ব্যানার্জি! শীগগির আপনি অফিসে যান। আমার অনুরোধ। কারণ আমার সন্দেহ, আপনার অ্যাবসেন্সে এমন কিছু ক্ষতি হতে পারে, দ্যাট মে স্ম্যাশ ইওর কোম্পানি।'

কর্নেল কথাগুলো বলেই হন্তদন্ত নেমে গেলেন। পোর্টিকোতে পৌঁছে

বললেন, 'কুইক জয়ন্ত ! আমরা এবার ন্যাশানাল মেডিক্যাল-কলেজের দিকে যাব।'...

বরাবর দেখে আসছি, কলকাতার নাড়ি-নক্ষত্র কর্নেলের জানা। সারাপথ ওঁকে প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করছিলাম, কারণ শ্রীলেখা ব্যানার্জির পি এ. সম্পর্কে ওঁর এই উত্তেজনা কেন তা বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু মাঝে মাঝে পথনির্দেশ ছাড়া আমার কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিলেন না।

রেলব্রিজের তলা দিয়ে এগিয়ে ঘিঞ্জি আঁকাবাঁকা গলিরাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে আমি তিতিবিরক্ত। এদিকটায় ঠাসাঠাসি বস্তিবাড়ি, মাঝে মাঝে কলকারখানার টানা পাঁচিল, কখনও ঝকঝকে নতুন দোতলা-তিনতলা ইটের বাড়ি। জগাখিচুড়ি অবস্থা। অবশেষে কর্নেলের নির্দেশে একখানে থামতে হলো।

বাঁদিকে একটা নতুন চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ি। নিচের তলায় সারবন্দি দোকান-পাট। ডানদিকে সংকীর্ণ একটা প্যাসেজ এবং তার পাশে টানা নিচু পাঁচিল। গাড়ি লক করে রেখে কর্নেলকে অনুসরণ করলাম। সেই প্যাসেজ দিয়ে কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি চোখে পড়ল। সিঁড়িতে ওঠার সময় প্রতিটি ফ্ল্যাটের নেমপ্লেটে যে সব নাম দেখলাম, তা থেকে অনুমান করা যায় এটা একটা কসমোপোলিটান বাড়ি। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষজন এর বাসিন্দা। তেতলায় একটা ফ্ল্যাটের দরজায় নেমপ্লেটে লেখা আছে, মিস এস দত্ত। কর্নেল বললেন, 'দরজায় তালা আটকানো দেখছি। মিসেস ব্যানার্জির অনুমান ঠিকই ছিল। তবু নিশ্চিত হওয়ার দরকার ছিল।'

এইসময় চরতলা থেকে এক ভদ্রলোক নেমে আসছিলেন। আমাদের দেখে একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর পাশ কাটিয়ে তিনি নামতে যাচ্ছেন, কর্নেল বললেন, 'এক্সকিউজ মি! আমরা মিস দত্তের কাছে এসেছিলাম। আপনি নিশ্চয় ওঁকে চেনেন?'

ভদ্রলোক পাশের একটা ফ্ল্যাট দেখিয়ে হিন্দিতে বললেন, 'গোমস্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন। মিস দত্তের খবর উনিই বলতে পারবেন।'

ভদ্রলোক নেমে গেলেন। কর্নেল পাশের ফ্ল্যাটের ডোরবেলের সুইচ টিপলেন। নেমপ্লেটে লেখা আছেঃ 'মিঃ পি গোমস্। প্রেসিডেন্ট। ইস্টার্ন সুবারব্যান খ্রিশ্চয়ান কালচারাল সোসাইটি।'

একটু পরে দরজা ফাঁক হলো। একটা লম্বাটে এবং জরাগ্রস্ত মুখ দেখা গেল। মাথার চুল পাকা এবং টাক আছে। দরজার ওপাশে মোটা চেন আটকানো। বললেন, 'ইয়েস?'

'মিঃ গোমস্!' কর্নেল অমায়িক স্বরে বললেন। 'আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট মিস দত্ত।'

'হু আর ইউ স্যার?'

কর্নেল তাঁর নেমকার্ড দিলেন। তারপর ইংরেজিতে বললেন, 'ব্যাপারটা খুব জরুরি মিঃ গোমস্। আপনি স্থানীয় খ্রিশ্চয়ান সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। তাই আপনার সঙ্গেই কথা বলা দরকার।'

'আপনি রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসার?'

'হ্যাঁ। তবে আমি সরকারি কাজে আসিনি। আপনার বেশি সময় নেব না।'

একটু ইতস্তত করার পর গোমস্ দরজা খুলে আমাদের ভেতরে ঢোকালেন। দরজা আটকে দিয়ে বললেন, 'আপনারা বসুন। বলুন কী করতে পারি আপনাদের জন্য?'

কর্নেল বললেন, 'মিস দত্তকে আপনি চেনেন। তার আত্মীয় ববকেও নিশ্চয় চেনেন। তো—'

গোমস্ একটু চমকে উঠলেন যেন। 'বব? বব একটা বাজে ছেলে। আমি সুসানকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সুসান আমার পরামর্শ নেয়নি।'

'সুসান কে?'

'কে? আপনি যার সম্পর্কে কথা বলতে চাইলেন! সুসান ডাট্টা?'

'কিন্তু আমি জানি ওর নাম সুদেষ্ণা দত্ত।'

'হতে পারে। সে বাঙালি মেয়ে তা জানি। তবে সে আমার কাছে সুসান বলে পরিচয় দিয়েছিল, আমাকে আংকেল বলে ডাকে। যাই হোক, নামে কিছু আসে যায় না। সুসান কোনো প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে। আজ ভোরে সে বেরিয়েছে। বলে গেছে, বব গত রাতে বাড়ি ফেরেনি। আমি যেন ওর ফ্ল্যাটের দিকে লক্ষ্য রাখি। ফিরলেই যেন তাকে বলি এই নাম্বারে রিং করতে। আপনি দেখতে চান কি নাম্বারটা?' বলে গোমস্ টেবিলে পেপারওয়েট চাপা-দেওয়া একটা কাগজ তুললেন।

কর্নেল নাম্বারটা দেখে বললেন, 'মিস দত্তর অফিসের ফোন নাম্বার।'

'তাহলে আপনি সুসানের পরিচিত।'

'বব আপনার কতটা পরিচিত?'

'আমি ওকে পছন্দ করি না। সুসান ওকে জুটিয়েছিল। আমি জানি বব সুসানের বয়ফ্রেন্ড।'

'ববের চেহারা দেখে বোঝা যায় সে ইউরেশিয়ান—' কর্নেল হাসলেন। 'অ্যাংলোইন্ডিয়ান কথাটা অনেকে পছন্দ করেন না। তবে ববকে দেখলে হিপি মনে হয়। তাই না?'

'ঠিক বলছেন। এবার বলুন, সুসান সম্পর্কে কী কথা বলতে এসেছেন আমাকে?'

'এই বাড়িতে সুসান কবে এসেছে?'

'গত বছর।'

'বব?'

'মাসতিনেক আগে।'

'এই ফ্ল্যাটগুলো কি ওনারশিপ ফ্ল্যাট, নাকি রেণ্টেড?'

'ওনারশিপ। সুসানের ফ্ল্যাটটা আগে এক বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক কিনেছিলেন। তাঁর কাছে সুসান কিনেছে।' গোমস্ বিকৃত মুখে বললেন, 'এলাকাটা ভাল নয়। এখানে ভদ্রলোকদের বাস করা কঠিন। কিন্তু কী করব? আমি খিদিরপুর ডকে কাজ করতাম। অবসর নেওয়ার পর—'

কর্নেল গোমসের কথার ওপর বললেন, 'বুঝেছি। আচ্ছা মিঃ গোমস্! ববের কি একটা মোটরসাইকেল ছিল জানেন?'

গোমস্ হাসলেন 'মোটরসাইকেল? চালচুলোহীন একটা বাউণ্ডুলে! হ্যাঁ, আমি অবশ্য ইদানীং মোটরসাইকেলে তাকে চাপতে দেখেছি। সুসান তাকে কিনে দেয়নি, আমি নিশ্চিত জানি। নিচের তলায় একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি আছে। আপনি তাদের কাছে খোঁজ নিতে পারেন। ববকে ওরা চেনে।'

'ধন্যবাদ।' বলে কর্নেল উঠে পড়লেন। গোমস্ হতবাক হয়ে বসে রইলেন। এমন নাটকীয় প্রবেশ ও প্রস্থান বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিশ্চয় অবাক করেছিল।...

॥ পাঁচ ॥

নিচের রাস্তায় এসে কর্নেল বললেন, 'তুমি গাড়িতে অপেক্ষা করো। আমি এখনই আসছি।'

'সেই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে যাচ্ছেন তো?'

'হ্যাঁ।' বলে কর্নেল রাস্তার ভিড়ের মধ্যে উধাও হলেন। কোথাও হয়তো যানজট বেধেছে। তাই এখন রাস্তায় ঠেলা, রিকশা, টেম্পো, ট্রাক আর মানুষজনের অচল ঠাসাঠাসি অবস্থা। আমার গাড়িকে পেছন থেকে শাসাচ্ছে কারা। ফুটপাত নেই। অগত্যা একটা পাঁচিলের পাশে গাড়ি সরিয়ে নিয়ে গেলাম। এবার বুঝলাম কেন কর্নেল আমাকে গাড়িতে বসে থাকতে বলে গেলেন।

কর্নেল ফিরলেন মিনিট দশেক পরে। ততক্ষণে ভিড় একটু সচল হয়েছে। বললেন, 'আবার আমাদের মিসেস ব্যানার্জির বাড়ি যেতে হবে। জ্যামের জন্য একটু দেরি হবে। কিন্তু উপায় কী?'

সাবধানে ড্রাইভ করছিলাম। সদ্য কিছুদিন আগে গাড়ির বডি পালিশ করিয়েছি। ঠেলাবোঝাই লম্বা লম্বা লোহার রড যে-ভাবে পাশ কাটানোর চেষ্টা করছে, একটু ছড়ে গেলেই আবার একগাদা টাকা খরচ। বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম ক্রমশ। কর্নেল যেন তা টের পেয়ে বললেন, 'কলকাতার এই অংশটার সঙ্গে বড়বাজারের অলিগলির তুলনা করে তুমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় একটা রিপোর্টাজ লিখতে পারো। এখানে কিন্তু সত্যি আর একটা বড়বাজার গজিয়ে উঠছে। তোমার কেমন একটা অভিজ্ঞতা হলো বোঝো জয়ন্ত!'

হেসে ফেললাম। 'সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা!'

'হ্যাঁ। সাংঘাতিকই বটে।' কর্নেল চুরুট ধরালেন। 'ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক ভদ্রলোক বলছিলেন, তিন বছর আগেও এরিয়ায় এত মানুষজন ছিল না। বস্তিও ছিল না অত। মোটামুটি ফাঁকা জায়গা ছিল। তাই এখানে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিস খুলেছিলেন। এখন অন্য কোথাও সরে যাবার চেষ্টা করছেন।'

'ববের মোটরসাইকেলের হদিস পেলেন কিনা বলুন?'

'পেয়েছি। মালিকের এক ছেলের নাম সেলিম আখতার। বব তার নাকি জিগরি দোস্ত। মাঝে মাঝে সেলিম তার মোটরসাইকেল ববকে ব্যবহার করতে দেয়। গতকাল বিকেলেও দিয়েছিল। তারপর ববের পাত্তা নেই। গতরাতে ববের স্ত্রী—হ্যাঁ, সবাই জানে সুসান ডাট্টা ববের স্ত্রী—তো সেলিম খোঁজ নিতে গেলে বলেছে, কোনও-কোনও রাতে বব রিপন স্ট্রিটে ওর আত্মীয়ের বাড়িতে থাকে। সকালে সেলিম গোমস্ সায়েবের কাছে গিয়ে শোনে, ববের স্ত্রী ভোরে বেরিয়েছে। এটা স্বাভাবিক। বেলা দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সেলিম গেছে রিপন স্ট্রিটে। আমি তার বাবাকে আমার নেমকার্ড দিয়ে এলাম। ববের খোঁজ পেল কিনা আমাকে যেন রিং করে জানায়।'

'আপনি কি ভদ্রলোকের কাছে ববের খোঁজ করছিলেন?'

'তা আর বলতে? বললাম, বব আমার কাছে টাকা ধার করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেলিমের বাবা জাভেদ সাহেব বললেন, ববকে টাকা ধার দেওয়া উচিত হয়নি। তাঁর ধারণা, বব সাট্টা জুয়া খেলেটেলে। সেলিম ওর পাল্লায় পড়েছে। কিন্তু আজকাল ছেলেরা বাবাকে গ্রাহ্য করে না।'

'আপনি আসল কথাটা বললেই পারতেন।'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'ববের রিপন স্ট্রিটের ঠিকানাটা আমার দরকার।'

মিসেস ব্যানার্জির বাড়ির গেটের কাছে হর্ন বাজালাম। বদ্রীনাথ দৌড়ে এসে সেলাম দিল। কর্নেলকে বলল, 'মেমসাব অফিসে আছেন স্যার। আপনি চলে গেলেন। তার একটু পরে মেমসাব চলে গেলেন।'

কর্নেল বললেন, 'বদ্রী! তোমরা কি বাগানে বা পাঁচিলে রক্তের ছাপগুলো ধুয়ে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ স্যার! মেমসাব বলেছিলেন ধুয়ে সাফ করতে। আমি আর সুরেন সব সাফ করেছি।'

'তোমরা ওখানে কোনও চাবি কুড়িয়ে পাওনি?'

বদ্রী অবাক হয়ে বলল, 'না স্যার।'

'একটা চাবি ওখানে কোথাও পড়ে থাকা উচিত।' বলে কর্নেল গাড়ি থেকে নামলেন। 'জয়ন্ত! আমি এখনই আসছি।'

কর্নেল বদ্রীর সঙ্গে প্রাঙ্গণের ছোট্ট বাগানে ঢুকে গেলেন। অ্যালসেশিয়ান কুকুরটার গজরানি শোনা গেল। সুরেনেরও সাড়া পেলাম। তারপর দোতলার ব্যালকনিতে মালতীকে দেখা গেল। সে বলল, 'কী হয়েছে বদ্রী?'

সুরেনের গলা শোনা গেল। 'কর্নেলসায়েব গত রাতে এখানে চাবি ফেলে গেছেন।'

মালতী অদৃশ্য হলো। আমি ভেবে পেলাম না কর্নেল ওখানে চাবি ফেলে গেছেন কী করে? ওই ধরনের ভুল তাঁর কখনও হয় না। তা ছাড়া চাবি টাবি ওঁর পকেটে থাকার কথা। ওখানে গতরাতে চাবি বের করেছিলেন কেন? চাবিটাই বা কিসের?

প্রায় আধঘণ্টা পরে কর্নেল ফিরে এলেন। তাঁর পেছনে সুরেন ও বদ্রী ছিল। দুজনের মুখেই স্বস্তির নিঃশব্দ হাসি। কর্নেল গাড়িতে ঢুকে বললেন, 'হাত থেকে ছিটকে ঘাসের ভেতরে পড়েছিল চাবিটা! চলো, বাড়ি ফেরা যাক। খিদে পেয়েছে।'

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললাম, 'আপনি ওখানে কাল রাতে চাবি বের করেছিলেন কেন?'

'আমি না। হতভাগ্য বব।'

'বব? ববের চাবি?'

কর্নেল একটু পরে বললেন, 'গোমস্ সায়েবের কথা শুনে তোমার বোঝা উচিত ছিল, ববের কাছে সুশান ওরফে সুদেষ্ণার ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি থাকত। অন্তিম মুহূর্তে বেচারা ঘড়ি এবং চাবি দুটোই মিসেস ব্যানার্জির হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। মিসেস ব্যানার্জি ঘড়িটা নেন। কিন্তু চাবিটা ববের হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল।'..

কর্নেলের অ্যাপার্টমেণ্টের দরজা খুলে দিয়ে ষষ্ঠীচরণ বলল, হালদারমশাই ফোং করেছিলেন। তারপর—কী যেন নাম, মেয়েছেলে বাবামশাই!'

কর্নেল যথারীতি চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'মিসেস ব্যানার্জি?'

'আজ্ঞে। পেটে আসছিল, মুখে আসছিল না।'

'তোর দাদাবাবুকে নেমন্তন্ন কর্।'

ষষ্ঠী হাসল। 'করাই আছে। সব রেডি।'

বললাম, 'কর্নেল! নেমন্তন্ন না হয় খাওয়া গেল। কিন্তু আজ অফিসে যেতেই হবে।'

কর্নেল ষড়যন্ত্রসংকুল কণ্ঠস্বরে বললেন, 'ফোন করে জানিয়ে দাও, একটা দুর্দান্ত স্টোরির জন্য নিজেকে লড়িয়ে দিয়েছ। আর ডার্লিং! আমরা এবার একটা প্রচণ্ড নাটকীয় অবস্থার মুখোমুখি এসে গেছি। এখন প্রতিটি মুহূর্তে চমক, শুধু চমক!'

উনি টুপি খুলে রেখে টাকে হাত বুলিয়ে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। ডায়াল করার পর বললেন, 'শ্রীলেখা এণ্টারপ্রাইজ? আমি মিসেস শ্রীলেখা ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলতে চাই।...বলুন, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার কথা বলবেন।·মিসেস ব্যানার্জি!' আপনি ফোন করেছিলেন... হ্যাঁ। আমি ঠিক এটাই আশঙ্কা করেছিলাম।··ঠিক আছে আপনি ঘড়িটা ওদের কথামতো জায়গায় ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দিন।...না। ঘড়িটা একটা প্রাণের চেয়ে মূল্যবান নয়।...আমি বলছি, আপনি আপনার পি এ-কে বাঁচান। কেন বলছি, তা যথাসময়ে জানাব।··ঠিক আছে। অনীশ রায়ের চিঠিটা আমার পরে দেখলেও চলবে।...অফিস থেকে কখন বেরুবেন?... ও কে! আমি তাহলে কালকের মতো সন্ধ্যা ৭টায় আপনার বাড়িতে যাব। উইশ ইউ গুড লাক। ছাড়ছি।'

কর্নেল ফোন রেখে আমার দিকে তাকালেন। বললাম, 'সুদেষ্ণা কিডন্যাপ্ড্?'

'হ্যাঁ।' কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, 'একটু আগেই বলছিলাম এবার শুধু চমকের পর চমক।'

'আমি বলেছিলাম নিশ্চয় সুদেষ্ণার কোনও বিপদ হয়েছে। আপনি পাত্তা দেননি।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'কিডন্যাপারদের এটাই চিরাচরিত পদ্ধতি। রোমার ঘড়িটা ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আউট্রাম ঘাটের সামনে পৌঁছে দিতে হবে। সেখানে মোটরসাইকেলের পাশে কালো জ্যাকেট পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকবে। তার মাথায় মাংকি ক্যাপ। পুলিশ বা গোয়েন্দা তাকে পাকড়াও করলে মিসেস ব্যানার্জির পি-এ'র শ্বাসনালী কাটা যাবে।'

'কিন্তু ঘড়ি পেয়ে তো ওদের আর লাভ হবে না। আপনি জয়দীপের কম্পিউটারে দুটো ডেটাই মুছে নষ্ট করে দিয়েছেন!'

'দিয়েছি।'

'তা না দিলেও মিসেস ব্যানার্জির বাড়ি থেকে ওই কম্পিউটার চুরি অসম্ভব কাজ।'

'ঠিক বলেছ। তবে কিডন্যাপারদের বিশ্বাস আছে, সেই অসম্ভবকে তারা সম্ভব করতে পারবে। কিন্তু মূল দুটো প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। জয়দীপের গোপন তথ্যের প্রারম্ভিক কী ওয়ার্ডস ছিল ব্রেড। বব কী করে তা টের পেয়েছিল? দ্বিতীয় মূল প্রশ্নঃ বব কী করে জানল জয়দীপের হাতে বাঁধা নীল ডায়াল রোমার ঘড়িরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে?'

একটু ভেবে বললাম, 'সুদেষ্ণা ববকে জানিয়ে থাকবে।'

'তা হলে প্রশ্ন আসছে, মিসেস ব্যানার্জি যা জানেন না, তা সুদেষ্ণা কী করে জেনেছিল?'

'ওঃ কর্নেল! হালদারমশাইয়ের মতো আমার মাথাও গণ্ডগোলে তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।'

কর্নেল হাসলেন। 'কাল থেকে তুমি স্নান করোনি। আজ স্নান করে নাও। মাথা ঠাণ্ডা হবে।'

স্নান করে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেল এবং মাথাও এবার ঠাণ্ডা। খাওয়ার টেবিলে কর্নেল কথা বলার পক্ষপাতী নন। ওঁর মতে, খাওয়ার সময় কথা বললে খাদ্যের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না। হজমে বিঘ্ন ঘটতে পারে এবং খাদ্য শ্বাসনালীতে আটকে যাওয়ার আশঙ্কাও নাকি আছে।

প্রথাভঙ্গ মাঝেমাঝে অবশ্য উনি নিজেই করেন। আজ করলেন। বললেন, 'তুমি যখন বাথরুমে ছিলে, সেই সেলিম আখতার ফোন করেছিল। জানতে চাইছিল কী ব্যাপার। তো আমি বললাম, রিপন স্ট্রীটে ববের আত্মীয়ের ঠিকানা দিলে আমি তাকে তার মোরসাইকেলের খবর দেব। গিভ অ্যাণ্ড টেক। সেলিম ঠিকানা দিল। আমি বললাম, তুমি কড়েয়া থানায় চলে যাও। সেখানে তোমার মোটরসাইকেল আছে।'

বললাম, 'ববের আত্মীয়ের ঠিকানা নিয়ে কী করবেন? বব ইজ ডেড।'

'ববের জীবনের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি পেয়ে যাই? ববকে আমার জানা খুবই দরকার। তাহলে তার অদ্ভুত আচরণের অর্থ বোঝা যাবে।'

আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। খাওয়ার পর ড্রয়িংরুমে গিয়ে ভাতঘুমের জন্য তৈরি হচ্ছি, কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত! আড়াইটে বাজে। আমরা বেরুব। মৃত বব আমাকে উত্ত্যক্ত করছে।'

'রিপন স্ট্রিটে যাবেন?'

'হ্যাঁ। তবে পায়ে হেঁটে যাব। রিপন স্ট্রিট এখান থেকে শর্টকাটে পাঁচ মিনিটের পথ। ওঠ।'

বাড়িটা রিপন স্ট্রিটের ওপর নয়। একটা সংকীর্ণ গলির মুখে দোতলা পুরনো বাড়ি। নিচের তলায় যারা থাকে, তাদের কেমন যেন সন্দেহজনক হাবভাব। তাদের চাউনি অস্বস্তিকর। গাউনপরা স্থূলাঙ্গী এক মহিলা

বুকের কাছে একটা সাদা কুকুর নিয়ে অপরিসর বারান্দায় বসেছিলেন। কর্নেলকে দেখে ইংরেজিতে বললেন, 'আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?'

কর্নেল বললেন, 'বব নামে এক যুবক আমাকে এই ঠিকানা দিয়েছিল।'

ভদ্রমহিলা বাঁকা হেসে বললেন, 'ববের খোঁজে প্রায়ই এখানে হোমরা-চোমরা লোকেরা আসে। শুনলাম কাল সে একজনের মোটরসাইকেল চুরি করে পালিয়েছে। আপনার কী নিয়েছে?

'টাকা।'

'পুলিশের কাছে যান! ববকে এখানে খুঁজে পাবেন না।'

'ববের ঘরে কি তালা দেওয়া আছে?'

দিশি মেমসায়েব পুরুষালি ভঙ্গিতে সশব্দে বিকট হাসলেন। 'ববের ঘর! চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে!'

'তাহলে এখানে সে কার কাছে থাকত?'

'ওই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যান। ববের খুড়ি লিজাকে জিজ্ঞেস করুন। বব কী তা জানতে পারবেন। তবে সে আপনার সঙ্গে দেখা করবে কি না বলতে পারছি না।'

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গেলাম। ফ্রকপরা এক বালিকা হাঁ করে কর্নেলকে দেখছিল। চাউনি দেখে মনে হলো, খ্রিসমাস ইভে সে স্বয়ং ফাদার খ্রিসমাসকে দেখছে যেন। কর্নেল মিষ্টি হেসে তার হাতে কয়েকটা চকোলেট গুঁজে দিলেন। আড়ষ্টভঙ্গিতে সে নিল। কর্নেল বললেন, 'আণ্টি লিজার ঘর কোনটা?'

সে আঙুল তুলে ঘরটা দেখিয়ে দিল। ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলছে। টানা বারান্দায় একদল ছেলেমেয়ে রঙিন কাগজ সুতোয় বেঁধে টাঙাতে ব্যস্ত। খ্রিসমাসের প্রস্তুতি। তারা আমাদের গ্রাহ্য করল না। কর্নেল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আণ্টি লিজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

দরজার পর্দা সরিয়ে রোগা প্রৌঢ়া রুক্ষ চেহারার এক মেমসাহেব উঁকি দিলেন। কর্নেল এবং আমাকে দেখে নিরে শীতল কণ্ঠস্বরে বললেন, 'আপনারা যদি ববের খোঁজে এসে থাকেন, আমি দুঃখিত, সে এখানে আর থাকে না। গোবরা এলাকায় থাকে শুনেছি। তার সম্পর্কে আর কিছু জানি না।'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'আমিও দুঃখিত মিসেস লিজা—'

'আমি লিজা হেওয়ার্থ!'

'মিসেস লিজা হেওয়ার্থ! ববের একটা শোচনীয় দুঃসংবাদ দিতে আমি এসেছি।'

'ববকে পুলিশ ধরেছে? ওটা কিছু নয়।'

'না। সে খুন হয়েছে।'

লিজা মুহূর্তে বদলে গেলেন। মুখের রুক্ষ শীতলতা গলে গেল। দরজার পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, 'ও জেসাস! তাহলে সত্যি ওরা ববকে মেরে ফেলল?'

'মিসেস হেওয়ার্থ! আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

কান্না সামলে লিজা বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরে আলো জ্বলছে। একপাশে খাট। অন্যপাশে জীর্ণ সোফাসেটে নতুন কভার চাপানো আছে। পাশাপাশি ছোট্ট কিচেন এবং বাথরুমের দরজা দেখতে পেলাম। কোণে একটা টুলের ওপর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ভাস্কর্য। দুটো পুরোনো আলমারি। খাটের পাশে কিচেনের দরজার কাছাকাছি ছোট্ট ডাইনিং টেবিল এবং একটা চেয়ার। বেশ পরিচ্ছন্ন করে সাজানো ঘর। দেয়াল জুড়ে বাঁধানো অনেকগুলো ফটো ঝুলছে। হঠাৎ চোখে পড়ল ফ্রেমে বাঁধানো এক টুকরো সাদা কাপড়ে লাল এমব্রয়ডারিকরা একটা বাক্য: 'ম্যান ক্যান নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন।' মনে পড়ল, কর্নেল বলেছেন ওটা যিশু খ্রিস্টের বিখ্যাত বাণী। কিন্তু এই বাণীর অন্য একটা পরিপ্রেক্ষিত আছে। আমি বিস্মিত দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম।

লিজা চোখ মুছে বললেন, 'ববকে কোথায় ওরা খুন করেছে? গোবরায় সেই বাঙালি মেয়েটির বাড়িতে?'

কর্নেল বললেন, 'না। গত রাতে সার্কাস অ্যাভেনিউ এলাকায় তাকে ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে। আপনার বেশি সময় নেব না। আপনার এখানে টেলিফোন আছে?'

'ছিল। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আর রাখতে পারিনি।'

'আপনি যে ভাবে হোক, কড়েয়া থানার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ববের বডি এখনও মর্গে আছে। আপনি গিয়ে শনাক্ত করার পর বডি শেষকৃত্যের জন্য চাইবেন। তো আমার কয়েকটা কথার জবাব দিন। কারা ববকে খুন করেছে বলে আপনি মনে করেন?'

'প্রায় এক সপ্তাহ আগে একটা লোক এসে ববকে খুঁজছিল। আমাকে হুমকি দিয়ে গেল, ববকে যেন বলি, সে তার সঙ্গে দেখা না করলে প্রাণে মারা পড়বে। লোকটা বাঙালি। ববের বয়সী। তাকে এই বাড়িতে আগেও ববের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। তাকে দেখলে চিনতে পারব।'

'তারপর বব কি আপনার কাছে এসেছিল?'

'দু'বার এসেছিল। আমি ওকে লোকটার কথা বলেছিলাম। বব গ্রাহ্যই করল না।'

'সেই লোকটা আর এসেছিল আপনার কাছে ?'

'না। আমি তাকে আর দেখিনি।'

'ববের আসল নাম কী ?'

'বব। ওর বাবা আমার স্বামীর মাসতুতো ভাই। স্যাম হেওয়ার্থ। স্যাম রেলে চাকরি করত। ববের ছ'বছর বয়সে ওর মা রোজি একটা লোকেব সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া চলে যায়। স্যাম ববকে আমার কাছে রেখেছিল। তখন আমার স্বামী ডানলপ কোম্পানিতে চাকরি করত। ববকে আমিই মানুষ করেছি। আমাদের সন্তান ছিল না। তারপর স্যাম আত্মহত্যা করেছিল। হতভাগা বব !'

লিজা আবার কেঁদে উঠলেন। কর্নেল তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বব কি কোথাও চাকরি করত ?'

'খেয়ালি ছন্নছাড়া স্বভাবের ছেলে। কোথাও বেশিদিন কাজ করার মেজাজ ছিল না ওর। আসলে বড্ড জেদি প্রকৃতির ছিল। মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত কোথায়। তারপর হঠাৎ চলে আসত।'

কর্নেল ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। 'আপনি এখনই কড়েয়া থানায় যান। আমার এই নেমকার্ডটা থানায় দেখিয়ে বলবেন, আমিই আপনাকে পাঠিয়েছি। সম্ভব হলে সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, চলি !...'

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো কথাগুলো দেখেছেন ?'

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'দেখেছি। তবে ওসব নিয়ে এখন ভাবছি না। ফিরে গিয়ে সুশান ওরফে সুদেষ্ণার ফ্ল্যাটের দিকে ছুটতে হবে।'

'সেই দম আটকানো রাস্তায় ? সব নাশ !'

'কারও সর্বনাশ কারও পৌষমাস। পুরনো বাংলা প্রবচন। তাছাড়া এখন সত্যিই পৌষমাস চলেছে। ক্যালেণ্ডার দেখতে পারো।'

কর্নেলের রসিকতা কানে নিলাম না। গোবরা এলাকার সেই ফ্ল্যাটের কথা ভাবছিলাম। কর্নেল যেন বড় বেশি ঝুঁকি নিচ্ছেন।

বাড়ির গেটে পেঁছে কর্নেল বললেন, 'এক পেয়ালা কফির ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময় কম। ওপরে উঠছি না। তুমি গাড়িটা এখানে নিয়ে এস।'

হঠাৎ সেই সময় পোর্টিকোর দিক থেকে হন্তদন্ত ছুটে এলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই। বললেন, 'নিচে ওয়েট করছিলাম। ষষ্ঠী কইল, বাবামশাই জয়ন্তবাবুরে লইয়া গেছেন। এদিকে আমার হাতে টাইম কম।'

কর্নেল বললেন, 'চলুন। গাড়িতে যেতে যেতে সব শুনব। আপনি ফোন করেছিলেন। ষষ্ঠী বলেছে আমাকে।'

'আগে জিগাই, যাবেন কই ? ম্যাডামের বাড়ি তো ?'

'নাহ্। গোবরা এরিয়ায় যাব।'

হালদারমশাই লম্বা মানুষ। যেন আরও লম্বা হয়ে গেলেন। গোঁফ কাঁপতে থাকল। বললেন, 'গোবরা এরিয়ায়? কী কাণ্ড। জাস্ট নাও আই অ্যাম কামিং ফ্রম দ্যাট প্লেস। মোটরভেহিকল্‌স্ অফিসে আমার ভাগনা আজ আসে নাই। তাই এত দেরি। নাম্বার দিয়া নাম ঠিকানা পাইলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা। পাবলিক বুথে গিয়া আপনারে ফোন করলাম। পাইলাম না। তখন কড়েয়া থানায় গেলাম। নিজের কার্ড দেখাইলাম। এক পুলিশ অফিসার ধমক দিয়া কইলেন, আপনারে গত রাত্রে মিসেস ব্যানার্জির বাড়ি দেখছিলাম না?'

হালদারমশাই খি খি করে হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন, 'তা হলে আপনি পুলিশের সঙ্গে সেলিম আখতারের কাছে গিয়েছিলেন?'

'অ্যাঁ? আপনি অরে চিনলেন ক্যামনে?'

'পুলিশ কি সেলিমকে অ্যারেস্ট করেছে?'

'থানায় লইয়া গেছে। তবে সেলিম ভিকটিমের বডি শনাক্ত করছে। ভিকটিমের নাম—'

কর্নেল বললেন, 'বব। কিন্তু পুলিশ কি ববের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল?'

হালদারমশাই আরও অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'গিছল। কিন্তু নেমপ্লেটে লেখা ছিল—'

'মিস এস দত্ত। পুলিশ কি তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে সার্চ করেছে?'

'নাহ্ কর্নেলস্যার। পাশের ফ্ল্যাটের এক বুড়া—কী য্যান তার নাম—'

'গোমস্।'

'হঃ। গোমস্ বুড়া কইল, বব মিস এস দত্তের রিলেটিভ। মাঝেমাঝে আসে। বব থাকে রিপন স্ট্রিটে। বুড়া সেলিমরে ধমক দিল, ইউ নো হিজ অ্যাড্রেস। হোয়াই ইউ আর নট গিভিং ইট টু দা পোলিস? তখন সেলিম অ্যাড্রেস দিল। পুলিশ অরে প্রথমে লইয়া গেল চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের মর্গে। বডি শনাক্ত করল সেলিম। তারপর পুলিশ অরে থানায় লইয়া গেল। আমি আপনারে ইনফরমেশন দিতে দৌড়াইলাম।'

কর্নেল ঘড়ি দেখে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'তিনটে পনের বাজে। হালদারমশাই? আপনি আপনার ক্লায়েন্টের অফিসে চলে যান। উনি অফিসে আছেন। আপনাকে ওঁর দরকার হতে পারে।'

হালদারমশাই একটু ইতস্তত করে চলে গেলেন। বুঝলাম কর্নেলের সঙ্গে ওঁর আবার গোবরা এরিয়ায় যাবার ইচ্ছা ছিল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললাম, 'মনে হচ্ছে সেলিম আপনাকে ফোন করার পরই হালদারমশাই পুলিশ নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলেন।'

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'হুঁ।'

'হাই ওল্ড বস্! সেই সাদা মারুতিটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম!'

'গোবরা যাবার সময় গাড়িটা আমাদের ফলো করেনি। এখনও করছে না।' কর্নেল একটু হেসে ফের বললেন, 'অবশ্য আজকাল সর্বত্র রঙবেরঙের মারুতি তুমি দেখতে পাবে। তুমি বরং একটা মারুতি কিনে ফেলো। তোমার ফিয়াট সেকেলে হয়ে গেছে। বাই দা বাই, শর্টকাট করো। সময় কম।'

গলিরাস্তা ধরে এগিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজের কাছে পৌঁছে গেলাম। তারপর রেলব্রিজ পেরিয়ে কর্নেল বললেন, 'এখানেই পার্ক করে রাখো। আমার জন্য অপেক্ষা করো।'

'আপনি একা যাবেন?'

'হ্যাঁ।' কর্নেল নেমে গেলেন। বললেন, 'সামনে জ্যাম দেখতে পাচ্ছি। এখানে রাস্তার পাশে অনেকটা জায়গা। পার্কিংয়ে অসুবিধে নেই। বড় জোর আধঘণ্টা তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

কর্নেল বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সময় কাটানোর জন্য আমি বেরিয়ে কাছেই একটা চায়ের দোকানে গেলাম। রাস্তার ধারে এ সব চায়ের দোকান বড্ড অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু এ বেলা শীতটা বেশ পড়েছে। মাটির ভাঁড়ে ক্রমাগত গরম করে রাখা গাঢ় তরল পদার্থে চায়ের কোনও স্বাদ নেই। তবু মন্দ লাগছিল না।

কর্নেল ফিরে এলেন প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে। কাঁধে একটা কিটব্যাগ ছিল। বললেন, 'কুইক! যে পথে এসেছ, সেই পথে।'

স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাগটা কার?'

'ববের। একপ্রস্থ পোশাক ঠাসা আছে। এর কারণ সেগুলো সুশান ওরফে সুদেষ্ণার নয়। ভাগ্যিস দেয়ালের র‍্যাকেটে ঝুলছিল। বেশি কিছু খুঁজতে হয়নি। গোমসের ঘরে জোরে টি ভি'র শব্দ হচ্ছিল। আজ নিশ্চয় বড় খেলা আছে কোথাও।'

'নিউজিল্যান্ড ভার্সেস ইন্ডিয়া। ক্রিকেট।'

'হুঁ। সব ফ্ল্যাটে তাই টি ভি'র দিকে সবার চোখ। এমনকি নিচের তলায় একটা দোকানের সামনে ভিড় দেখলাম।'...

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল ষষ্ঠীকে কফির হুকুম দিলেন। তারপর ড্রয়িংরুমে ইজিচেয়ারে বসে মাথার টুপি খুললেন। টাকে হাত বুলিয়ে কিট-ব্যাগের চেন খুললেন।

ঠাসাঠাসি করে ভরা একটা জিনসের প্যান্ট, দুটো শার্ট, তারপর একটা জ্যাকেট বেরুল। কর্নেল-জ্যাকেটটা তুলতেই ওঁর পায়ের কাছে ঠকাস করে একটা ছুরি পড়ল। ইঞ্চি ছয়েক ফলা। কর্নেল ছুরিটা টেবিলে রেখে জ্যাকেটের

বাইরের পকেটে হাত ভরলেন। কিছু বেরুল না। কিন্তু ভেতর পকেট খুঁজতেই বেরিয়ে এল একটা নেমকার্ড।

কর্নেল কার্ডটা দেখে টেবিলে রাখলেন। বললাম, 'দেখতে পারি?'

'নিশ্চয় পারো।'

তুলে নিয়ে দেখি, বেশ দামী কার্ড। 'সি এস সিনহা।' তার তলায় ঠিকানা আছে। ভবানীপুর এলাকা বলে মনে হলো। দুটো ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। একটা বাড়ির, অন্যটা অফিসের।

কর্নেল কিটব্যাগের ছোট চেনগুলো টেনে টুকরো কাগজপত্র বের করছিলেন। বললেন, 'অফিসের ফোন নাম্বারটা শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজের। সর্ষের মধ্যে ভূত।'

ষষ্ঠী কফি আনল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল আবার আওড়ালেন, 'সর্ষের মধ্যে জব্বর ভূত, জয়ন্ত! এই ভূত এখনও বহাল তবিয়তে কাজ করে যাচ্ছে।' ..

॥ ছয় ॥

কর্নেলের কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। বললাম, 'সর্ষের মধ্যে এই ভূতের নাম সি এস সিনহা। মিসেস ব্যানার্জিকে এখনই জিজ্ঞেস করে জেনে নিন লোকটা কে?'

কর্নেল ববের টুকরো কাগজগুলো দেখতে দেখতে বললেন, 'ধীরে জয়ন্ত, ধীরে!'

ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, 'বঙ্কিমচন্দ্র কোট করছেন শুধু!'

'কোট করছি না ডার্লিং? অনুকরণ করছি! বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, ধীরে রজনী, ধীরে! তবে তোমাকে বলেছিলাম, এবার শুধু চমকের পর চমক। সি এস সিনহা সেইসব চমকের আর একটা চমকমাত্র। হুঁ, ববের লেখা একটা অসমাপ্ত চিঠি দেখছি।' কর্নেল কুঁচকে যাওয়া একটা ইনল্যান্ড লেটারের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর বললেন, 'ববেরই লেখা। তাড়াহুড়ো করে কয়েক লাইন লিখেছিল। কিন্তু ম্যাডাম সম্বোধনে বোঝা যাচ্ছে সে শ্রীলেখা ব্যানার্জিকে চিঠিটা লিখতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনও কারণে মত বদলায়। কেউ কি সেই সময় হঠাৎ এসে পড়ায় আর লেখা হয়নি, তাই যেমন-তেমন ভাবে ভাঁজ করে লুকিয়ে ফেলেছিল?'

কর্নেল চিঠিটা পড়ার পর আমাকে পড়তে দিলেন। 'ম্যাডাম' সম্বোধনের পর যা লিখেছে, তা বাংলায় এরকম দাঁড়ায়ঃ

'আপনার স্বামীর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। আমি অনুতপ্ত। স্বীকার করছি, ওঁর হাতের ঘড়ি ছিনতাই করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ভদ্রলোক অত বেশি ভয় পেয়ে বাচ্চা ছেলের মতো দৌড়বেন, চিন্তাই করিনি। আমার হাতে ছুরি ছিল। ভেবেছিলাম ছুরি দেখামাত্র থমকে দাঁড়াবেন। তখন ঘড়িটা চাইব। কিন্তু সেই সুযোগ তিনি দেননি। পরে জেনেছি, প্রাণভয়ে নয় তিনি ঘড়িটা বাঁচানোর জন্যই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং…'

চিঠিটা কর্নেলকে ফেরত দিয়ে বললাম, 'আপনার মনে থাকা তো উচিত। আমি বলেছিলাম, ঘড়ি ছিনতাইকারীকে সৎ এবং বিবেকবান বলে মনে হয় যেন। আপনি বলেছিলেন, সো ইট অ্যাপিয়ারস। এবার তার পরিচয় মোটামুটি জেনে গেলেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমার ধারণা ঠিকই ছিল।'

'হ্যাঁ। আচমকা জয়দীপের পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু ববকে বিচলিত করেছিল। আসলে কোনও মানুষই নির্ভেজাল মন্দ বা নির্ভেজাল ভালো নয়। ভাল-মন্দ-বোধ সব মানুষের মধ্যেই আছে। বব ছিল স্পয়েল্ট্ চাইল্ড। পরিবেশ ওকে নষ্ট করেছিল। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, সে পেশাদার খুনী তো নয়ই, পেশাদার অপরাধীই বলা যাবে না তাকে। কখনও-সখনও টাকার জন্য বেপরোয়া হয়ে সে কিছু খারাপ কাজ করে থাকবে।'

'কর্নেল! আমার মনে হচ্ছে, শ্রীলেখা ব্যানার্জির কর্মচারী সি এস সিনহাই ববকে টাকা খাইয়ে জয়দীপের ঘড়ি ছিনতাই করতে বলেছিল।'

'তা আর বলতে?' বলে কর্নেল কফি শেষ করে কিটব্যাগটায় ববের জিনিসপত্র আগের মতো ঠেসে ভরলেন। তারপর ব্যাগটা ভেতরের ঘরে কোথাও রাখতে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, 'মিসেস ব্যানার্জির পি এ'র কিডন্যাপার সময় বেঁধে দিয়েছে সাড়ে পাঁচটা। এর কারণ বোঝা যাচ্ছে শীতের সন্ধ্যা। তা ছাড়া আউট্রাম ঘাটের কোনও কোনও জায়গায় ল্যাম্পপোস্টে আলো থাকলেও গাছপালার ছায়া পড়ে দেখেছি। লোকটা ঝুঁকি নিতে চায় না। যাই হোক, অপেক্ষা করা যাক।'……

সাড়ে পাঁচটার পর কর্নেল শ্রীলেখাকে টেলিফোন করলেন। ক্রমাগত হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাই নাকি ইত্যাদি ছাড়া কিছু বুঝতে পারলাম না। একটু পরে ফোন রেখে কর্নেল হাসিমুখে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, 'কী ব্যাপার? আপনাকে খুশি-খুশি দেখাচ্ছে!'

'হালদারমশাই গিয়ে ঘটনাটা শোনার পর চুপচাপ বেরিয়ে গেছেন। শ্রীলেখা ওঁকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, যেন ওত পাততে না যান। তাঁর পি এ'র কোনও ক্ষতি হলে হালদারমশাই দায়ী হবেন।'

'ঘড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছেন শ্রীলেখা?'

'শেখরবাবু নামে ওঁর একজন আস্থাভাজন কর্মীর হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন।' শেখরবাবুর মোটরবাইক আছে। ফিরতে দেরি হবে না। উনি ফিরলেই শ্রীলেখা বাড়ি ফিরবেন। আমরা ওঁর বাড়িতে যেন সাড়ে ছ'টায় অবশ্য যাই। শ্রীলেখা অনীশ রায়ের লেখা একটা অদ্ভুত চিঠির কথা সকালে বলছিলেন। সেটা দেখাতে চান।'

'কিন্তু আপনার খুশির কারণ কি এই যে, ওরা এরপর জয়দীপের কম্পিউটার চুরি করলেও গোপনীয় ডেটা দুটো পাবে না?'

'ঠিক ধরেছ। তবে আমার খুশি হওয়ার আর একটা কারণ আছে। হালদারমশাইকে শ্রীলেখা নিষেধ করার পর উনি চুপচাপ বেরিয়ে গেছেন। অথচ আমার এখানে এখনও এলেন না। তার মানে কী বুঝতে পারছ?'

'ওত পাততে গেছেন তা হলে!' উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, 'কর্নেল! হালদারমশাইকে আমরা জানি। দেখবেন উনি নির্ঘাত একটা ঝামেলা বাধাবেন। আর মাঝখান থেকে মেয়েটার প্রাণ যাবে।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'যাবে না। বরং হালদারমশাই আগেভাগে গিয়ে ওখানে ওত পাতবেন বলেই ওঁকে তখন ওঁর মক্কেলের অফিসে যেতে বলেছিলাম।'

'কিন্তু উনি ঝামেলা বাধালে নিজেই বিপদে পড়তে পারেন। আর মিসেস ব্যানার্জির পি এ র প্রাণ যাবে না বলছেন কেন বুঝতে পারছি না।'

কর্নেল আস্তেসুস্থে চুরুট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'সুশান ওরফে সুদেষ্ণা দত্তের প্রাণ যাবে না। কারণ সে কিডন্যাপড্ই হয়নি। তাকে কেউ আটকে রাখেনি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'বলেন কী! সুদেষ্ণা কিডন্যাপড্ হয়নি?'

'আমি যখন তার ফ্ল্যাট লক করে নিচে নেমেছি, তখন আমার পাশ কাটিয়ে তাকে হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়িতে উঠতে দেখলাম। জাস্ট্ আধমিনিট আমার দেরি হলে আমি ঝামেলায় পড়তাম। অবশ্য ববের ব্যাগটা যে উধাও হয়েছে, তা সে লক্ষ্য করতেও পারে। না-ও পারে। এখন আর কিছু যায় আসে না।'

কর্নেল! আপনি তো ওকে দেখেননি! কী করে চিনলেন সে-ই মিস দত্ত?'

'ফ্ল্যাটে ঢুকে ওর ছবি দেখেছি। দেয়ালে এবং টেবিলে। ববের সঙ্গেও একটা রঙিন ফটো বাঁধানো আছে দেখেছি।'

হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বললাম, 'তা হলে সুদেষ্ণা এই চক্রান্তে জড়িত।'

'নিশ্চয় জড়িত। আর এ-ও বোঝা যাচ্ছে, জয়দীপের কম্পিউটারাইজড্ গোপন ডেটার কথা কোনওভাবে সে জানতে পেরেছিল। ফার্স্ট কী ওয়ার্ডস

ব্রেড এবং পরের কী যে কয়েকটা নাম্বার, তা-ও সে জানে। সেই নাম্বার বা ডিজিটাল কোড একটা নীলডায়াল রোমার ঘড়িতে আছে, সুশানের তা অজানা ছিল না। হ্যাঁ, বব তার এই গার্লফ্রেন্ডের কাছেই এ সব কথা জেনেছিল।' কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, 'ববের কাছে সি এস সিনহার নেমকার্ড পেয়েছি। তাই আমার কাছে একটা টাইম ফ্যাক্টরের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কী ওয়ার্ড ব্রেড এবং রোমার ঘড়িতে খোদাই করা নাম্বারের কথা বব সম্ভবত জয়দীপের মৃত্যুর পর জেনেছিল। দুর্ঘটনায় জয়দীপের মৃত্যু ববকে বিচলিত করেছিল, আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। বিচলিত বব তার গার্লফ্রেন্ডের কাছে ঘটনাটা বলতেই পারে। হয়তো অনুতপ্ত বব নেশার ঘোরেই বলে ফেলেছিল। তখন সুশান তাকে সব কথা জানাতে পারে। কিন্তু বিবেক যন্ত্রণায় পীড়িত বব তখন সতর্ক হয়ে যায়। ঘড়িটা সুশানকে সে দেয়নি। জয়দীপের স্ত্রীকে ফেরত দিতে চেয়েছিল। শ্রীলেখা ব্যাকগ্রাউন্ড জানতেন না বলেই ভড়কে যান। যাই হোক, পুলিশ সুশানকে জেরা করলে আমার ধারণার সত্যতা যাচাই হবে।'

'ওকে পুলিশের হাতে এখনই ধরিয়ে দেওয়া উচিত!'

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'মিসেস লিজা হেওয়ার্থের কাছে আমরা জেনেছি, একটা লোক ববের খোঁজে গিয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে। তাকে লিজা আগেও দেখেছেন। সম্ভবত সে সি এস সিনহা।'

'তাকেই বা পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?'

কর্নেল মিটিমিটি হেসে আবার বললেন, 'ধীরে জয়ন্ত, ধীরে!' বলে ঘড়ি দেখলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো। এবার শ্রীলেখার বাড়ি যাওয়া যাক।'...

আমরা সবে নেমে নিচের লনে পৌঁছেছি, গেটের কাছে ট্যাক্সি থেকে হালদারমশাই অবতরণ করলেন এবং দ্রুত ভাড়া মিটিয়ে গেট দিয়ে সবেগে প্রবেশ করলেন। তারপর আমাদের দেখামাত্র ছুটে এলেন।

কর্নেল বললেন, 'চলুন হালদারমশাই! যেতে যেতে শোনা যাবে।'

'আপনারা যাবেন কৈ?'

'আপনার ক্লায়েন্টের বাড়িতে। আসুন, আমবা পেছনের সিটে বসি।'

দুজনে গাড়িতে উঠলেন। স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। কর্নেলকে বলতে শুনলাম, 'কী হলো হালদারমশাই? চুপ করে আছেন যে?'

'ভাবতাছি।'

'কী ভাবছেন?'

ব্যাকভিউ মিররে দেখলাম, প্রাইভেট ডিটেকটিভ একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর রুমালে নাক মুছে বললেন, 'হেভি মিস্ট্রি। ম্যাডামেরে জানানো

উচিত। কিন্তু তার আগে আপনার লগে কনসাল্ট করা দরকার। আমার মাথা বেবাক গণ্ডগোল হইয়া গেছে।'

'আপনি কি আউট্রাম ঘাট থেকে আসছেন?'

'নাহ্! ম্যাডাম নিষেধ করছিলেন। রিস্ক্ লই নাই!'

'তাহলে এখন আসছেন কোথা থেকে?'

হালদারমশাই শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, গোবরায় মিস দত্তের ফ্ল্যাটের পাশের ফ্ল্যাটে সেই বুড়া সায়েবের লগে আলাপ করতে গিছলাম।'

'মিঃ গোমসের সঙ্গে?'

'হঃ! বব সম্পর্কে যদি কিছু স্পেশাল ইনফরমেশন পাই, তার কিলারেরে শনাক্তকরণে হেল্পফুল হইলে হইতে পারে। কী কন?'

'ঠিক বলেছেন। তারপর কী হলো বলুন?'

'শীত-সন্ধ্যার রাস্তায় যানবাহনের গর্জন এবং আমার গাড়ির চাপা গর্জনও কম নয়, হালদারমশাইয়ের সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম না। তবু যতখানি শুনতে পেলাম বা বুঝতে পারলাম, তা থেকে গোয়েন্দা ভদ্রলোকের একটা বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী দাঁড় করানো যায়।

হালদারমশাই শ্রীলেখা এণ্টারপ্রাইজ থেকে বেরিয়ে বারকয়েক যানবাহন বদল করে গোবরা এলাকার ফ্ল্যাটে যখন পেঁছান, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সবখানে আলো জ্বলে উঠেছে। উনি মিস্ এস দত্তের ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে অবাক হন। ফ্ল্যাটের তালা খোলা। ভেতরে আলো জ্বলছে। দরজায় কান পেতে কারা কথা বলছে শুনতে পান। সন্দেহজনক ব্যাপার। প্যাণ্টের পকেটে রিভলভারের বাঁট চেপে ধরে ডোরবেলের সুইচ টেপেন হালদারমশাই।

দরজায় লুকিং গ্লাস ফিট করা আছে। তাই একটু সরে দাঁড়ান। দরজা একটু ফাঁক করে পুরুষকণ্ঠে কেউ বলে, 'হু ইজ ইট?'

হালদারমশাই বলেন, 'আই হ্যাভ কাম ফ্রম দা পোলিস স্টেশন। প্লিজ ওপেন দা ডোর।'

দরজা আরও ফাঁক করে একজন লোক তাঁকে দেখে নিয়ে বাংলায় বলে, কী ব্যাপার?'

হালদারমশাই ইংরিজিতে বলেন, 'আমি ববের ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

লোকটার পরনে টাই-স্যুট! চিবুকে কাঁচাপাকা দাড়ি। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশের ওপারে। সে একটু ইতস্তত করে দরজার ভেতরকার চেন খুলে দিয়ে বলে, 'ঠিক আছে। ভেতরে আসুন।

হালদার তার চাউনি দেখেই বিপদ আঁচ করেছিলেন। ঘরে ঢুকে দরজায় পিঠ রেখে তিনি দ্রুত লোকটার গলার কাছে রিভলভারের নল ঠেকান। সঙ্গে

সঙ্গে ঘরের আলো নিভে যায়। তারপরই লোকটা তাঁকে এত জোরে ধাক্কা মারে তিনি মেঝেয় পড়ে যান। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে পালিয়ে যায়। অন্ধকার ঘর। হাঁটুতে চোট লেগেছিল। হালদারমশাই কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়েছেন, ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তি দরজা খুলে পালায়।

বাইরে করিডরের আলোয় তাকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছেন হালদার মশাই। সে মেয়ে। পরনে ফুলস্লিভ সোয়েটার এবং জিন্‌স। কাঁধ অব্দি ছাঁটা চুল।

ঘরের আলো যে সেই মেয়েটিই নিভিয়ে দিয়েছিল, তাতে হালদারমশাইয়ের কোনও সন্দেহ নেই।

দেয়াল হাতড়ে সুইচবোর্ড খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালেন হালদারমশাই। তারপর তাঁর মাথায় আসে, ওরা যদি নিচে গিয়ে ফ্ল্যাটে ডাকাত ঢুকেছে বলে লোক জড়ো করে, তিনি বিপদে পড়বেন। তাই ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসেন।

ঘর সার্চ করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। তবে মেঝেয় পড়ে থাকা দলাপাকানো একটা কাগজ তিনি কুড়িয়ে এনেছেন।

কিন্তু না—ওরা লোক জড়ো করেনি। হালদারমশাই সংকীর্ণ রাস্তার ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে নিরাপদে রেলব্রিজের কাছে পৌঁছান এবং একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে যান।

লক্ষ্য করছিলাম, কর্নেল পকেট থেকে তাঁর খুদে টর্চ বের করে কাগজটা পড়ছেন এবং হালদারমশাই নস্যি নিচ্ছেন।...

মিসেস ব্যানার্জির বাড়ির সামনে হর্ন দিতেই কুকুরের গর্জন এবং বদ্রীর সাড়া এল।

কর্নেলকে দেখতে পাওয়ার পর সে সেলাম দিয়ে গেট খুলে ছিল। গাড়ি ভেতরে ঢোকালাম। বাড়িটা আজ যেন বেশি স্তব্ধ। বদ্রীনাথকেও মনে হলো অস্বাভাবিক গম্ভীর। সুরেনও মুখ তুম্বো করে আছে। পুতুলের মতো সেলাম দিল মাত্র। তারপর সে আমাদের দোতলায় নিয়ে গেল।

শ্রীলেখা করিডরে দাঁড়িয়েছিলেন। ক্ষুব্ধভাবে বলে উঠলেন, 'কর্নেল সরকার! আমি প্রতারিত হয়েছি। তবে এ জন্য আপনিও দায়ী। আপনি আজ আমাকে কেন মিথ্যা ভয় দেখিয়ে অফিসে উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন, বুঝতে পারছি না। আমি আজ বাড়িতে থাকলে কখনই এ সর্বনাশ হতো না। তাছাড়া আপনি এই ঘরটা আর লক করে রাখার দরকার নেই বলে-ছিলেন। লক করা থাকলে এমন সর্বনাশ কিছুতেই হতো না।'

কর্নেল বললেন, 'কী সর্বনাশ হয়েছে মিসেস ব্যানার্জি? কম্পিউটারটা চুরি গেছে তো?'

শ্রীলেখা চমকে উঠে বললেন, 'আপনি কী করে জানলেন ?'

কর্নেল পর্দা সরিয়ে যে ঘরে ঢুকলেন এবং কর্নেলের পেছনে আমরাও ঢুকলাম, সেই ঘরটা আমাদের পরিচিত। শান্তভাবে উনি সোফায় বসলেন। আমরাও বসলাম। শ্রীলেখা রুষ্টমুখে বললেন, 'চুরি যায়নি। দিনদুপুরে বাটপাড়ি করেছে। আমাকে আপনি এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন যে মালতী বা সুরেনদের সতর্ক করার কথা চিন্তা করিনি। তা ছাড়া আমি অফিসে যাওয়ার পর সাংঘাতিক উড়ো ফোন, সুদেষ্ণা কিডন্যাপ্ড্—'

কর্নেল ওঁর কথার ওপর বললেন, 'কিন্তু আসলে সে কিডন্যাপ্ড্ হয়নি। যাই হোক বুঝতে পারছি সুদেষ্ণা এসে কম্পিউটারটা আস্ত তুলে নিয়ে গেছে। সম্ভবত আমি এখানে একটা হারানো চাবি খুঁজতে আসার পর সে এসেছিল। তবে হ্যাঁ—কম্পিউটারটা চুরি যেতই। যে-কোনও দিনই যেত।'

শ্রীলেখা তীক্ষ্দৃষ্টে কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। জোরে শ্বাস ফেলে বললেন, 'দেন ইউ নো ইট !'

কর্নেল হাসলেন। 'এ বাড়িতে সুদেষ্ণার গতিবিধি অবাধ। আপনার বিশ্বস্ত পি এ।'

'আমি কল্পনাও করিনি সে এমন কিছু করবে।' শ্রীলেখার কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল উত্তেজনায়। 'সে এসে মালতীকে বলে, অফিস থেকে আসছে। জয়দীপের কম্পিউটারটা আমি নাকি তাকে নিয়ে যেতে বলেছি। ফ্যাক্টরিতে পাঠাতে হবে। কম্পিউটারটা গণ্ডগোল করছে। মালতীর অবিশ্বাসের কারণ ছিল না। বজ্জাত মেয়েটা কম্পিউটারটা খোলে। সুরেনকে ওটা গাড়িতে পৌঁছে দিতে বলে। হাল্কা মেশিন।'

'গাড়িটা সুরেন দেখেছে তাহলে ? কী গাড়ি ?'

'সাদা রঙের মারুতি ! আমার গাড়িটাও সাদা মারুতি।'

'গাড়িতে কেউ ছিল ?'

'না। সুদেষ্ণা ড্রাইভিং জানে। কাজেই সুরেনের সন্দেহের কারণ ছিল না।'

'আপনি কি বাড়ি ফিরে দেখলেন কম্পিউটার নেই ?'

'হ্যাঁ। ওটা নেই দেখেই চমকে উঠেছিলাম। তারপর মালতীকে জিজ্ঞেস করলাম।' শ্রীলেখা দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্না সম্বরণ করে বললেন, 'আমি এত বোকা ! অনীশের চিঠিটা দেখার পর আমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপনি আমাকে মিসলিড করলেন। কেন কর্নেল সরকার ?'

কর্নেল চুরুট বের করে বললেন, 'এ ঘরে এখন ধূমপান করা যায়।' তারপর চুরুট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, 'মিসেস ব্যানার্জি ! আপনার বিচলিত হবার কারণ নেই। কম্পিউটারের দুটো গোপন তথ্যই

আমি আপনার অগোচরে মুছে নষ্ট করে দিয়েছিলাম। দুটো তথ্যই আমার কাছে আছে। তো আপনি ঘড়িটা যথাস্থানে পেঁাছে দিয়েছেন কি?'

'দিয়েছি। শেখর নাকে আমার এক কর্মচারীকে আউট্রাম ঘাটে পাঠিয়েছিলাম। শেখর ফিরে এসে বলল, লালরঙের মোটরসাইকেল নিয়ে—'

'জাস্ট এ মিনিট।' বলে কর্নেল পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে শ্রীলেখাকে দিলেন। 'দেখুন তো মিসেস ব্যানার্জি! সি এস সিনহা নামে আপনার কোনও কর্মচারী আছেন কি না?'

শ্রীলেখা চমকে উঠে বললেন, 'এ তো শেখরের কার্ড। তার নাম চন্দ্রশেখর সিনহা। জয় তাকে শেখর বলতো, আমিও বলি। কিন্তু আপনি ওর কার্ড কোথায় পেলেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন। এবার আমাকে অনীশ রায়ের চিঠিটা দেখান।'

শ্রীলেখা আলমারি খুলে একটা ব্রিফকেস বের করলেন। ব্রিফকেস খুলে একটা এয়ারোগ্রাম লেটার বের করে কর্নেলকে দিলেন। সেটার ওপর বিদেশি টিকিট ছাপানো। কর্নেল নিবিষ্ট মনে চিঠিটা পড়ার পর বললেন, 'হুঁ। আপনার স্বামী অনীশবাবুর চিঠির মর্ম বুঝতে পারেননি। তাই আপনাকে ভুল বুঝেছিলেন। মিঃ ব্যানার্জি ভেবেছিলেন আপনি ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছেন। তা না হলে জনৈক বি আর সোমকে অত পাত্তা দেবেন কেন? কিন্তু কে এই ভদ্রলোক?'

শ্রীলেখা উত্তেজিতভাবে বললেন, 'ফরেন ট্রেড কনসালট্যান্ট। ওঁকে অনীশের প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে পারেন! ওঁর সম্পর্কে অনীশের রাগ থাকতেই পারে। অনীশের ফার্ম মিঃ সোমের ফার্মের সঙ্গে কম্পিটিশনে টিকতে পারেনি। কিন্তু আমাব আশ্চর্য লাগছে, জয় তো মিঃ সোমেব পরামর্শেই চলত। কাজেই আমি ওঁকে পাত্তা দিয়েছি। অবশ্য পাত্তা দেওয়া বলতে কখনও-সখনও কোনও বড় হোটেলে ওঁর পার্টিতে যাওয়া। জয়ও গেছে। আবার কখনও তার কোনও জরুরি কাজ থাকলে আমাকে একা যেতে বলেছে। ইভ্‌ন হি ইনসিস্টেড্ মি টু অ্যাটেন্ড।'

'মিঃ সোমের ফার্ম কোথায়?'

'যে বাড়িতে আমার কোম্পানি-অফিস, সেই বাড়িতেই। আমার অফিস সিক্সথ ফ্লোরে। মিঃ সোমের অফিস সেকেন্ড ফ্লোরে।'

'ওঁর সঙ্গে টেলিফোনে এখন যোগাযোগ করা যায়? আই মিন, ওঁর বাড়িতে?'

'মিঃ সোম এখন জাপানে। গত সপ্তাহে গেছেন। ফিরবেন জানুয়ারির মাঝামাঝি।' শ্রীলেখা কর্নেলের দিকে তাকালেন। কয়েক সেকেন্ড পরে ফের বললেন, 'আপনি ওঁর সম্পর্কে আগ্রহী কেন কর্নেল সরকার?'

কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে দুটো কাগজ বের করে বললেন, 'যে

অ্যাংলোইন্ডিয়ান যুবকটি খুন হয়েছে, তার নাম বব ? হ্যাঁ—আপনার পি. এ-র বয়ফ্রেন্ড। এটা তারই হাতের লেখা। এতে বি আর সোম এবং তাঁর বাড়ির ঠিকানা লেখা আছে। আর এই দলপাকানো কাগজটা আপনার কর্মচারী শেখরের চিঠি। সে সুদেষ্ণাকে লিখেছে, মিঃ সোম এই চিঠি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছেন। শেখর না যাওয়া পর্যন্ত যেন দুজনে অপেক্ষা করে। যদি ইতিমধ্যে কোনও গণ্ডগোল হয়, তা হলে মিঃ সোম সুদেষ্ণাকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে চলে যাবেন। জিনিসটা শেখরের কাছে আছে। কাজেই সুদেষ্ণার কোনও দ্বিধার কারণ নেই। সে যেন মিঃ সোমের সঙ্গে তাঁর বাড়ি চলে যায়। অবস্থা বুঝে শেখর জিনিসটা নিয়ে সেখানেই যাবে এবং চূড়ান্ত মীমাংসা হবে।'

শ্রীলেখার বিস্মিত দৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না'

এই সময় মালতী কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে আনল। ট্রে রেখে সে চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন, 'মিঃ সোমের মুখে দাড়ি আছে কি ?'

শ্রীলেখা বললেন, 'না তো ! কেন ?'

হালদারমশাই বলে উঠলেন, 'বুঝছি ! হা—' সামলে নিয়ে ফের বললেন, 'নকল দাড়ি জানলে আগে তার দাড়িতে টান দিতাম। ঘুঘু দেখেছে, ফান্দ দেখে নাই।'

শ্রীলেখা ক্লান্তভাবে বললেন, 'আপনারা কফি তৈরি করে নিন প্লিজ !'

একটু পরে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, 'চিয়ার আপ মিসেস ব্যানার্জি ! শেষ অব্দি আপনিই জিতে গেছেন। আপনার প্রতিপক্ষ এখন হা হুতাশ করছে। কারণ কম্পিউটারের গোপন ডেটা আমি মুছে নষ্ট করে দিয়েছি।'

শ্রীলেখার মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। 'আপনি কি সব কথা খুলে বলবেন ?'

'বলব। আগে একটা অপ্রিয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর চাই। তা হলে একটা পয়েন্ট পরিষ্কার হবে।'

'বলুন !'

'দু' মাস ধরে সুদেষ্ণা আপনার পি এ-র কাজ করছে। তার আগে সে আপনার—বরং বলা উচিত, আপনাদের কোম্পানি-অফিসে স্টেনো-টাইপিস্ট ছিল। আপনি আমাকে বলেছেন, মিঃ ব্যানার্জিই তাকে আপনার পি এ হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তা-ই কি ? নাকি আপনিই তাকে চেয়েছিলেন ?'

শ্রীলেখা আস্তে বললেন, 'আমিই তাকে চেয়েছিলাম

'এর বিশেষ কারণ ছিল কি ?'

'ছিল। জয়কে মেয়েটা পেয়ে বসেছিল। ওর প্রতি জয়ের দুর্বলতা আমার চোখ এড়ায়নি। জয় ওকে কম্পিউটার ট্রেনিং দিচ্ছিল।' শ্রীলেখা মুখ ঘুরিয়ে

জোরে শ্বাস ফেলে বললেন 'থাক। ও সব কথা বলতে রুচিতে বাধে। শি ওয়াজ এ ন্যাস্টি গার্ল।'

'তাই আপনি সুদেষ্ণাকে চোখে-চোখে রাখতে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে পয়েন্টটা পরিষ্কার হলো। সম্ভবত কোনও এমোশনাল অবস্থায় মিঃ ব্যানার্জি সুদেষ্ণাকে এমন গোপন কথা জানিয়ে ফেলেছিলেন, যা তাকে লোভী করে তুলেছিল। কিন্তু সে একা কাজে নামতে সাহস পায়নি। তা ছাড়া রোমার ঘড়িটাও দরকার ছিল। আপনি কোনও রোমার ঘড়ি আপনার স্বামীর কাছে দেখেননি। তার মানে, মিঃ ব্যানার্জি সেই ঘড়িটা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন।'

শ্রীলেখা আবার রুষ্ট হলেন। 'কর্নেল সরকার! আগেও আপনাকে বলেছি, জয়ের অনেক ঘড়ি ছিল। স্বামী কখন কোন ঘড়ি হাতে পরছে, কোনও স্ত্রী তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

'ঠিক, ঠিক।' কর্নেল সায় দিলেন। 'তবে অনীশ রায়ের চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে, মিঃ সোমের মতো ঝানু লোকের সঙ্গে আপনার মেলামেশায় আপনাকে ভুল সন্দেহ করেছিলেন মিঃ ব্যানার্জি। আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কারণ—'

কর্নেল হঠাৎ থেমে গেলে শ্রীলেখা তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'কারণ? কর্নেল সরকার! উইল ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন মি?'

'জুয়েল্স্ মিসেস ব্যানার্জি! এ বাজারে যার দাম প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ্য টাকা।'

'জুয়েল্স্'! শ্রীলেখা চমকে উঠলেন। 'কী বলছেন আপনি!'

'হ্যাঁ। চোরাই হীরে। আপনার শ্বশুরমশাইয়ের ঘড়ির ব্যবসা ছিল। জাপান থেকে তিনি ঘড়ি আমদানি করতেন। একটা দেয়াল ঘড়ির ভেতর একজন কুখ্যাত স্মাগলার হীরে পাচার করেছিল। ঘড়িটা যখন সুশোভনবাবুর কাছে পেঁৗছেছে, তখন লোকটা অন্য একটা স্মাগলিং কেসে ধরা পড়ে যায়। পাঁচ বছর জেলে কাটিয়ে সে যখন মুক্তি পায়, তখন সুশোভনবাবুর সুদক্ষিণা ওয়াচ কোম্পানি উঠে গেছে এবং তিনিও মারা গেছেন। তাঁর ছেলে জয়দীপ কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়ে কম্পিউটার তৈরির কারবারে নামার প্ল্যান করছেন। তিনি এ বাড়ির একটা অচল দেয়াল ঘড়ির ভেতর হীরেগুলোর সন্ধান পান। হ্যাঁ—তাঁর বাবা মৃত্যুর আগে নার্সিং হোমে থাকার সময় গোপনে তাঁকে এ বিষয়ে আভাস দিয়েছিলেন। আর মিসেস ব্যানার্জি! সেই কুখ্যাত স্মাগলারের নাম বিমলারঞ্জন সোম অর্থাৎ বি আর সোম। জয়দীপ ব্যানার্জি তাই তাকে সমীহ করে চলতেন। এমন ভাব দেখাতেন, যেন সোমের আসল পরিচয় তাঁর জানা নেই।'...

॥ সাত ॥

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। হালদারমশাই সাবধানে নস্যি নিচ্ছিলেন। কর্নেল তাঁর নিভে যাওয়া চুরুট যত্ন করে ধরালেন। তারপর শ্রীলেখা মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনি কাল রাতে জয়ের কম্পিউটার থেকে যে ডেটা বের করে নিয়ে গেলেন, তাতেই কি এসব কথা আছে?'

কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ। আমি তো অন্তর্যামী নই।'

'এবার আমাকে দুটো ডেটাই দেখাতে আপত্তি থাকার কথা নয়।'

'নাহ্!' কর্নেল হাসলেন। 'তবে প্রথমটা তেমন কিছু নয়। ওটা দেখলে অকারণ দুঃখ পাবেন। তাই দ্বিতীয়টা আপনাকে দেব। এটাতেই হীরেগুলোর সন্ধান আছে।'

'কোথায় আছে সেগুলো?'

'এই বাড়িতে।'

'বাড়িতে—কোথায়?'

'আপনার বেডরুমে একটা জাপানি ছবি আছে তো?'

শ্রীলেখা উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আছে। বাঁধানো ছবি। ছবিতে একটা বড় রঙীন ফুল আঁকা আছে। তার পাপড়িতে একটা জলের ফোঁটা। ছবিটার কাপশানে লেখা আছেঃ হিউম্যান লাইফ ইজ দা টাইনিস্ট্ প্ল্যান্ট অব এ রেনড্রপ।'

'আপনি ছবিটা নিয়ে আসুন।'

'ছবিটা উঁচুতে আছে। আমি একা নামাতে পারব না।'

'তা হলে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে রাজী। জয়ন্ত! হালদারমশাই! চলুন।'

আমরা বেডরুমে গেলাম। হালদারমশাই লম্বা মানুষ। একটা টুলে উঠে ছবিটা নামালেন। কর্নেল বললেন, 'এবার চলুন ও ঘরে যাওয়া যাক্।'

আগের ঘরে ফিরে কর্নেল বেডরুমে ঢোকার এবং করিডরে যাওয়ার দরজা দুটো ভেতর থেকে আটকে দিলেন। তারপর ছবিটা টেবিলে উল্টো করে রেখে পকেট থেকে ছোট্ট ছুরি বের করলেন। ছুরির ডগা দিয়ে ছবির পেছনের কাগজ, তারপর পিচবোর্ড কেটে সাবধানে তুলে নিলেন। একটা চৌকো ঘন নীলরঙের ভেলভেট কাপড় বিছানো আছে দেখা গেল। কাপড়টা কর্নেল একটুখানি তুলতেই নিচে আরেটা চৌকো নীল ভেলভেট কাপড়ের ওপর ঝকমক করে উঠল ছোট ছোট হীরের টুকরো। আকাশের একঝাঁক নক্ষত্রের মতো। টুকরোগুলো খোপে খোপে বসানো আছে।

হালদারমশাই বলে উঠলেন, ‘কী কান্ড!’ তারপর সারগুলো ঝটপট গুনে বললেন, ‘টেন ইনটু টেন। শওখান। ওয়ান হান্ড্রেড পিসেস অব ডায়ামন্ড!’

কর্নেল বললেন, ‘মিসেস ব্যানার্জি! আপাতত এগুলো এই কাপড়েই বেঁধে আলমারির লকারে রেখে দিন। বাট আই মাস্ট ওয়ার্ন ইউ—এগুলো চোরাচালানি হীরে। তা ছাড়া এগুলো ফেরত পাওয়ার জন্য বিমলারঞ্জন সোম আবার সুযোগ খুঁজবে। সে ববের খুনী, এটা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা যাবে না। যদি তার জেল হয়, আবার সে ছাড়া পাবে। তখন আপনি আপনার স্বামীর মতোই বিপন্ন হবেন। কাজেই আজ রাতের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকে।’

শ্রীলেখা ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবছিলেন। আস্তে বললেন, ‘আপনি যা বলবেন, তাই করব। আমি জয়ের মতো লোভী নই। স্বার্থপর নই। আপনিই বলুন, আমার কী করা উচিত।’

‘আগে ওগুলো আলমারির লকারে রেখে আসুন।’

‘শবশুরমশাইয়ের আমলের আয়রনচেস্ট আছে। সেখানে রাখাই নিরাপদ।’

‘ঠিক আছে। তবে সাবধান। কেউ যেন—’ কর্নেল চাপা গলায় বললেন, ‘আই মিন, মালতীও টের না পায়। জুয়েলসের লোভ মানুষের মাথা খারাপ করে দেয়।’

শ্রীলেখা ভেলভেটের ভেতর হীরেগুলো গুছিয়ে পুঁটুলি তৈরি করলেন। তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল রঙিন পশমি চাদর। সেই চাদরের ভেতর পুঁটুলিটা নিয়ে গম্ভীরমুখে চলে গেলেন।

হালদারমশাই হঠাৎ খি খি করে হেসেই জিভ কেটে থেমে গেলেন। বললাম, ‘কী হলো হালদারমশাই? হাসলেন যে?’

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফিসফিস করে বললেন, ‘ম্যাডাম য্যান নিজেই চুরি করছেন! কীভাবে পাও ফেইলা যাইতাছেন দেখলেন না?’

কর্নেল কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, ‘হুঁ! চোরাই মাল এরকমই। হাতে নিলে নিজেকে চোর চোর লাগে।’

বললাম, ‘দুটো প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছি না বস্!’

‘যেমন?’

‘বি আর সোমের চেলা যখন শেখর বা সি এস সিনহা, তখন ঘড়িটা দেওয়ার জন্য আউট্রাম ঘাট বেছে নেওয়া হলো কেন? তা ছাড়া আপনি বলছিলেন, সাড়ে পাঁচটায় শীতের সন্ধ্যা—’

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, ‘ওরা জানে শ্রীলেখা প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়েছেন, এমনকি আমারও দ্বারস্থ হয়েছেন। তাই এই সতর্কতা। দেখবে, শেখর কাল দিব্যি ভালমানুষ সেজে অফিসে যাবে। সোমও তার অফিসে যাবে।

শুধু সুশান ওরফে সুদেষ্ণাকে গা ঢাকা দিতে হবে। কারণ তার ফ্ল্যাটে পুলিশ গেছে। তার চেয়ে বড় কথা, সে দিনদুপুরে কম্পিউটার চুরি করেছে।'

বললাম, 'দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি আজ সকালে মিসেস ব্যানার্জিকে অমন ভয় দেখিয়ে তাঁর কোম্পানি অফিসে যেতে বললেন। না গেলে নাকি সর্বনাশ হবে। কিন্তু তেমন কোনও আভাস মিসেস ব্যানার্জির কাছে এখনও পাইনি। ব্যাপারটা কী?'

কর্নেল হাসলেন। 'কম্পিউটার চুরির সুযোগ দিয়েছিলাম চোরকে। জাস্ট এ শর্ট অব ট্র্যাপ। তবে তখনও জানতাম না কে যন্ত্রটা চুরি করবে। শুধু বুঝতে পারছিলাম, যন্ত্রটা চুরি যাবেই এবং চুরি গেলে আমার থিওরি সঠিক প্রমাণিত হবে। আই ওয়াজ কারেক্ট।'

শ্রীলেখা ফিরে এলেন। তাঁকে খুব আড়ষ্ট দেখাচ্ছিল। মৃদুস্বরে বললেন, 'আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে কর্নেল সরকার! আপনিই বলুন, এবার কী করা উচিত।'

কর্নেল চোখ বুজে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'এক ঢিলে দুই পাখি মারা পড়বে, যদি আপনি একটু ট্যাক্টফুল হন।'

'বলুন কী কবব?'

'আপনার কর্মচারী শেখর কাল যথারীতি অফিস যাবে। তার গা ঢাকা দেওয়ার কারণ নেই। আপনি কিন্তু তার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করবেন। তারপর সুদেষ্ণার কম্পিউটার চুরি করার কথা তাকে বলবেন। সেইসঙ্গে এ-ও জানিয়ে দেবেন, আপনিই কম্পিউটারের ফার্স্ট কী ওয়ার্ড ব্রেড এবং তা থেকে ঘড়ির পেছনে খোদাই করা নাম্বারের সাহায্যে মিঃ ব্যানার্জির দুটো গোপন ডেটা উদ্ধার করেছিলেন। আপনি ডেটা দুটো বুদ্ধি করে মুছে দিয়েছিলেন। তারপর চোরচালানি হীরে আপনি খুঁজে পেয়েছেন।'

শ্রীলেখা চমকে উঠেছিলেন! 'সে কী!' বলে সোজা হয়ে বসলেন।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'হ্যাঁ। আপনি শেখরের সঙ্গে পরামর্শের ভান করবেন। আপনি বলবেন, চোরাই হীরে কী ভাবে বিক্রি করা যায় বুঝতে পারছেন না। তাই আপনার কোম্পানির ট্রেড কনসালট্যান্ট বি আর সোমের সাহায্য চান। ও কে?'

শ্রীলেখা অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না।

হালদারমশাই নড়ে বসলেন। 'কন কী?'

আমিও বললাম, 'সোম হীরেগুলোর জন্যই এত কাণ্ড করল। আর শেষ অব্দি তাকেই হীরের কথা বলতে যাওয়ার মানে হয়?'

কর্নেল আমাদের কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'মিসেস ব্যানার্জি! আপনি কাল সঙ্গে হীরেগুলো নিয়ে যাবেন। শেখরের সঙ্গে পরামর্শের ভান

করার পর ফোনে সোমকে জানাবেন, একটা জরুরি ব্যাপারে তাঁর কাছে যাচ্ছেন। সোম অফিসে থাকবে—সিওর। কারণ সে মণিহারা ফণী। মণির জন্য সে মরিয়া।'

শ্রীলেখা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'তারপর ?'

'তারপর তার অফিসে হীরেগুলো ব্রিফকেসে ভরে নিয়ে যাবেন। সঙ্গে শেখরকে নেবেন। শেখরকে যা যা জানিয়েছেন, তাকেও তা-ই জানাবেন। হীরেগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করতে বলবেন। সে সেগুলো দেখতে চাইবে। আপনি তাকে হীরেগুলো দেবেন। ও কে ?'

শ্রীলেখা আস্তে বললেন, 'আপনার প্ল্যানটা বুঝতে পারছি না।'

কর্নেল হাসলেন। 'এক ঢিলে দুই পাখি বধ। প্লিজ ডোণ্ট ওয়ারি।' বলে উনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর 'উইশ ইউ গুড লাক' বলে পা বাড়ালেন!

আমরা কর্নেলকে অনুসরণ করলাম। গাড়িতে উঠে হালদারমশাই উত্তেজনাবশে আবার একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর আপনমনে বললেন. 'এক ঢিলে দুই পাখি বধ! কিন্তু আমার বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দিল না!'

পরদিন সকালে সল্টলেক থেকে কর্নেলকে ফোন করলাম। ষষ্ঠী বলল, 'বাবামশাই বাইরে গেছেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই।'

আবার দুপুরে ফোন করলাম। ষষ্ঠী বলল, 'হালদারমশাই এসেছিলেন বাবামশায়ের জন্য বসে থেকে থেকে টায়ার হয়ে চলে গেছেন।'

'আমিও টায়ার হয়ে যাচ্ছি, ষষ্ঠী!'

ষষ্ঠী বলল, হয়তো পাখি-টাখির খোঁজে গেছেন। বাবামশাইকে তো জানেন!'

'না ষষ্ঠী। উনি পাখি মারতে গেছেন। ফিরলে আমাকে ফোন করতে বলো যেন'!

ষষ্ঠী হাসতে হাসতে অস্থির হচ্ছিল। ফোন রেখে দিলাম।

কর্নেলের টেলিফোন পেলাম দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে। তখন প্রায় আড়াইটে বাজে। বললেন, 'ডার্লিং! এক ঢিলে দুই পাখি বধ হয়েছে। সোম আর তার চেলা শেখর ধরা পড়েছে। কাস্টমস অফিসাররা এবং ক্রাইম ব্র্যাঞ্চের পুলিশ অফিসাররা সাদা পোশাকে তৈরি ছিলেন। যাই হোক, কুখ্যাত আন্তর্জাতিক স্মাগলারকে বমাল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীলেখা ব্যানার্জি সেণ্ট্রাল গভর্মেণ্টের সুনজরে পড়লেন। এতে ওঁর ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হবে। আর সুশান ওরফে সুদেষ্ণা ধরা পড়েছে সোমের লেকভিউ রোডের বাড়িতে। হ্যাঁ, সেই কম্পিউটারসহ। আচ্ছা! ছাড়ি। ফুল স্টোরির জন্য চলে এস।'

ফোন রেখে তখনই হন্তদন্ত লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা আগামী কাল একটা চাঞ্চল্যকর এক্সক্লুসিভ স্টোরি ছাপতে পারবে।...

পাতাল গুহার বুদ্ধমূর্তি

(কর্নেলের জার্নাল থেকে)

হোটেল দ্য লেক ভিউ-এর ব্যালকনি থেকে বাইনোকুলারে সেই সেক্রেটারি বার্ডটিকে খুঁজছিলাম। সারস জাতীয় এই দুর্লভ পাখিকে বাংলায় বলা হয় কেরানি পাখি। কারণ, সহসা দেখলে মনে হয়, তার কানে যেন কলম গোঁজা আছে।

কাল বিকেলে হ্রদের তীর থেকে পাখীটাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলাম। বিস্তীর্ণ এই প্রাকৃতিক জলাশয়ের মধ্যিখানে একটা জলটুঙ্গি আছে। সেখানে ঘন জঙ্গল। পাখিটা একলা, নাকি তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী আছে জানি না। তবে সে অতিশয় ধূর্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন একটা দুর্গম জঙ্গলে সে তার ডেবা বেছে নিয়েছে।

এই হ্রদের নাম বৃটিশ আমলে ছিল 'মুন লেক'। পরবর্তী কালে হয়ে উঠেছে 'চন্দ্র সরোবর'। আসলে এটি প্রাগৈতিহাসিক কালের মৃত এক আগ্নেয়-গিরির বিশাল ক্রেটার। চারদিকে ঘেরা উঁচু-নিচু পাহাড়। পর্যটন মন্ত্রকের তদারকে সম্প্রতি উত্তর এবং পূর্ব দিকের পাহাড়ের গায়ে অনেক বাংলো, কটেজ, হোটেল, দোকানপাট—এমন কি একটি টাউনশিপও গড়ে উঠেছে। তবে সেই টাউনশিপটি ধনবানদের ? অধিকাংশ সময় সেখানকার সুরম্য বাড়িগুলি খাঁ খাঁ করে।

'লেক ভিউ' হোটেল হ্রদের পূর্বদিকের পাহাড়ের গায়ে এবং তীর থেকে তার উচ্চতা অন্তত ষাট ফুট। এখান থেকে হ্রদের তীরে নেমে যাওয়ার জন্য একটি ঘোরালো এবং এবং ঢালু পায়ে চলা পথ আছে। বয়স্করা সে পথে নেমে যাওয়ার ঝুঁকি নেন না। উঠে আসার প্রশ্ন তো তোলাই যায় না। তবে আমার কথা আলাদা। আমার অতীত সামরিক জীবনের সব শিক্ষা এই এই বৃদ্ধ বয়সে চমৎকার কাজে লাগছে দেখে নিজেই বিস্মিত হই।

তো বয়স্কদের জন্য পায়ে হেঁটে বা গাড়ি চেপে চন্দ্র সরোবরের বেলাভূমিতে যাওয়ার পথটি আছে এই হোটেলের পূর্ব দিকে। ওই দিকটায় পাহাড় অতি ধীরে ঢালু হতে হতে সমতলে নেমে গেছে। বাঁক নিতে নিতে সেই পথ তাই পশ্চিমে হ্রদসীমান্তে পেঁছেছে।

যে কাহিনীটি এখানে বলতে বসেছি, তা স্পষ্ট করে তোলার জন্যই পটভূমি ও পরিবেশের চিত্রটি ঈষৎ বিস্তৃত ভাবে আঁকার প্রয়োজন হল। আর একটা কথা। নিজের সামরিক জীবনের স্মৃতির খাতিরেই চন্দ্র সরোবরের বদলে 'মুন লেক, নামটি আমার পছন্দ। আমার তরুণ বয়সে এই দুর্গম পার্বত্যহ্রদের তীরে একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল এবং সেই ঘাঁটিতে আমি কিছুদিন ছিলাম।

শরৎকালের শুক্লপক্ষের রাতে যে বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে দেখেছিলাম, তা অবিস্মরণীয়। তৎকালেই বুঝেছিলাম এই হ্রদের নাম কেন 'মুন লেক' দেওয়া হয়েছে।

মুন লেকের জলটুঙ্গিতে সেক্রেটারি বার্ডের খবর সম্প্রতি একটি ইংরেজি দৈনিকে বেরিয়েছিল। খবরটি পড়ে এখানে চলে এসেছি। নভেম্বরে পর্যটন মরশুম শুরু। হঠাৎ করে চলে আসার জন্য অগত্যা এই দোতলা হোটেলে উঠতে হয়েছে। নতুবা সরকারি বাংলো বা কটেজই আমার পছন্দ। সেখানে ভিড় ভাট্টা কম হয়।

ভোরে কুয়াশা ছিল। মুন লেকের তীরে সাড়ে আটটা অব্দি ঘোরাঘুরি করে পাখিটাকে দেখা এবং ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করে তার ছবি তোলার আশা ছেড়ে দিয়ে হোটেলে ফিরেছিলাম। তারপর দোতলার ব্যালকনিতে বসে কফি খেতে খেতে লক্ষ্য করেছিলাম, কুয়াশা সরে গিয়ে রোদ ছড়িয়েছে। তাই বাইনোকুলারে জলটুঙ্গিটা দেখছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমাকে বোকা বানিয়ে পাখিটা জলটুঙ্গির জঙ্গল থেকে সহসা উড়ে গেল। তার গতিপথ লক্ষ্য করতে গিয়ে একটা দৃশ্য দেখে একটু চমকে উঠলাম। মুন লেকের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি ঝুলে থাকা একটা চাতালের প্রায় শেষপ্রান্তে এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে এবং এক যুবক ক্যামেরায় তার ছবি তোলার জন্য তাকে আরও পিছনে হটে যেতে ইশারা করছে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম, আর এক পা পিছিয়ে গেলেই যুবতীটি নীচের গভীর খাদে পড়ে প্রাণ হারাবে। একটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে চলেছে। অথচ এত দূরে থেকে আমার কিছু করার নেই। ওরা এত নির্বোধ কেন বুঝি না।

সহসা যুবতীটি পিছু ফিরে দেখেই দ্রুত সরে গেল। আমার আশঙ্কার অবসান ঘটল। এবার দেখলাম, যুবতীটি হাত নেড়ে তার সঙ্গীকে কিছু বলতে বলতে চাতালের পিছনের ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করেছে। বাইনোকুলারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তার মুখে রাগের আভাস। যুবকটি অবশ্য হাসতে হাসতে তাকে অনুসরণ করছিল। পাথরের ধাপগুলির নীচে পাহাড়টা ক্রমে ঢালু হয়ে সমতলে নেমেছে। ঢালু অংশটা ঘাস আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা। কিছুক্ষণ পরে হ্রদের তীরে তাদের আবার দেখতে পেলাম। এতক্ষণে তাদের চিনতে পারলাম। এই হোটেলেই কাল রাতে তাদের দেখেছি। নববিবাহিত বাঙালি দম্পতি বলেই মনে হয়েছিল তাদের। সম্ভবত বিয়ের পর হনিমুনে এসেছে।

কিন্তু যে দৃশ্যটা একটু আগে দেখলাম, তা নিছক নির্বুদ্ধিতা, নাকি অন্য কিছু, এই খটকাটা আমার মন থেকে গেল।

দশটায় নীচের ডাইনিং হলে নেমে গেলাম। মুন লেকের দিকের টেবিলগুলি ততক্ষণে আর খালি নেই। অগত্যা কোণের দিকে একটা খালি টেবিলে বসলাম। তারপর ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে ডাইনিং হলের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম। আসলে আমি সেই দম্পতিকে খুঁজছিলাম।

একটু পরে দেখি, আমার উল্টো দিকে তিনটে টেবিলের পর জানালার ধারে ওরা বসে আছে। যুবতীর মুখে এখন অনুচিত ধরণের একটা গাম্ভীর্য। সে চুপচাপ খাচ্ছে। যুবকটি চাপা গলায় কথা বলে সম্ভবত তার মন ভঞ্জনের চেষ্টা করছে। যুবকটির চেহারা অবশ্য তত স্মার্ট নয়। একটু বোকা বোকা ছাপ আছে। যদিও চুলের কেতা আর পোশাকে সে প্রচণ্ডভাবে একালীন।

ব্রেকফাস্টের পর কফির পেয়ালায় সবে চুমুক দিয়েছি, এমন সময় যুবকটি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর তার সঙ্গিনীকে কিছু বলে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে গেল। এখান থেকে হোটেলের লাউঞ্জ চোখে পড়ে। তাকে লাউঞ্জ পেরিয়ে যেতে দেখে বুঝলাম, সে বাইরে কোথাও চলে গেল।

যুবতীটি ঘড়ি দেখে নিয়ে জানালার দিকে মুখ ঘোরাল। তার হাতে চায়ের কাপ। খুব দেরি করে সে কাপে চুমুক দিচ্ছিল।

ইতিমধ্যে ডাইনিং হল ফাঁকা হয়ে গেছে। প্রকৃতি প্রেমিকরাই এখানে পর্যটনে আসে। নভেম্বরের পাহাড়ি শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে এখন রোদের উষ্ণতা দরকার। তাই এখন মুন লেকের তীরে ভিড় হওয়ার কথা। আমিও শিগগির বেরিয়ে পড়তে চাইছিলাম। সেক্রেটারি বার্ডটি যদি দৈবাৎ ফিরে আসে, আকাশপথে তাকে ক্যামেরাবন্দি করার সুযোগ পেতেও পারি।

কিন্তু মনে খটকা থেকে গেছে। তাই কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে সোজা যুবতীটির কাছে চলে গেলাম এবং মুখে উল্লাস ফুটিয়ে বলে উঠলাম, হাই ডার্লিং! তুমি এখানে?

যুবতীটি দ্রুত ঘুরে আমার দিকে তাকাল। সে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বলল, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।

মুখোমুখি চেয়ারে বসে সহাস্যে বললাম, ও ডার্লিং। এখনও তুমি ছোটবেলাকার মতোই দুষ্টু মেয়েটি হয়ে আছ। ওঃ! একবছর পরে তোমার সঙ্গে এখানে হঠাৎ এমন করে দেখা হয়ে যাবে কল্পনাও করিনি। হুঁ—বিয়ে করে ফেলেছ দেখছি। তারপর হানিমুনে আসা হয়েছে, তাই না?

সে বিরক্ত মনে বলল—দেখুন, আপনি ভুল করেছেন। আমি আপনাকে মোটেও চিনি না।

অনুরাধা। তুমি নিশ্চয় বাবা-মাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছ! তাই—

আমি অনুরাধা নয়। আপনি ভুল করছেন।

ভুল করছি? সে কি! অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বললাম, অনুরাধাকে

চিনতে ভুল করব আমি—এ তো ভারী অদ্ভুত। বুড়ো হয়েছি। দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে। মাথায় টাক পড়েছে। সবই ঠিক। কিন্তু এখনও আমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ। চশমা পরার দরকার হয় না। আমি আমার ভাগ্নিকে চিনতে ভুল করব? সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চেহারা। এমনকি কণ্ঠস্বরও এক এ কি করে হয়? না—তুমিই অনুরাধা।

আহ! বলছি আমি অনুরাধা নই।

তাহলে আমারই ভুল। কিন্তু—

আপনি বাঙালি?

বিলক্ষণ। একেবারে ভেতো বাঙালি।

কাল রাতে আপনাকে এখানে দেখেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আপনি বিদেশী ট্যুরিস্ট।

একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ। এই ভুলটা অবশ্য অনেকে করে। কিন্তু আমার অবাক লাগছে, দুটি মেয়ের চেহারা আর কণ্ঠস্বর কি ভাবে এক হয়।

আপনি কোথায় থাকেন?

কলকাতায়। বলে পকেট থেকে আমার নেমকার্ডটা বের করে তাকে দিলাম।

সে কার্ডটা পড়ে বলল, আপনি মিলিটারি অফিসার?

ছিলাম। এখন রিটায়ার্ড।

সে কার্ডটাতে আবার চোখ বুলিয়ে উচ্চারণ করল, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। নেচারিস্ট। নেচারিস্ট মানে?

প্রকৃতি প্রেমিক বলতে পারেন। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ আমার একটা হবি। মুখটা একটু কাঁচুমাচু করে ফের বললাম, আই অ্যাম ভেরি সরি মিসেস—

আমার নাম রাপ্তী সেন। আপনি আমাকে তুমি বলতে পারেন।

বলব। কারণ সত্যিই আমি অবাক হয়েছি। আমার ভাগ্নির সমবয়সী এবং অবিকল তার মতো দেখতে কোন মেয়েকে আপনি বলতে আমার বাধবে। যাই হোক, অনুরাধা যেমন আমাকে আঙ্কেল বলে ডাকত, তুমিও স্বচ্ছন্দে আঙ্কেল বলতে পারো।

রাপ্তী আমার নেমকার্ড আবার দেখতে দেখতে বলল, এটা আমি রাখতে পারি?

অবশ্যই পারো। তো রাপ্তী, তোমরা নিশ্চয় হনিমুনে এসেছ?

রাপ্তী তার হ্যান্ডব্যাগে কার্ডটা চালান করে দিয়ে আস্তে মাথা দোলাল।

কলকাতা থেকে? নাকি—

কলকাতা থেকে।

হাসতে হাসতে বললাম, আমার এই দ্বিতীয় ভাগ্নির বরের প্রশংসা করা

উচিত। তার রুচি আছে। হনিমুনের উপযুক্ত স্থান সে বেছে নিয়েছে। কারণ এই পাহাড়ি লেকের পুরনো নাম কি জানো? মুন লেক। তো তোমার বর ভদ্রলোককে দেখছি না? আলাপ হলে ভালো লাগত।

ও ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। ফিরতে একটু দেরি হবে বলে গেল।

তোমরা কত নম্বরে উঠেছ?

দোতলায় ২২ নম্বর স্যুইটে। আপনি?

আমি ১৯ নম্বরে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, তা তুমি কি ওর জন্য এখানেই অপেক্ষা করবে? আমার মনে হচ্ছে, তোমার স্যুইট থেকে মুন লেক সরাসরি চোখে পড়ে। অবশ্য তুমি ইচ্ছে করলে এদিকের করিডর দিয়ে নেমে লেকের ধারে পেঁছিতে পারো। এখন রোদটা বেশ আরামদায়ক।

রাপ্তী উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল, অচেনা জায়গায় একা ঘুরতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া তমাল ফিরে এসে আমাকে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে বেরুবে।

তমাল? বাহ। বেশ সুন্দর নাম। তোমার নামটাও চমৎকার।

রাপ্তী ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে করিডরে গেল। তারপর দোতলার সিঁড়িতে উঠতে থাকল। তাকে অনুসরণ করছি আঁচ করে সে একবার ঘুরে আমার দিকে তাকাল। বললাম, লেকের ধারে বড্ড বেশী ভিড়। আমি আমার সিঙ্গল স্যুইটের ব্যালকনি থেকে মুন লেকের সৌন্দর্য দেখব। সেজন্য এই বাইনোকুলারই যথেষ্ট।

দোতলার করিডরে গিয়ে রাপ্তী একটু দাঁড়াল। কিছু বলবে মনে হল। কিন্তু বলল না। তাদের স্যুইটের দিকে পা বাড়াল।

একটু কেশে আস্তে ডাকলাম, রাপ্তী।

রাপ্তী পিছু ফিরে বলল, কিছু বলবেন?

আস্তে বললাম, প্রায় এক ঘন্টা আগে বাইনোকুলারে তোমাদের দেখছিলাম। না—ঠিক তোমাদের দেখছিলাম বললে আবার ভুল হবে। লেকের জলটুঙ্গিতে একটা পাখি দেখছিলাম। পাখিটা হটাৎ উড়ে গিয়েছিল। তার গতিপথ লক্ষ করার সময় হঠাৎ দেখি, তুমি একটা বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ এবং তমাল তোমার ছবি তোলার চেষ্টা করছে। দৈবাৎ তুমি পিছনে না তাকালে কি ঘটত ভেবে শিউরে উঠেছিলাম।

রাপ্তী দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হনহন করে চলে গেল।

একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর নিজের স্যুইটে ফিরলাম। যখন ওকে কথাগুলি বলছিলাম, তখন ওর মুখের রেখায় কি একটা ভাব ফুটে উঠেছিল, স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। আতঙ্ক মিশ্রিত ক্ষোভ, নাকি নিছক ক্ষোভ? অথবা আতঙ্ক এবং বিস্ময়? অবশ্য আমার ভুল হতেও পারে। কিন্তু খটকাটা থেকে গেল।

ব্যালকনিতে এখন জোরালো হিম বাতাসের উপদ্রব। টুপি আঁটো করে পরে অন্য একটা পুরু জ্যাকেট গায়ে চড়িয়ে ইজিচেয়ারে বসলাম। বাইনোকুলারে জলটুঙ্গির জঙ্গল খুঁটিয়ে দেখার পর উত্তরে পাহাড়ের গায়ে কটেজ এরিয়া দেখতে থাকলাম। দেখার কোন কারণ যদি থাকে, তাহলে সেটাকে বলব একটা কটেজ না পাওয়ার দুঃখ। কটেজগুলি সত্যিই অসাধারণ। ওইদিকটায় প্রচুর গাছপালা আছে। প্রতি কটেজের সামনে একটা করে ফুলবাগান। তার ফলে ওখানে নানা প্রজাতির প্রজাপতি দেখতে পাওয়া সম্ভব। মুন লেকের দক্ষিণ তীরে কিছু জঙ্গল আর ঝোপঝাড় আছে। কাল বিকেলে সেখানে একজোড়া প্রজাপতি দেখেছিলাম। সাধারণ নাম 'অ্যাপোলো'। প্রজাতির নাম 'পারনাশিউস অ্যাপেলো'। শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলে এদের ডেরা। সেক্রেটারি বার্ডের দিকে মন পড়ে থাকায় ওদের ছবি তোলার চেষ্টা করিনি।

কটেজ এরিয়াটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ল দুটি লোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন ঝগড়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে। বাইনোকুলারের দূরত্বনির্ণায়ক নবটা ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় আনতেই লেন্সে দুজন স্পষ্ট হয়ে উঠল। একজন মধ্যবয়সী, টাই-স্যুট পরা, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এবং চোখে সানগ্লাস—সিনেমার ভিলেন টাইপ চেহারা। অন্যজন—হ্যাঁ, রাপ্তীর স্বামী তমাল সেন।

তবে নাহ্। ওরা তর্ক করছে না। দুজনের মুখেই হাসি আছে। সম্ভবত কোন বিষয়ে উপভোগ্য আলোচনা চলেছে। অতএব খটকা লাগার মতো কিছু নয়। কলকাতার কোন নবাবিবাহিত তমাল সেনের কোন পরিচিত লোক এখানে বেড়াতে আসতেই পারে। তমাল সেন তার সাথে দেখা করতে যেতেই পারে।

ঠিক এই সময় কানে এল আমার স্যুইটের দরজায় কেউ জোরে নক করছে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি রাপ্তী সেন।

রাপ্তীকে আমার স্যুইটের দরজায় দেখে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম তা ঠিক। কিন্তু তন্মুহূর্তে সংযত হয়ে সহাস্যে বললাম, এস রাপ্তী। আমি জানতাম তুমি এই অচেনা-অজানা জায়গায় একলা বোধ করবে এবং সময় কাটানোর জন্য বৃদ্ধ আঙ্কেলের সঙ্গে গল্প করতে আসবে।

রাপ্তী ঘরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, আপনাকে দেখে মনে সাহস পেয়েছি। তাই একটা কথা বলতে চাই।

বেশ তো। বলো। বসে বলো কি বলবে ?

বসব না। যে কোন সময় তমাল এসে পড়তে পারে। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।

কি কথা ?

আপনি ঠিকই বলছিলেন। তমাল আমার ফটো তোলার জন্য একটা বিপজ্জনক জায়গায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।

কথাটা বলে সে একটু থামল। তার মুখে চাপা উত্তেজনা ছিল। তারপর আস্তে শ্বাস ছেড়ে ফেব বলল, আমার বড্ড ভয় কবছে। আর এখানে থাকতে একটুও ইচ্ছে করছে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তমাল আমাকে হয় তো…

বলো।

রাপ্তীর মুখে ব্যাকুলতা ফুটে উঠল। চাপা স্ববে বলল, ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারছি না। তমালের হাবভাব এখানে এসে যেন বদলে গেছে। কাল রাতে কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তারপর দেখি, তমাল বিছানায় নেই। ভাবলাম সে ব্যালকনিতে গিয়ে বসে আছে। কিন্তু উঠে গিয়ে দেখলাম সে ওখানে নেই। তাছাড়া প্রচণ্ড শীত। বিছানায় আবাব শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ভান করে জেগেই ছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে আস্তে আস্তে বাইরের দরজা খুলে সে ঘরে ঢুকল। আপনি জানেন, দরজায় ইণ্টারলকিং সিস্টেম আছে। বাইরে থেকে ঢুকতে হলে চাবি দরকার।

তার মানে, সে চাবি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ?

হ্যাঁ।

তুমি ওকে জিজ্ঞেস করোনি কিছু ?

না। বলে রাপ্তী করুণ মুখে আমার দিকে তাকাল। আমি খুব ভুল করেছি। তমাল সম্পর্কে আমাব এক বন্ধু পারমিতা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু তমালের হাবভাব আচরণে তেমন কিছু পাইনি যে ওকে খারাপ ভাবব। এখন মনে হচ্ছে, পারমিতা ওকে যতটা চেনে, আমি ততটা চিনি না। তমাল হয়তো সত্যিই খারাপ।

কোন অর্থে খারাপ ?

রাপ্তী ব্যস্তভাবে বলল, পরে সময় মতো আপনাকে সব বলব। দরকার হলে আপনি প্লিজ আমাকে একটু সাহায্য করবেন যেন।

ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, নিশ্চিন্তে থেকো। আমি তমালকে ওয়াচ করব। বাই দা বাই, তুমি এমন কোন লোককে কি চেনো, যার মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর চোখে সানগ্লাস, প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়স ?

ট্রেনে ওইরকম চেহারার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর নামটা কি যেন—হ্যাঁ, বিনয় শর্মা। নন-বেঙ্গলি হলেও ভাল বাংলা জানেন। কলকাতায় কি একটা ব্যবসা করেন। উনি ছিলেন ওপরের বার্থে। তমালের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন ?

বিনয় শর্মাকে উত্তরের পাহাড়ে কটেজ এরিয়ায় এখনই দেখছিলাম। তোমার বর তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে গেছে। বলে একটু হেসে বাইনোকুলারটি দেখালাম।

রাপ্তী, এই যন্ত্রটি দূরকে নিকট করে। যাই হোক, ব্যাপারটা আমি দেখছি। তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে তুমি নিজেই সাবধান হতে শেখো।

রাপ্তী দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার খটকা লাগার পিছনে সঙ্গত কারণ ছিল। বরাবর আমি লক্ষ্য করেছি, আমার মধ্যে যেন কি একটা অতিরিক্ত বোধ ক্রিয়াশীল। ইনট্যুইশন বলা হোক, কি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়জাত বোধ বলা হোক, সামরিক জীবনেই এটা অর্জন করেছিলাম। বিশেষ করে জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধের তালিম নেওয়ার পর থেকে আমার ভেতরকার একটা সুপ্ত শক্তি সম্ভবত জেগে উঠেছিল। প্রাণীদের মধ্যে এটা আছে। সভ্যতা মানুষের অবচেতনার গভীরে একে নির্বাসিত করে রেখেছে বলেই আমার ধারণা।

এদিন দুপুরে হোটেলের পশ্চিম দিকের ঘোরালো পায়ে চলা পথটা দিয়ে মুন লেকের তীরে গেলাম। হ্রদে রোয়িংয়ের ব্যবস্থা আছে। একটা রোয়িং বোট পেলে জলটুঙ্গিটার কাছে যাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু এই মরশুমে রোয়িং বোট পেতে হলে অন্তত সাতদিন আগে পর্যটন বিভাগের স্থানীয় অফিসকে জানাতে হবে।

শেষে দক্ষিণের জঙ্গলে অ্যাপোলো প্রজাপতির খোঁজে গেলাম। জঙ্গলের ভেতরে অজস্র ছোট-বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে। সহসা পাথরের ফাঁকে একটা ফুলেভরা অর্কিড চোখে পড়ল। পাহাড়ি অর্কিড দেখতে পেলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। পাথরের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে অর্কিডটার কাছে পৌঁছেছি, সেই সময় ওপরের দিকে ঘন পাইনবনের ভেতর থেকে সেই বিনয় শর্মা বেরিয়ে এল। সে আমাকে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু ইচ্ছে করেই একটু কাশলাম। তখনই সে চমকে উঠে নীচের দিকে তাকাল। তারপর আমাকে দেখতে পেল।

আমি অর্কিডটার ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা তাক করলাম। কিন্তু চোখের কোণা দিয়ে তার প্রতি লক্ষ্য রাখলাম। সে আমাকে দেখছিল। একটু পরে সে আমার কাছে নেমে এসে ইংরেজিতে বলল, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলব? এদিকটায় শঙ্খচূড় সাপের উপদ্রব আছে।

একটু হেসে ইংরেজিতেই বললাম, আপনি শঙ্খচূড় সাপ সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিলেন। সেজন্য ধন্যবাদ।

আপনাকে বিদেশী পর্যটক মনে হচ্ছে। আপনি কি জানেন শঙ্খচূড় সাপ ঘণ্টায় পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার বেগে দৌড়তে পারে?

হয়তো পারে। তবে এই শীতে নাকি শঙ্খচূড় সাপ বেরোয় না। আলাপ জমানোর ভঙ্গিতে ফের বললাম, আপনি কি স্থানীয় বাসিন্দা, নাকি আমার মতোই বেড়াতে এসেছেন?

বেড়াতে এসেছি। কিন্তু আপনি—

তার চোখে চোখ রেখে বললাম, বলুন।

হঠাৎ আপনাকে দেখে বিদেশী মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে আপনি বিদেশী নন।

একটু হেসে বললাম, আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রশংসা করছি। আমি বাঙালি।

বিনয় শর্মা চমকে উঠে বলল, অসম্ভব,। বাঙালিদের সঙ্গেই আমার চেনাজানা বেশি। কারণ আমি কলকাতায় ব্যবসা করি। আপনার চেহারায় একটু বিশেষত্ব আছে।

থাকতেই পারে।

কিছু মনে করবেন না। আপনার মতো এমন লম্বা-চওড়া মানুষ সচরাচর বাঙালিদের মধ্যে দেখা যায় না।

দেখা যায়। আপনি সম্ভবত লক্ষ্য করেন নি। তাছাড়া বাঙালিরা মিশ্র জাতির মানুষ।

বিনয় শর্মা এবার বাংলায় বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম। আপনার পরিচয় পেলে খুশি হব।

আরও জোরে হেসে উঠলাম। বললাম, বুঝতে পারছি আপনি আমার কথা শুনে আমার বাঙালিত্ব যাচাই করতে চান। তো আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। অবশ্য বহুবছর আগে সামরিক জীবন থেকে অবসর নিয়েছি। কিন্তু আপনার বাংলা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি বাঙালি নন। ঠিক ধরেছি, তাই না?

বিনয় শর্মা অবাক দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, অন্য বাঙালিরা ধরতে পারে না। কলকাতায় আমার জন্ম। সেখানেই বাস করি। হ্যাঁ, আমি বাঙালি নই। তার মানে, আমার মাতৃভাষা বাংলা নয়। আমার বাবা-মা এই উত্তরপ্রদেশের মানুষ। আমার নাম বিনয়কুমার শর্মা। যাই হোক, আপনি এখানে বেশিক্ষণ থাকবেন না। বাবার কাছে শুনেছি, শঙ্খচূড় সাপ শীতকালে অন্য সাপের মতো ঘুমিয়ে থাকে না।

কিন্তু মিঃ শর্মা, আপনার তো দেখছি শঙ্খচূড়ের ভয় নেই।

ভয় আছে। তবে আমি সঙ্গে লাইসেন্সড্ ফায়ার আর্মস্ রাখি। বিনয় শর্মা ওপরের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলল, সম্প্রতি খবরের কাগজে পড়েছিলাম, ওখানে কোন পাহাড়ের গায়ে নাকি প্রাচীন যুগের শিলালিপি খোদাই করা আছে। বুঝতেই পারছেন, আমি কারবারি লোক। নানা ধরণের কারবার করি। তাই ইচ্ছে ছিল শিলালিপির একটা ফটো তুলে তা থেকে কপি তৈরী করে বিদেশে কোন মিউজিয়ামকে বিক্রি করব। কিন্তু ওটা খুঁজে পেলাম না।

উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, বলেন কি! কাগজে যখন খবর বেরিয়েছে, তখন ওটা সত্যিই কোথাও আছে। তাছাড়া স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রেরও সেটা জানার কথা।

ও'রা জানেন না। বিনয় শর্মা গম্ভীর মুখে বলল, উড়ো খবর। আজকাল কাগজওয়ালারা মিথ্যা চটকদার খবর ছাপে। অকারণে আমি হয়রান হলাম। লাইফ রিস্ক নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম। ফিরে গিয়ে ওই কাগজে প্রতিবাদ করে চিঠি লিখব।

বিনয় শর্মা পা বাড়িয়ে ফের বলল, আপনি বেশিক্ষণ এখানে থাকবেন না! বাবার কাছে শুনেছি, দুপুরে শঙ্খচুড় সাপেরা জল খেতে নেমে আসে। বাবা একবার এই সাংঘাতিক সাপের পাল্লায় পড়েছিলেন।

সে আমায় পাশ কাটিয়ে নেমে গেল। হ্রদের তীরবর্তী সমভূমিতে গিয়ে সে একবার ঘুরে আমাকে দেখল। তারপর হনহন করে হাঁটতে থাকল। আমার হাসি পাচ্ছিল। কিছু লোক থাকে, যারা সবসময় অন্যদের নির্বোধ ভাবে। এই লোকটি সেই গোত্রের।

এখন সাড়ে বারোটা বাজে। বেলা দুটোর পর লেকভিউয়ে আর লাঞ্চ মেলে না শুনেছি। সময় হিসেব করে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। কিছুটা ওঠার পর বাইনোকুলারে দেখলাম, বিনয় শর্মা লেকভিউ হোটেলের দিকে পায়ে চলা পথ ধরেছে। সে তা হলে তমাল সেনের কাছেই যাচ্ছে।

পাইনবনে ঢুকে সতর্কভাবে চারদিকে লক্ষ্য রেখে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। একটু পরে সহসা মাথায় এল, এভাবে আমি কিসের খোঁজে যাচ্ছি? বিনয় শর্মার গতিবিধির কোন সূত্রই তো আমার চোখে পড়ছে না। নাহ্! মাঝে মাঝে আজকাল যেন আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। এতদিনে সত্যিই আমার বাহাত্তুরে দশা ঘটেছে দেখছি।

ঢালের ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে চুরুট ধরাল। তারপর বাইনোকুলারে ফুটবিশেক নীচে পাইনবনটা খুঁটিয়ে একবার দেখে নিলাম। সেই সময় একটা মোটাসোটা পাইনগাছের তলায় কয়েকটা সিগারেটের টাটকা ফিল্টারটিপ চোখে পড়ল। বিনয় শর্মা তাহলে ওখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল।

তখনই নেমে গিয়ে জায়গাটা দেখলাম। পাঁচটা সিগারেট খেয়েছে বিনয় শর্মা। সে কি এখানে কারও জন্য অপেক্ষা করছিল? মাটিটা নগ্ন এবং এবড়োখেবড়ো, জুতোর ছাপ খোঁজার চেষ্টা বৃথা। শুধু এটুকু বোঝা যাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে পাঁচটা সিগারেট খেতে যতটা সময় লাগে, এক্ষেত্রে তার চেয়ে দ্রুত সিগারেট খাওয়া হয়েছে। বিনয় শর্মাকে বেলা এগারোটায় প্রায় এক কিলোমিটার দূরে উত্তরের কটেজে তমালের সঙ্গে দেখেছি। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে তাকে এই পাইনবন থেকে বেরুতে দেখলাম। তার মানে, সে বেশিক্ষণ আগে এখানে আসেনি। সম্ভবত আমি অর্কিডটার কাছে পেঁছিনোর কিছুক্ষণ

আগেই সে এখানে উঠে এসেছিল। অন্য কোন দিক থেকে আমার অজ্ঞাতসারে সে দুর্গম এই জঙ্গলে উঠে আসতে পারে না। তবে এটা স্পষ্ট যে, সে খুব কম সময় এখানে ছিল এবং সেই সময়ের মধ্যে পাঁচটা সিগারেট খাওয়া তার তীব্র উদ্বেগকেই জানিয়ে দিচ্ছে।

অবশ্য এর উল্টোটাও হতে পারে। কেউ বিনয় শর্মার জন্যই কি উদ্বিগ্ন ভাবে এখানে অপেক্ষা করছিল? শর্মা এখানে আসার পর সে চলে গেছে কি?

কিন্তু তা হলে সে গেল কোন পথে? যেখানে আর্কিডটা দেখেছি এবং আমিও যেখান দিয়ে উঠে এসেছি, সেটা ছাড়া এই পাইনবনে পৌঁছনো যায় না। কারণ পাইনবনের নীচে খাড়া পাথরের পাঁচিল। কোথাও প্রকাণ্ড সব পাথর এলোমেলো পড়ে আছে একটার পর একটা। মাউন্টেনিয়ারিং-এ ট্রেনিং এবং সরঞ্জাম ছাড়া এই সব পাঁচিল আর পাথর বেয়ে এখানে ওঠা সম্ভব নয়। ওই একটামাত্র ওঠার পথ।

বাইনোকুলারে আবার চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম। সেই সময় হঠাৎ পাইনবনের ভেতরে একটা পাথরের পাশে একটা হাত নড়তে দেখলাম। শুধুই হাত। অর্থাৎ কবজি থেকে আঙুল পর্যন্ত অংশটা।

বাইনোকুলার নামিয়ে খালি চোখে দেখলাম, হাতটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। পাথরটা আছে প্রায় কুড়ি মিটার দূরে একটু নিচু জায়গায়। দ্রুত সেখানে নেমে গেলাম। তারপর চমকে উঠলাম।

পাথরের পেছনে আষ্টেপৃষ্টে দড়িবাঁধা অবস্থায় কেউ কাত হয়ে পড়ে আছে এবং বাঁধনমুক্ত হওয়ার চেষ্টায় মাঝে মাঝে নড়াচড়া করছে। হাঁটু দুমড়ে বসে তার মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে দেখি, সে তমাল সেন।

তার মুখে টেপ সাঁটা আছে। আমাকে দেখা মাত্র সে গোঁ গোঁ করে উঠল।

আমার সঙ্গে সবসময় নানাধরণের দরকারি জিনিস থাকে। জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটা ছোট্ট ছুরি বের করে দড়িটা কাটতে শুরু করলাম। লাইলনের মোটা দড়ি কাটতে একটু সময় লাগল। কাঁধে ঝোলানো জলের বোতল থেকে তার মুখে জলের ঝাপটা দিলাম। তারপর তার মুখের টেপ খুলে ফেললাম। সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করল, জল।

জল খাইয়ে তাকে একটু সুস্থ করে টেনে ওঠাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে পাথরে হেলান দিয়ে বসে হাতের ইশারায় আমাকে নিবৃত্ত করল। দেখলাম দড়ির বাঁধন ছাড়াও তাকে চড়-কিল-ঘুষি মারা হয়েছে। চোয়ালে এবং চোখের নীচে লালচে দাগ বেশ স্পষ্ট। একটু পরে সে ভাঙা গলায় ইংরেজিতে বলল, শিগগির আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন। ও যে কোন সময় এসে পড়বে।

বাংলায় বললাম, তুমি আমার কাঁধে হাত রেখে ওঠার চেষ্টা করো। দেখতেই তো পাচ্ছ আমি একজন বুড়ো মানুষ। তোমাকে কাঁধে বওয়ার

শক্তি আমার নেই। বিশেষ করে এটা পাহাড়ি জঙ্গল।

সে চমকে উঠে তাকাল। তারপর আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরে উঠল। কি ভাবে তাকে নীচের সমভূমিতে নিয়ে এলাম, সে বর্ণনা এখানে অবান্তর। তবে শুধু এটুকুই বলা উচিত, সামরিক জীবনে আহত সঙ্গীকে বয়ে আনার যেসব কৌশল শিখেছিলাম, সেগুলি আবার কাজে লাগল।

নীচে নেমে তমাল বলল, আপনাকে আমি লেক ভিউ হোটেলে দেখেছি। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না। আপনি যে বাঙালি, তা বুঝতে পারিনি।

হ্যাঁ। আমি বাঙালি। আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তো তুমি কি এখন হাঁটতে পারবে? নাকি ট্যুরিস্ট সেণ্টারে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করব?

প্লিজ কর্নেল সাহেব। তমাল করজোড়ে বলল, আমাকে এখানে একা ফেলে রেখে চলে যাবেন না। আর একটু বিশ্রাম নিলেই আমি হেঁটে যেতে পারব।

তুমি কি বিনয় শর্মাকে ভয় পাচ্ছ?

আপনি চেনেন ওকে? তমাল অবাক হয়ে বলল, কি করে ওকে চিনলেন?

চিনি। কি সূত্রে চিনি, পরে বলব। আর এও জানি, তোমার নাম তমাল সেন।

কে আপনি?

না—তোমার ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি থাকতে বিনয় শর্মা আর তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আপাতত লেকের উপর চল। রোদে কিছুক্ষণ বসলে তুমি ধকল কাটিয়ে উঠতে পারবে।

তমালকে নিয়ে হোটেলে ফেরার পথে বাইনোকুলারে লক্ষ্য রেখেছিলাম, বিনয় শর্মা আসছে কি না। কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পাই নি। ব্যালকনিতে রাপ্তীকে দেখতে পেয়েছিলাম। সে আমাদের দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়িয়েছিল। একটু পরে যখন আমার কাঁধে ভর করে তমাল হোটেলের পথে চড়াইয়ে উঠছে, তখন রাপ্তী দৌড়ে এসেছিল। তাকে বলেছিলাম, এখন কোন কথা নয়। আপাতত বেচারাকে একটু সাহায্য কর।

দোতলায় ওদের স্যুইটে তমাল বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। তখন দুটো বেজে গেছে। কিন্তু আমার কপালগুণে ডাইনিং হলে ঢুকে খাদ্য পেয়েছিলাম। ম্যানেজার ভদ্রলোক অতিশয় সজ্জন মানুষ। গত রাতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমার সাদা দাড়ি এবং নেমকার্ডের জোরে তাঁর খাতির পেয়েছিলাম। তিনি আমার টেবিলে এসে এবেলা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন

অসুবিধে হচ্ছে কি না। সুযোগ পেয়ে তাঁকে বলেছিলাম, সম্ভব হলে ২২ নম্বর স্যুইটে আমার ভাগনি এবং তার বরের জন্য যেন খাবার পাঠিয়ে দেন। ম্যানেজার সহাস্যে বলেছিলেন, কোন অসুবিধে নেই। আসলে ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ম শিথিল না করে তাঁদের উপায় থাকে না। দৈবাৎ কোন হোমরা-চোমরা অর্থাৎ ভি আই পি দুটোর পর এসে পড়লে তো তাঁদের জন্য যেকোন ভাবে একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। কাজেই আড়াইটে অব্দি তাঁরা কিচেন খোলা রাখেন।

গোগ্রাসে লাঞ্চ সেরে ওপরে গিয়ে ২২ নম্বরে নক করেছিলাম। রাপ্তী দরজা খুলে বলেছিল, খাবার দিয়ে গেল। আপনিই পাঠিয়েছেন বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। তমাল খাচ্ছে। তবে ওর চোয়াল নাড়তে কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে কোন পেইনকিলার আনি নি যে ওকে খাইয়ে দেব।

বলেছিলাম, পেইনকিলার খাওয়া ঠিক নয়। ওকে বিশ্রাম করতে দাও। আর একটা কথা। তোমরা দু'জনেই যেন আমাকে না জানিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ো না। তুমি তিনটের মধ্যে আমার সঙ্গে একবার দেখা করো।

নিজের স্যুইটে ঢুকে পোশাক বদলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। তারপর ব্যালকনিতে গিয়ে বসলাম। জলটুঙ্গির ওপর সূর্য কাত হয়ে ঝুলে পড়ছে। বাইনোকুলারের লেন্সে সোজা রোদ পড়লে আমার চোখের ক্ষতি হবে। তাই সেক্রেটারি বার্ডের আশা আপাতত ছেড়ে দেওয়াই ভাল। বরং কিছুক্ষণ পরে হ্রদের ধারে গিয়ে একবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এদিন আমি ক্লান্তও বটে। একটু বিশ্রাম করা দরকার।

রাপ্তীর প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু তিনটে বেজে গেল। সে এল না। ভাবলাম, তমালের মুখে বিনয় শর্মার হাতে তার দুরবস্থার বিবরণ পেয়ে গেছে বলেই আসছে না।

সেক্রেটারি বার্ড, না তমাল-রাপ্তী, কোন বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দেব, ঠিক করতে পারছিলাম না। তাই একটা কয়েন টস করলাম। সেক্রেটারি বার্ড টসে জিতল।

হ্রদের তীরে এখন দ্রুত ছায়া ঘনিয়ে আসছে। কারণ সূর্য পশ্চিমের পাহাড়ের চূড়া ছুঁয়েছে। সেক্রেটারি বার্ড বাইনোকুলারে ধরা পড়ল না। জলটুঙ্গির জঙ্গল ঘিরে হালকা কুয়াশা জমেছে। রোয়িং বোটগুলি একে একে তীরে ভিড়ছে। আজ ঠাণ্ডাটা কালকের চেয়ে বেশি। অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে উত্তরের পাহাড়তলীতে গেলাম। পর্যটন অফিসে সবে আলো জ্বলে উঠল। কাউন্টারে এক কর্মী বসে চা খেতে খেতে রেকর্ডপ্লেয়ার বাজাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি ইংরেজিতে বলে উঠলেন, অত্যন্ত দুঃখিত

স্যার। আপনাকে কোন কটেজ দিতে পারছি না। বাংলো দুটি তো ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বুক হয়ে আছে। আপনাকে গতকাল তা জানিয়েছি।

বললাম, না। আমি আর কটেজ বা বাংলোর জন্য আসিনি। একজন চেনা লোকের খোঁজে এসেছি। তিনি কটেজে উঠেছেন। কিন্তু কটেজ নম্বর জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। তার নাম বিনয় শর্মা।

কর্মী ভদ্রলোক রেজিস্টার্ড খুলে তন্নতন্ন খুঁজে বললেন, না। বিনয় শর্মাকে পাচ্ছি না। তিনি কবে এসেছেন ?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, তার মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে। সবসময় চোখে সানগ্লাস পরে থাকে। চোখের অসুখ আছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট গড়ন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, ও। আপনি তাহলে ডঃ রঘুবীর প্রসাদের কথা বলছেন ? আপনি যে বর্ণনা দিলেন, তা ডঃ প্রসাদের। উনি একজন বিখ্যাত লোক। প্রায়ই এখানে আসেন।

বিস্ময় চেপে বললাম, দুঃখিত। আসলে বার্ধক্যজনিত স্মৃতিভ্রংশ। বিনয় শর্মার সঙ্গে ডঃ প্রসাদকে গুলিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ। ডঃ রঘুবীর প্রসাদকেই আমি খুঁজছি।

ডঃ প্রসাদ উঠেছেন ১২৭ নম্বর কটেজে। পর্যটন কর্মী কাউণ্টার থেকে বেরিয়ে এসে কটেজে পেঁছনোর পথটাও বলে দিলেন।

সেই সময় অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো বললাম, আসলে উনি চন্দ্র সরোবর এলাকার কোন পাহাড়ে প্রাচীন শিলালিপির খোঁজ পেয়েছেন। আমিও এ বিষয়ে একটু কৌতূহলী।

পর্যটন কর্মী মন্তব্য করলেন, ডঃ প্রসাদ একজন ঐতিহাসিক।

তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে ১২৭ নম্বর কটেজ খুঁজে বের করতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। এখনই কটেজ এলাকায় সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়েছে। কটেজ-গুলি একই গড়নের ছোট্ট বাড়ি এবং রঙিন টালির চাল। সামনে সুদৃশ্য লন এবং ফুলবাগান আছে। গেটের কাছে উঁকি মেরেই পিছিয়ে এলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ঘরের পর্দা তুলে এইমাত্র যে বারান্দায় এল, তাকে বারান্দার আলোয় চিনতে দেরি হয় নি। সে রাপ্তী সেন।

কটেজের নিচু পাঁচিলের আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে রাস্তার মোড়ে একটা উঁচু আইল্যাণ্ডের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কেউ আমাকে দেখল কি না লক্ষ্য করার সুযোগ ছিল না।

একটু পরে দেখলাম, রাপ্তী এবং বিনয় শর্মা চাপা গলায় কথা বলতে বলতে লেকের দিকের উৎরাইয়ে নেমে যাচ্ছে। আর এক মিনিট দেরি করলে

ওরা আমাকে দেখে ফেলত। তার ফলে অন্য কি ঘটত জানি না। কিন্তু ওরা যে খুবই সতর্ক হয়ে যেত তাতে ভুল নেই।

টুপিটা কপালের ওপর নামিয়ে মাফলারে দাড়ি ঢেকে এবং একটু কুঁজো হয়ে ওদের অনুসরণ করলাম। পর্যটন অফিসের কাছে গিয়ে ওরা দাঁড়াল। তারপর রাপ্তী চলে গেল। আমি দ্রুত সামনের একটা কটেজের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডঃ রঘুবীর প্রসাদ ওরফে বিনয় শর্মা কোন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে নিজের কটেজের দিকে ফিরে চলল।

এবার আমি পর্যটন অফিসের কাছে গিয়ে ওদের ক্যান্টিনে ঢুকলাম। এই উত্তেজনার সময় এক পেয়ালা কফির দরকার ছিল। তাছাড়া ঠাণ্ডাটাও ক্রমে বেড়ে যাচ্ছিল।

ক্যান্টিনে লাইন দিয়ে লোকেরা কফির কুপন কিনছে এবং লাইন দিয়ে সেই কুপন দেখিয়ে পেপারকাপে কফি নিচ্ছে। বসার জায়গা খালি নেই। কিন্তু কি আর করা যাবে?

কিছুক্ষণ পরে এক কোণে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছি, সেইসময় এক যুবতীকে কফির লাইনে দেখতে পেলাম। তার পরনে জিনস্ আর ব্যাগি সোয়েটার। মাথায় একটা স্কার্ফ জড়ানো। মুখে উদ্ধত লাবণ্য আছে। যুবক-যুবতীদের প্রতি আমি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করি এবং আমার সমবয়সীদের চেয়ে তাদের সঙ্গেই আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এ নিয়ে আমার চেনা মহলে অনেক রসিকতা চালু আছে। আসলে নিজের যৌবনের স্মৃতিই যে আমার এই স্বভাবের মূল কারণ, সেটা কাকেও বোঝাতে পারি না। যুবক-যুবতীদের যৌবনের উষ্ণতায় নিজের অতীতকে আমি ফিরে পাই যেন। যুবক-যুবতী নির্বিশেষে আমি যে ডার্লিং বলে সম্ভাষণ করি, তার কারণও এই।

যুবতীটির কোন সঙ্গী বা সঙ্গিনী নেই। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সে বাঁকামুখে স্বগতোক্তি করল, ইশ! কি বিচ্ছিরি কফি।

বুঝলাম যে বাঙালি মেয়ে। একটু এগিয়ে তার কাছাকাছি গিয়ে বললাম, এখানকার ঠাণ্ডাটাও বিচ্ছিরি কি না। এরকম বিচ্ছিরি কফি ছাড়া এই বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা জব্দ হবে না।

সে নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু হেসে বললাম, অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই বুড়ো বয়সে আমি যদি মুন লেকে বেড়াতে আসতে পারি, কমবয়সীদের না পারার কারণ দেখি না। তবে মুন লেকে রোয়িং করতে বললে আমি কিন্তু পারব না।

এবার সে আস্তে বলল, আপনি কে জানতে পারি?

অবশ্যই। বলে জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটা নেমকার্ড বের করে তাকে দিলাম।

কার্ডটা পড়ে সে বলল, আপনার নামটা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন পড়েছি। ঠিক মনে করতে পারছি না। আপনি কোথায় উঠেছেন?

হোটেল দ্য লেক ভিউ-তে। তুমি? তুমি বলছি, কিছু মনে করো না। তুমি আমার মেয়ের বয়সী। বলে হেসে উঠলাম। অবশ্য কোন ছেলেমেয়ে নেই। কারণ আমি বিয়ে-টিয়ে করিনি।

সে হাসল না। বলল, বিয়ে-টিয়ে বলছেন কেন? বিয়ে ব্যাপারটা জানি। টিয়ে কি জানি না।

বিয়ে যেমন আছে, তেমনি টিয়েও আছে। যাই হোক, তুমি কোথায় উঠেছ?

ইস্টার্ন লজে।

তোমার বন্ধুরা কোথায়?

আমার কোন বন্ধু নেই।

সে কি! তুমি একলা এসেছ?

এতে অবাক হওয়ার কি আছে?

হু। নেই। তো—

তবে কি?

তোমার বয়সী যারা, তাদের বন্ধু না থাকাটা অস্বাভাবিক।

আমি একটু অস্বাভাবিক।

বাহ। এই ঠাণ্ডায় তোমার কথাবার্তা আরাম দিচ্ছে।

তার মানে? কি বলতে চান আপনি?

বলতে চাই, তোমার কথাবার্তায় যথেষ্ট উত্তাপ আছে।

সে কার্ডটা আবার দেখতে দেখতে কফিতে চুমুক দিল। আমি কফিব কাপ আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে চুরুট বের করলাম। তাবপব যেই চুরুটটা লাইটার জেলে ধরিয়েছি, সে অমনই আস্তে বলে উঠল, আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় আপনার কথা আমি পড়েছি। আপনি কফি এবং চুরুটের ভক্ত, তাও জানি। আপনি সেই বিখ্যাত-

তাকে থামিয়ে দিলাম। মিটিমিটি হেসে বললাল, চেপে যাও। কথায় বলে দেওয়ালের কান আছে।

এতক্ষণে সে একটু হাসল। নিষ্প্রাণ হাসি। তারপর বলল, আপনার সঙ্গী ভদ্রলোক কোথায়?

তুমি নিশ্চয় সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীব কথা বলছ। তাকে সঙ্গে আনিনি। কারণ আমি এখানে এসেছি একটি দুর্লভ প্রজাতির পাখির খোঁজে।

তাকে সঙ্গে আনলে ভাল করতেন। রহস্যটা জমে উঠেছে।

রহস্য? বলো কি? কিসের রহস্য?

সে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, চলুন। আমাকে ইস্টার্ন লজে পৌঁছে দেবেন? আমি কল্পনাও করিনি এ সময়ে আপনাকে এখানে পেয়ে যাব। আমার সাহস বেড়ে গেল।

রাস্তায় নেমে গিয়ে বললাম, তোমার নামটা এখনও বলছ না।

রাপ্তী সেন।

থমকে দাঁড়ালাম। কি বললে?

রাপ্তী সেন।

এটা কোন ফাঁদ কি না কে জানে। একটু সতর্ক হয়ে বললাম, দেখ রাপ্তী, এখানে কোন রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি আসিনি। এই লেকের জল-টুঙ্গিতে একটা সেক্রেটারি বার্ডের খোঁজ পেয়েছি। তাই—

বিশ্বাস করছি না কর্নেল সরকার।

তোমার ইচ্ছা।

সে আমার পাশ ঘেঁষে কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল। তারপর বলল, আপনি যে হোটেলে উঠেছেন, সেখানে প্রবীর সেন নামে একজন আছে। তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

প্রবীর সেনের কথা জানি না। তবে তমাল সেন নামে একজন আছে।

হ্যাঁ। ওর ডাকনাম তমাল। ও আমার হাজব্যাণ্ড।

বলো কি! তা তুমি একখানে, তোমার হাজব্যাণ্ড অন্যখানে—ব্যাপারটা কি?

সেটাই তো রহস্য। আমার হাজব্যাণ্ডের সঙ্গে একটি মেয়ে আছে দেখেছেন নিশ্চয়?

দেখেছি।

ওর নাম পারমিতা রায়। পারমিতা আমার হাজব্যাণ্ডকে ট্র্যাপ করে এনেছে। রীতিমতো ব্ল্যাকমেল।

বুঝলাম না।

শি ইজ ডেঞ্জারস। তমাল বোকার মতো ওর ফাঁদে পড়েছে। ও তমালকে ওর হাজব্যাণ্ড সাজতে বাধ্য করেছে। এমন কি আমার নামটাও আত্মসাৎ করেছে পারমিতা। ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ট কর্নেল সরকার?

লেকের ধারে ল্যাম্পপোস্ট থেকে কুয়াশা মাখানো যেটুকু আলো ছড়াচ্ছিল, সেই বিবর্ণ আলোয় তার চোখে জল দেখতে পেলাম। মাথায় জড়ানো স্কার্ফের কোনা দিয়ে চোখে জল মুছে সে শ্বাস ছাড়ল। বললাম, আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না। তমাল তোমার স্বামী। তাকে একটি মেয়ে ব্ল্যাকমেল করছে এবং ফাঁদে ফেলেছে বলছ। কিন্তু তা হলে তুমি কেন পুলিশের কাছে যাও নি?

পুলিশের কাছে যাওয়ার প্রব্লেম আছে।

কি প্রব্লেম ?

তমাল মিউজিয়াম থেকে পারমিতার সাহায্যে একটা সিল চুরি করেছিল। পারমিতা মিউজিয়ামে চাকরি করত। সিল চুরির পর ওর চাকরি যায়। সেই সিলে নাকি এই লেকের ধারে কোন পাহাড়ের গুহায় প্রাচীন বুদ্ধমূর্তির উল্লেখ আছে। বাকিটা শুনতে হলে আপনাকে একটু সময় দিতে হবে। ইস্টার্ন লজে নয়। অন্য কোথাও। আপনিই বলুন কোথায় এবং কাল কখন আপনার সঙ্গে দেখা করব ?

একটু ভেবে নিলাম। এটা ডঃ প্রসাদ ওরফে বিনয় শর্মার কোন ফাঁদ কি না বুঝতে পারছি না। তাই বললাম, ঠিক আছে। কাল সকাল আটটায় তুমি বরং টাউনশিপ এরিয়ায় মহামায়া পার্কে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। তুমি টাউনশিপ যেতে সাইকেল রিক্সা পেয়ে যাবে। মহামায়া পার্ক সবাই চেনে।

লেক ভিউয়ে ফিরে ম্যানেজারকে বলেছিলাম, এবার থেকে আমার স্যুইটে যেন খাদ্য বা পানীয় সার্ভ করা হয়। আমি বারবার কফি খাই। বারবার সেজন্য ডাইনিং হলে নেমে আসতে হয়। এটা আমার বয়সী মানুষের পক্ষে অসুবিধাজনক।

ম্যানেজার সতীশ কুমার বলেছিলেন, সে ব্যবস্থা তো আছেই। আপনি লক্ষ্য করবেন, স্যুইটের ভেতরে দরজার পাশে একটা সাদা বটম্ আছে। ওটা টিপলেই লোক যাবে। দুঃখের বিষয়, আমরাও এখনও কোন স্যুইটে টেলি-ফোনের ব্যবস্থা করতে পারিনি। তবে শিগগির সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা ছ'টা বাজে। হোটেলবয় ট্রেতে কফি পৌঁছে দিয়ে গেল। আমার মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। ঘরের ঠাণ্ডা দূর করার জন্য একটা হিটার আছে। সুইচ অন করে সেটা পায়ের কাছাকাছি রেখে আরাম করে বসলাম। তারপর পট থেকে কফি ঢেলে লিকারে চুমুক দিলাম। দুধ-চিনি ছাড়ার কফি আমি কদাচিৎ খাই। এখন এর দরকার ছিল।

তমাল-রাপ্তী-পারমিতা-ডঃ প্রসাদ ওরফে বিনয় শর্মা, মিউজিয়ামের সিল-প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি এইসব ব্যাপার মাথার ভেতর মাছির মতো ক্রমাগত ভন ভন করছিল। কার কথা বিশ্বাস করব বুঝতে পারছিলাম না। তমাল, রাপ্তী এবং পারমিতা প্রত্যেকেই বলেছে, পরে বলব। পরে কেন ? ডঃ প্রসাদ ওরফে বিনয় শর্মার হাতে তমাল মার খেয়েছে এবং তাকে পাইনবনে দড়ি দিয়ে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা অবস্থায় দেখেছি, এই ঘটনাটি অবশ্য সত্য। কিন্তু তমালও বলেছে, সব কথা পরে জানাবে। এখন কথা হচ্ছে, ইস্টার্ন লজের মেয়েটি যদি সত্যিকার

রাপ্তী এবং তমালের সত্যিকার স্ত্রী হয়, তাহলে তমালের দুর্দশার একটা যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। চোরাই সিলটি তমাল ডঃ প্রসাদকে দিচ্ছে না বলেই সম্ভবত তার ওই দুর্দশা ঘটেছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। ২২ নম্বর স্যুইটের দরজায় গিয়ে নক করলাম। রাপ্তী দরজা খুলে আমাকে দেখে করুণ মুখে বলল, বিকেলে একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁকে বললাম, আমার স্বামী পাহাড় থেকে পড়ে প্রচণ্ড আছাড় খেয়েছে। কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই এলেনা না। বললেন, ট্যুরিস্ট সেণ্টারের হসপিটালে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে পাত্ত পেলাম না। এখানকার লোকগুলো অদ্ভুত। তখন আবার সেই ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি ওষুধ দিলেন। মনে হচ্ছে সেডেটিভ দিয়েছিলেন। তমাল ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুতেই ওকে জাগাতে পারছি না।

বললাম, আমি ওকে একটু দেখতে চাই। আপত্তি আছে?

রাপ্তী ব্যস্তভাবে বলল, কেন আপত্তি থাকবে? আপনি আমার আঙ্কেল হয়েছেন। আসুন, ওকে দেখুন।

ঘরে ঢুকে তমালকে জাগানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। বুঝলাম, সত্যিই ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। ঘরে টেবিল ল্যাম্পের আলো ছিল। আলোটা নিষ্প্রভ হলেও দ্রুত চোখ বুলিয়ে মনে হলো ঘরের ভেতরটা অগোছাল অবস্থায় আছে। একটা বড় স্যুটকেসের ডালার ফাঁকে কাপড়-চোপড়ের একটা অংশ বেরিয়ে আছে। এর একটাই অর্থ হয় রাপ্তী ঘরের সবখানে কিছু খুঁজছিল, অথবা জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল, এবং আমি এসে পড়ায় তাতে ব্যাঘাত ঘটেছে।

বললাম, তুমি বলছিলে সব কথা পরে বলবে। এখন বলতে কি অসুবিধা আছে?

রাপ্তী ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু চুপ করে থাকল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, তমাল এখানে হনিমুনের ছলে এসেছে। বিনয় শর্মার সঙ্গে স্মাগলিং কারবার করে সে। আমি তা জানতে পেরে তাকে থ্রেট করেছিলাম। বলেছিলাম, আমি জানি তুমি কেন এসেছ। আমি আর এখানে থাকতে চাই না। এই নিয়ে কাল রাতে ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। তাই সে আমাকে সকালে পাহাড়ের ওপর ফটো তোলার ছলে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। বুঝুন আঙ্কেল। আমি খাদে পড়ে গিয়ে মরে যেতাম। আর তমাল এটা অ্যাকসিডেণ্ট বলে চালিয়ে দিত।

ঠিক বলেছ। কিন্তু কিসের স্মাগলিং?

নার্কোটিক্সের।

তুমি কি করে জানতে পারলে?

তমালের কাছে একটা প্যাকেট ছিল। সেই প্যাকেটটা সকালে আর দেখতে পাইনি। আমার সন্দেহ, দরে পোষাচ্ছে না বলেই তমাল ওটা বিনয় শর্মাকে

দেয় নি। তাই বিনয় শর্মা ওকে পাইনবনে মারধর করে দড়িতে বেঁধে ফেলে রেখেছিল। ভাগ্যিস আপনি সেখানে গিয়ে ওকে উদ্ধার করেছিলেন।

হুঁ। নার্কোটিক্স তমাল কলকাতায় বসেই বিনয় শর্মাকে বেচতে পারত বা তা নিয়ে নিরাপদে দরাদরি করতে পারত। সে এখানে তা বেচতে এল কেন?

রাপ্তী খুব চাপা স্বরে বলল, পরশু বিকেলে এখানে আসার পর তমাল কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর ও সেই প্যাকেটটা নিয়ে ফিরে এল। জিজ্ঞেস করলে শুধু বলল, এতে কিছু লাইফসেভিং ড্রাগ আছে। এখানে আমার চেনা এক ভদ্রলোক এই প্যাকেটটা কলকাতায় তাঁর অসুস্থ আত্মীয়ের কাছে পেঁছে দিতে অনুরোধ করেছেন।

সকালে যখন প্যাকেটটা দেখতে পেলে না, তখন ওকে কিছু জিজ্ঞেস করোনি?

জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। দুপুরে যখন ওকে আহত অবস্থায় আপনি নিয়ে এলেন, তখন ওটার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু ওই অবস্থায় ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখানে তমালের চেনা কোন স্মাগলার আছে। তমাল তার কাছেই নার্কোটিক্স কিনেছে। তারপর বিনয় শর্মাকে ওটা বিক্রির প্রোপোজ্যাল দিয়েছে।

তোমার সন্দেহ যুক্তিসঙ্গত। বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

রাপ্তী দরজার কাছে এসে বলল, দরে পোষাচ্ছে না বলে তমাল প্যাকেটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে আঙ্কেল।

ঠিক বলেছ। তুমি কি তমালকে নিয়ে কলকাতা ফিরে যেতে চাও?

ওর শরীরের যা অবস্থা, কি করে এখন নিয়ে যাবো? তাছাড়া আমাদের ট্রেনের রিজার্ভেশন আর রিটার্ন টিকিটের তারিখ ১৪ নভেম্বর। আজ ১১ নভেম্বর।

সাবধানে থেকো। বলে বেরিয়ে এলাম।

নিজের স্যুইটে ফিরে রাপ্তীর বক্তব্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করে বুঝলাম আপাতদৃষ্টে একটা যুক্তিসঙ্গত বিবরণ সে দিয়েছে। ওদিকে ইস্টার্ন লজের রাপ্তীর বিবরণও যুক্তিসঙ্গত। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, ইস্টার্ন লজের রাপ্তী আমার পরিচয় জানে। এবার আমার প্রথম কাজ হল, কে প্রকৃত রাপ্তী সেটা খুঁজে বার করা। দ্বিতীয় কাজ হল, তমালের সঙ্গে প্রকৃত রাপ্তীর দাম্পত্য সম্পর্কের সত্যতা যাচাই। তারপরের কাজটি হল, এটা নার্কোটিক্স সংক্রান্ত ঘটনা, নাকি মিউজিয়ামের চোরাই সিল সংক্রান্ত ঘটনা, সেটা নিশ্চিত ভাবে জেনে নেওয়া।

পর্যটন কেন্দ্রের কর্মীটি বিনয় শর্মাকে জনৈক বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলে জানেন। তাঁর এই জানাতে ভুল থাকতেই পারে।

তবে এমন অদ্ভুত রহস্যে এর আগে কখনও জড়িয়ে পড়িনি। এ একটা আসল-নকল নিয়ে জমজমাট খেলা। তমালের ঘরের রাপ্তীকে জিজ্ঞেস

করতে পারতাম, সে কোথায় কি চাকরি করত। একটা জবাব নিশ্চয় পেতাম। কিন্তু মিউজিয়ামে চাকরি করত কিনা জিজ্ঞেস করলে (যদি ইস্টার্ন লজের রাঁধুনীর কথা সত্য হয়) সে সতর্ক হয়ে যেত। কাজেই ধীরেসুস্থে এগোনোই ভাল। তবে এখনই গিয়ে ম্যানেজারকে গোপনে জানাতে হবে, ২২ নম্বর স্যুইটের তমাল সেনকে কেউ চিকিৎসার ছলে স্ট্রেচারে চাপিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি যেন বাধা দেন এবং পুলিশকে জানান।

পরদিন ভোরে অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। এদিনও ঘন কুয়াশা ছিল। কিন্তু সতর্কতার দরুন হ্রদের তীরে না গিয়ে উল্টো দিকে লেকভিউ হোটেলের পূর্বের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ঢালু একটা উপত্যকায় নেমে গেলাম। উপত্যকাটি ছোট-বড় নানা গড়নের পাথর আর ঝোপঝাড়ে দুর্গম হয়ে আছে। দুর্গম স্থানের প্রতি আমার আকর্ষণ প্রবল। কুয়াশা এত ঘন যে দু-তিন মিটারের দূরে কি আছে, তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। একসময় হঠাৎ মনে হল, এভাবে কুয়াশার মধ্যে বেরিয়ে পড়া উচিত হয় নি আমার। তমালকে যে আমিই উদ্ধার করেছি বিনয় শর্মা তা জানতে পেরেছে। সে যদি আমাকে এখন অনুসরণ করে থাকে, যেকোন মুহূর্তে আমি আক্রান্ত হব।

ডাইনে-বাঁয়ে এদিকে-ওদিকে আমার এভাবে হেঁটে যাওয়া কেউ দেখলে অবশ্যই পাগল ভাবত। কিন্তু একটু পরেই যা ঘটে গেল, তাতে বুঝলাম যে, আমার সেই ইনট্যুইশনই আমাকে বাঁচতে সাহায্য করেছে।

সামরিক জীবনের আরেকটা শিক্ষাও চমৎকার কাজে লেগে গেল। জঙ্গলে গেরিলাযুদ্ধের তালিম নেওয়ার সময় এটা আয়ত্ত করেছিলাম। কোথাও একটু শব্দ হলেই সেই শব্দটা কিসের এবং আমার কাছ থেকে তার দূরত্ব কত, শব্দটার উৎসস্থল এইসব কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি জেনে ফেলি।

একটা বড় পাথরের পাশে ঘন ঝোপের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় পিছনে আবছা একটা শব্দ কানে এসেছিল। পাথরগুলির ফাঁকে শীতে ঝরে পড়া গুল্মলতার পাতার স্তূপ রাতের শিশিরে ভিজে গেছে। শুকনো পাতার ওপর কোন মানুষ বা জন্তু যত সাবধানেই পা ফেলুক, পাতার শব্দ হবেই। কিন্তু ভিজে পাতার ওপর চুপিচুপি পা ফেলার শব্দ অন্যরকম। যে শব্দটা শুনেছিলাম, তা হঠাৎ থেমে যেতেই প্রথমে মনে হয়েছিল কোন চতুষ্পদ প্রাণীর —তা বাঘ-ভালুকেরও হতে পারে। মুন লেক অঞ্চলে এখনও বাঘ-ভালুক থাকা সম্ভব।

কিন্তু শব্দটা আবার শুনতে পেলাম এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, ওটা কোন দ্বিপদ প্রাণীরই পায়ের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে রিভলভার বের করে তৈরী হলাম। আগেই বলেছি, কুয়াশা এত ঘন যে দু-তিন মিটার দূরেও কিছু স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। শব্দটার উৎস

আমার হিসাবে আন্দাজ তিরিশ ফুট দূরে এবং আমার ডানদিকে। আমার পিছনে ঘন ঝোপ। তখনই গুঁড়ি মেরে বসে ডানদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে লক্ষ্য রাখলাম। শব্দটা থেমে গিয়েছিল। তারপর আমার দু'পাশে একটা করে ঢিল পড়তে থাকল।

মানুষই ঢিল ছোঁড়ে। যে ঢিল ছুঁড়ছিল, এটা তার শিকারি স্বভাবের পরিচয়। কারণ আমি দেখেছি, ধূর্ত শিকারিরা এভাবে ঝোপঝাড়ে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে লুকিয়ে থাকা প্রাণীকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে। রাগ হল। আবার হাসিও পেল। ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে কি ভেবেছে?

আর চুপ করে থাকার কোন মানে হয় না। যেদিক থেকে ঢিল আসছিল, সেইদিকে রিভলভারের নল ঈষৎ উঁচু করে একটা গুলি ছুঁড়তেই হল। নরহত্যার দায় এ বয়সে আর বইতে চাই না। এটা তো যুদ্ধক্ষেত্র নয়।

স্তব্ধ ঠাণ্ডাহিম কুয়াশা ঢাকা উপত্যকায় গুলির শব্দটা যথেষ্ট জোরালো ছিল। তারপরই আবার পায়ের শব্দ ক্রমাগত। এবার শব্দটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম, লোকটা পালিয়ে যাচ্ছে। সে এত সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সম্ভবত কল্পনাও করে নি। এও বোঝা যায়, তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। থাকলে তখনই সে পাল্টা গুলি ছুঁড়ত।

জোরে শ্বাস ফেলে পা ছড়িয়ে বসে চুরুট ধরালাম। তখন প্রায় সওয়া সাতটা বাজে। আটটায় আমাকে মুন লেকের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত টাউনশিপে মহামায়া পার্কে পৌঁছতেই হবে। কয়েক মিনিট চুরুট টানার পর উত্তেজনাটা চলে গেল। তখন উঠে পড়লাম।

কুয়াশার মধ্যে শর্টকাট চলা কঠিন। তবু আমার লক্ষ্য ছিল মুন লেকে যাওয়ার বড় রাস্তায় পৌঁছনো। ল্যাম্প পোস্টের বাতিগুলি জ্বলজ্বল করছিল। পনের মিনিটের মধ্যে রাস্তাটা পেয়ে গেলাম। পর্যটনের মরশুমে এই রাস্তায় যানবাহনের অভাব নেই। কুয়াশার জন্য স্কুটার, অটোরিক্সা, ট্যাক্সি আলো জ্বেলে চলাচল করছে। তবে এখন সংখ্যায় কম। একটা অটোরিক্সা আমাকে দেখেই থেমে গিয়েছিল। তাতে দু'জন যাত্রী ছিলেন। ঠাসাঠাসি করে তাঁদের সঙ্গে যেতে হল।

মহামায়া পার্কে আটটার আগেই পৌঁছে গেলাম। এখনও পার্ক নিঝুম হয়ে আছে। কুয়াশায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকা এক লাবণ্যময়ী যুবতীর উপমা মাথায় আসছিল। লেকের দিক থেকে যে গেট দিয়ে পার্কে ঢুকতে হয়, সে গেটের পাশে ইস্টার্ন লজের রাপ্তী অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে সে বলে উঠল, কি বিচ্ছিরি ফগ।

হাসতে হাসতে বললাম, বিচ্ছিরি ফগের জন্য তুমি কিন্তু একটা বিচ্ছিরি পোশাক পরেছ।

বিচ্ছিরি পোশাক কেন বলছেন? এই টুপি আর জ্যাকেট মাউন্টেনিয়াররা পরে।

তা পরে। তবে তুমি কেন পরেছ তা বুঝতে পারছি।

কেন?

তোমাকে বিচ্ছিরি মোটা দেখাবে এবং সহজে চেনা যাবে না।

আপনি তো চিনতে পারলেন।

তোমার চোখ দুটি দেখে।

আমার চোখে কি আছে?

হোটেল দ্য লেক ভিউয়ের রাপ্তীর চোখে যা নেই।

সে থমকে দাঁড়াল। পারমিতার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে?

হয়েছে।

তাকে আপনি চার্জ করেন নি যে, সে রাপ্তী নয়, পারমিতা এবং আপনি তা জানেন?

তাকে চার্জ করার আগে আমার সব কথা জানার দরকার আছে। যাই হোক, পার্কের পরিবেশ এখন শোচনীয়। তাছাড়া আমার এখনই এক পেয়ালা কড়া কফি চাই। চলো। পার্কের উত্তরে একটা রেস্তোরাঁ আছে দেখেছি। একটু কস্টলি। কিন্তু কি করা যাবে?

বিত্তবানদের রেস্তোরাঁ 'ব্লু মুনে' এখনও তত ভিড় নেই। যারা ইতিমধ্যে লেকের ধারে জগিং করে এসেছে, তারা দাঁড়িয়ে কফি বা চা খাচ্ছে। কোনের দিকে গিয়ে মুখোমুখি বসলাম। কফি আর এক প্লেট গরম পকৌড়ার অর্ডার দিলাম।

ইস্টার্ন লজের রাপ্তী জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা খাম বের করে বলল, আপনাকে দেখানোর জন্য এনেছি। এর মধ্যে তমাল এবং আমার বিয়ের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আমার অফিসের আইডেণ্টি কার্ড আছে।

খাম খুলে সেগুলি দেখে নিলাম। তারপর বললাম, হ্যাঁ। তুমিই আসল রাপ্তী।

তার মানে, কাল সন্ধ্যায় আপনি কি আমাকে—

সে রুষ্টমুখে কথা থামিয়ে দিল। একটু হেসে বললাম, তুমি বুদ্ধিমতী। এই কেসটা একটু জটিল। কারণ আসল এবং নকল মিলেমিশে আছে। যেমন ধরো, এর সঙ্গে বিনয় শর্মা নামে একজন জড়িত। কিন্তু সে নাকি আসলে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রঘুবীর প্রসাদ।

রাপ্তী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল, ডঃ প্রসাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তমাল ইউনিভার্সিটিতে ওঁর ছাত্র ছিল। সেই সূত্রে আলাপ। খুব অমায়িক ভদ্র মানুষ। রাপ্তী জোর দেবার জন্য ফের বলল, হি ইজ এ পারফেক্ট জেন্টলম্যান।

তাঁর বয়স অনুমান করতে পেরেছিলে ?

এখন ষাটের বেশি তো বটেই। তবে ওঁকে ভীষণ রোগা দেখায়। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

তাহলে আমার দেখা লোকটি নকল ডঃ প্রসাদ। তমাল কি করে বল ?

এইসময় কফি পকোড়া এসে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে রাপ্তীর দিকে তাকালাম। সে একটা পকোড়া আলতো ভাবে তুলে নিয়ে কামড় দিল। তারপর বলল, তমালের একটা কিউরিও শপ আছে। অ্যান্টিক জিনিসপত্র বেচা-কেনা করে। পারমিতা কলেজে আমার সঙ্গে পড়াশুনা করত। পরে মিউজিয়ামে চাকরি পেয়েছিল। সত্যি বলতে কি, পারমিতার সূত্রেই তমালের সঙ্গে আমার আলাপ এবং তারপর বিয়ে। বাট শি ইজ সো জেলাস্—

সে আত্মসম্বরণ করল। বললাম, তুমি তোমার স্বামীকে তাহলে ফলো করে এখানে এসেছ ?

হ্যাঁ। তমাল বলেছিল সেই চোরাই সিলের সাহায্যে বুদ্ধমূর্তি উদ্ধারে যাচ্ছে। আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। কারণ এখানে আসার ক'দিন আগে সে টেলিফোনে পারমিতার সঙ্গে কথা বলছিল।

এই সময় বিনয় শর্মা এসে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। তারপর আমাকে দেখেও না দেখার ভান করে অন্যদিকের একটা টেবিলে বসল। ইশারায় রাপ্তীকে চুপ করতে বলে লোকটার দিকে লক্ষ্য রাখলাম।

বিনয় শর্মা কিন্তু এক মিনিট বসেই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর বেরিয়ে গেল। রাপ্তীকে বসতে বলে আমি উঠে দরজায় গেলাম। কুয়াশা একটু কমে গেছে। দেখলাম, বিনয় শর্মা পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে জোরে হেঁটে চলেছে। বাঁকের মুখে তার ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল। তার এই নাটকীয় প্রবেশ ও প্রস্থানের কারণ কি বুঝতে পারলাম না।

রাপ্তীর কাছে ফিরে এলাম। রাপ্তীর চোখে প্রশ্ন ছিল। আস্তে বললাম, ওই লোকটাই সেই নকল ডঃ প্রসাদ। আমাকে বিনয় শর্মা বলে পরিচয় দিয়েছিল। পারমিতা আমাকে বলেছে, বিনয় শর্মা নামে একটা লোকের সঙ্গে ট্রেনে তাদের আলাপ হয়েছিল। সে নাকি বিজনেসম্যান।

রাপ্তী একটু পরে বলল, লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি। ঠিক মনে পড়ছে না।

মনে পড়তে পারে। চেষ্টা করো। তুমি তো আমাকেও—

রাপ্তী আমার কথার ওপর বলল, দেখেছি তা ঠিক। কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে নেই।

বললাম, কফিটা তাড়াতাড়ি শেষ করা যাক। এখনই আমাকে হোটেলে ফিরতে হবে।

আপনি আমার সব কথা শুনলেন না।

আর কি কথা আছে ?

রাপ্তী আস্তে বলল, আমি এখানে তমালকে ফলো করে এসেছি, গত পরশু বিকেলেই তমাল তা টের পেয়েছিল।

কি ভাবে ?

লেকের ধারে আমাকে দূর থেকে দেখেছিল। তখন পারমিতা ওর সঙ্গে ছিল। তাই শুধু একবার হাত নেড়েছিল। তমাল জানে, আই অ্যাম নট সো জেলাস।

তুমি গিয়ে ওকে এবং পারমিতাকে চার্জ করো নি কেন ?

শি ইজ ডেঞ্জারাস। ওর কাছে একটা ফায়ার আর্মস আছে। আমাকে দেখিয়েছিল।

হুঁ। আর কিছু ?

চলুন। যেতে যেতে বলছি।

দু'পেয়ালা কফি এবং এক প্লেট পকোড়ার জন্য পঁচিশ টাকা বিল মেটাতে হ'ল। কিন্তু এই বাজে খরচের ফলে একটা লাভ হ'ল। বিনয় শর্মার নাটকীয় প্রবেশ এবং প্রস্থান দেখলাম। এতক্ষণে মনে হ'ল, সম্ভবত ব্রু মুনে কারো সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। আমি থাকার দরুন ওর অসুবিধা হবে ভেবেই হয় তো চলে গেল।

পর্যটন কেন্দ্রের সেই অত্যুৎসাহী কর্মী কি তাঁর পরিচিত ডঃ রঘুবীর প্রসাদকে বলেছেন যে, জনৈক সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ তার কটেজের খোঁজে এসেছিলেন এবং সেইজন্যই কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য সে ব্রু মুনকে রেঁদেভ্যু করেছিল ?

এটাই যুক্তিসঙ্গত পয়েন্ট। পার্কের ভেতর দিয়ে গেলে লেক রোডে পেঁছনো যাবে। পার্কে ঢুকে বললাম, কি বলবে এবার স্বচ্ছন্দে বলতে পারো রাপ্তী।

রাপ্তী বলল, আমি ওদের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। ওরা কিছুক্ষণ পরে লেক ভিউ হোটেলে ঢুকল। আমি তখন পূর্বদিকের রাস্তা দিয়ে ঘুরে ওই হোটেলে গেলাম। কাউণ্টারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তমাল সেন এবং রাপ্তী সেন দোতলার ২২ নং স্যুইটে উঠেছে।

রাপ্তীর কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনাচ্ছিল। সে জোরে শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, একজন হোটেলবয়কে ডেকে তাকে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, এই কাগজটা ২২ নং স্যুইটের তমাল সেনের হাতে গোপনে পেঁছে দিতে হবে। যেন তার

স্ত্রী দেখতে না পায়। হোটেলবয়কে একটা স্লিপে লিখে দিলাম, 'ইস্টার্ন লজ'।

বাহ। তারপর?

ইস্টার্ন লজ একটা সাধারণ হোটেল। আর কোথাও জায়গা না পেয়ে বাধ্য হয়ে ওখানেই উঠেছিলাম। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে সঙ্গে জিনস্, ব্যাগি শার্ট, সোয়েটার এসব এনেছিলাম। এদেশে মেমসাহেব সেজে ইংরেজি বললে, স্মার্ট দেখায়। লোকে একটু ভয়-টয় পায়—ইউ নো দ্যাট ওয়েল।

ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট।

রাপ্তী দম নিয়ে বলল, আমি ওর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম ও আসবেই। কারণ একটা কৈফিয়তের দায় ওর থেকে যাচ্ছে। হি লাভস মি কর্নেল সরকার।

হুঁ। তারপর কি হল বল?

একতলায় একটা সিঙ্গল রুমে আমি আছি। একটা জানালা বাইরের রাস্তার দিকে আছে। সেটা খুলে সেখানেই বসেছিলাম। কি বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ দেখি, তমাল আসছে। হাত নেড়ে ওকে ডাকলাম। লজের গেট তখন বন্ধ। আমার রুমের জানালার দিকে গাছের ছায়া ছিল। সে চুপি চুপি এসে বলল, বুদ্ধমূর্তি উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য পারমিতাকে সঙ্গে এনেছে। কিন্তু পারমিতা এখানে এসেই একটা লোকের সাহায্যে তাকে ব্ল্যাকমেল করছে। স্বামী-স্ত্রী সেজে একই ঘরে থাকতে বাধ্য করছে। ওর মূল উদ্দেশ্য তাকে সবসময় চোখের সামনে রাখা, যাতে সে গোপনে মূর্তি হাতিয়ে কেটে পড়তে না পারে। তার চেয়ে সাংঘাতিক কথা, পারমিতা নাকি তার সেই চেনা লোকটাকেই মূর্তিটা দশ লাখ টাকায় বেচতে চায়। আধাআধি শেয়ার। যাই হোক, আমি বললাম, এসব কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তখন তমাল পকেট থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বের করে আমাকে দিল। বলল, এর মধ্যে সেই চোরাই সিলটা আছে। খুলে আমি দেখতে পারি।

সিলটা তুমি দেখেছিলে আগে?

হ্যাঁ। আমাকেই তমাল ওটা একসময় লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিল।

একই সিল?

একই সিল। তমাল বলল, সে খুব বিপদে পড়ে গেছে। পারমিতা ওকে, পুলিশের ভয় দেখাচ্ছে। তাই সিলটা আমার কাছে থাকলে তমাল নিরাপদ।

তাহলে সিলটা তোমার কাছে আছে?

হ্যাঁ। বলে রাপ্তী জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বের করে আমার হাতে গুঁজে দিল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ফের বলল, শি ইজ ডেঞ্জারাস।

এটা আপনার কাছে রাখুন। আমিও নিরাপদে থাকতে চাই।

প্যাকেটটা জ্যাকেটের ভেতর চালান করে দিয়ে বললাম, বিনয় শর্মা আমার সঙ্গে তোমাকে দেখে গেল। কাজেই তোমার নিরাপত্তার প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

কুয়াশা আরও কমে গিয়ে এখন নরম রোদ ফুটেছে। কথাটা বলে বাইনোকুলারে চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম। মনে পড়ল, নকল রাপ্তী রাত-দুপুরে তমালের চুপিচুপি বাইরে যাওয়ার কথা আমাকে বলেছিল।

রাপ্তী বলল, তা হলে আমার কি করা উচিত বলুন?

ওর প্রশ্নের জবাব দিতে যাচ্ছি, (তখনও বাইনোকুলারে আমি খুঁটিয়ে লেকের পূর্ব তীর দেখছি) এমন সময় নকল রাপ্তী অর্থাৎ পারমিতাকে দেখতে পেলাম। সে হনহন করে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছে।

রাপ্তী বলল, কি? কোন কথা বলছেন না যে?

বললাম, সঙ্গে এস। এখন কোন কথা নয়।

একটু পরে দেখি, পাইনবনের নীচে একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিনয় শর্মা এবং একটা ষণ্ডামার্কা লোক। রাপ্তী তাদের কাছে পৌঁছলে তিনজন মিলে ওপরে উঠতে থাকল। তারপর আর তাদের দেখতে পেলাম না। ওই ষণ্ডামার্কা লোকটাই কি তাহলে পূর্বের উপত্যকায় আমার পিছু নিয়েছিল?

অজানা আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠলাম। হোটেলের ম্যানেজার সতীশ কুমারকে সতর্ক করে দিয়েছি, কেউ যেন অসুস্থ তমাল সেনকে স্ট্রেচারে শুইয়ে বা অন্য কোনভাবে চিকিৎসার ছলে বাইরে নিয়ে যেতে না পারে। জোর দেখালে তিনি যেন তখনই পুলিশে খবর দেন এবং আমার নেমকার্ড দেখিয়ে আমার নির্দেশের কথা জানান। আমার বিশ্বাস পুলিশ কর্নেল শব্দটি দেখলে একটু সমীহ করবে।

রাপ্তীকে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে আমার হোটেলে এস।

রাপ্তী চমকে উঠল। সে কি! ওখানে গেলেই তো পারমিতার চোখে পড়ে যাব।

তুমি তার চোখে না পড়লেও সে তোমার কথা সম্ভবত এতক্ষণে জেনে গেছে। তবে এখন সে হোটেলে নেই। ওই দেখছ পাহাড়ের ওপর পাইনবন। রাপ্তী ওখানে আছে।

আপনি কি বাইনোকুলারে তাকে দেখতে পেলেন?

হ্যাঁ। আমার সঙ্গে এস।

লেক ভিউয়ে ফিরেই প্রথমে গেলাম ম্যানেজার সতীশ কুমারের কাছে। আমাকে দেখামাত্র তিনি উত্তেজিত ভাবে বললেন, ২২ নম্বর স্যুইটের দিকে আমাদের একজন গার্ডকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলাম। মিসেস সেন বেরিয়ে যান সকাল সাতটা নাগাদ। আধঘণ্টা পরে তিনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে

আসেন। আমাকে তিনি অনুরোধ করেন, আমি যেন দু'জন লোক দিয়ে ওঁর অসুস্থ স্বামীকে দোতলা থেকে নামিয়ে এনে ট্যাক্সিতে তুলে দিতে সাহায্য করি। স্বামীকে উনি হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। আমি তখনই ভদ্রমহিলাকে জানিয়ে দিলাম, আমাদের হোটেলে কিছু বিধানষেধ আছে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরাই ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করি। আমাদের নিজস্ব ডাক্তার আছেন। তিনি সার্টিফাই করলে তবেই আপনার স্বামীকে আপনি বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

সতীশ কুমার একটু হাসলেন। মিসেস সেনের সঙ্গে তর্কাতর্কি হল। উনি থেট করলেন। তখন আমি পাল্টা থেট করে ওঁকে বললাম, ঠিক আছে। আমি আমাদের ডাক্তারকে ফোন করছি এবং সেই সঙ্গে থানায় জানাচ্ছি। আমাদের ডাক্তার এবং পুলিশ এলে তবেই আপনি মিঃ সেনকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন। আমাদের হোটেলে যাঁরা ওঠেন, তাঁদের নিরা-পত্তার স্বার্থেই এই বিধিনিষেধ চালু আছে। কারণ এর আগে একবার আমরা এ ধরণের একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। যাই হোক, মিসেস সেন রাগ করে আমাকে শাসিয়ে সেই ট্যাক্সিতে চলে গেলেন। তারপর আমি ২২ নং স্যুইটের ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে ওপরে গেলাম। স্যুইটে ঢুকে দেখলাম, মিঃ সেন বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ওঁকে বিরত করলাম না।

সতীশ কুমারকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, সত্যিই কি আপনাদের নিজস্ব ডাক্তার আছেন?

অবশ্যই আছেন কর্নেল সরকার। আপনি যদি বলেন, তাঁকে খবর দিই।

তাই দিন। আর একটা কথা। ডাক্তার এলে আমি যেন জানতে পারি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি বলবেন আমাকে?

বলব। তবে এখন নয়। একটু ধৈর্য ধরে থাকুন প্লিজ।

সতীশ কুমার দোতলায় ওঠার সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এসে বললেন, দেখবেন স্যার, যেন আমাদের হোটেলের সুনাম নষ্ট না হয়।

ওঁকে আশ্বস্ত করে আমার স্যুইটে গেলাম। রাপ্তী উদ্বিগ্ন মুখে বলল, তমাল অসুস্থ। অথচ আপনি আমাকে তা বলেন নি! কি হয়েছে ওর?

বলছি। তুমি বস। ততক্ষণে আমি সিলটা দেখে নিই।

রাপ্তী অস্থির হয়ে বলল, আমি তমালকে দেখতে চাই।

ডাক্তার এলেই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ওর কাছে যাব। বলে ওর দেওয়া প্যাকেটটা বের করলাম। তারপর প্যাকেট খুলে দেখি, কালো কাগজে মোড়া একটা গোলাকার শক্ত জিনিস, রঙিন কাগজকুচির মধ্যে ঠাসা আছে। মোড়ক খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা ব্রোঞ্জের চাকতি। চাকতিটা কোন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। মধ্যিখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট

বুদ্ধদেব এবং চারদিকে কারুকার্যের মতো খোদাই করা লিপি।

আতস কাচ দিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেই চোখে পড়ল, পদ্মাসনের উপরে ও নীচে আঁকাবাঁকা কিছু রেখা। এক কোণে চন্দ্রকলাও আছে। চমকে উঠলাম। তাহলে 'চন্দ্র সরোবর' নামটিই কি মুন লেকের প্রাচীন নাম? পর্যটন বিভাগ সম্ভবত 'মুন লেক' কথাটির নিছক অনুবাদ করেন নি। কোন গবেষকের কাছে জানতে পেরেই হয়তো লুপ্ত নামটি ফিরিয়ে এনেছেন। আঁকা-বাঁকা রেখাগুলি জলের ঢেউয়ের প্রতীক, তাতে ভুল নেই।

আমি প্রাচীন লিপি নিয়ে একসময় কিছু পড়াশুনো করেছিলাম। আপাত-দৃষ্টে এই লিপি কুষাণ যুগের ব্রাহ্মীলিপি মনে হল।

উত্তেজনা দমন করে সিদ্ধান্ত নিলাম, এখনই যেভাবে হোক, তমাল ও রাপ্তীকে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারপর ট্রাঙ্ককলে দিল্লিতে সেন্ট্রাল আর্কিওলজি ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। কলকাতার জাদুঘর থেকে চুরি যাওয়া সিল কি করে আমার হাতে এল। সেই জবাবদিহির দায়িত্ব আমার কাঁধেই পড়বে। অবশ্য সিল চুরি যাওয়ার পর সম্ভবত দায়িত্বহীনতার অভিযোগেই পারমিতার চাকরি গিয়েছিল। কাজেই তার কাঁধে দায়টা চালান করা যায় এবং আমাকে একটা মিথ্যা গল্প ফাঁদতে হয়।

তো পরের কথা পরে। সিলটা প্যাকেটে ঢুকিয়ে জ্যাকেটের ভেতর পকেটে রাখলাম। তারপর দেখলাম, রাপ্তী আমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। একটু হেসে বললাম, তুমি কি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি সম্পর্কে আগ্রহী?

সে জোরে মাথা দুলিয়ে বলল, না। আমি তমালকে দেখতে চাই।

দেখতে পাবে। ডাক্তার আসুক। তবে আমার একটা প্রস্তাব আছে।

বলুন।

তোমাদের দু'জনকে যেভাবে হোক, যদি নিরাপদে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই?

রাপ্তী নড়ে বসল। প্লিজ কর্নেল সরকার। আমি সেটাই চাইছি। সেই কথাটাই আপনাকে বলব ভাবছিলাম। আর আপনি পারমিতাকে পুলিশের হাতে তুলে দিন। শি ইজ ডেঞ্জারাস। কলকাতা ফিরে গিয়ে সে তমালের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে।

ঠিক আছে। তুমি একটু বসো। ডাক্তার আসুক। তারপর সব ব্যবস্থা করা যাবে।

ডাক্তার এলেন প্রায় আধঘণ্টা পরে। সতীশ কুমার, আমি এবং রাপ্তী ডাক্তারের সঙ্গে ২২ নং স্যুইটে গেলাম। ডুপ্লিকেট চাবিতে সতীশ কুমার দরজা খুলে দিলেন। আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

তারপর ডাক্তার বলে উঠলেন, হোয়্যার ইজ ইওর পেস্যাণ্ট মিঃ সতীশ কুমার ?

বিছানা খালি। তমাল সেন নেই। সতীশ কুমার বাথরুমের দরজা খুললেন। সেখানে তমাল নেই। ব্যালকনির দরজা খুলে দেখলেন। সেখানেও কেউ নেই। সতীশ কুমার খাপ্পা হয়ে গার্ডকে ডাকলেন। বললেন, তুমি কোথায় ছিলে? তোমাকে বলেছিলাম এই স্যুইটের দিকে লক্ষ্য রাখতে। কেউ ঢুকলে বা বেরুলে যেন আমি খবর পাই।

গার্ড কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমি পাঁচ মিনিটের জন্য বাথরুমে গিয়েছিলাম স্যার।

ডাক্তার অবাক হয়ে বেরিয়ে গেলেন। সতীশ কুমার বললেন, পুলিশকে জানাতে হবে কর্নেল সাহেব।

আমি সায় দিলাম। সতীশ কুমার বেরিয়ে গেলেন। দেখলাম রাপ্তী পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে।

আমার পক্ষে অবশ্য এ ছিল অভাবিত সুযোগ। স্যুইটের ভেতরটা খোঁজা-খুঁজি করে জাল ডঃ রঘুবীর প্রসাদ ওরফে বিনয় শর্মার প্রকৃত পরিচয়ের সূত্র যদি মেলে, তাহলে তাকে মিসপার্সোনিফিকেশনের দায়েই আপাতত পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে। তার বিরুদ্ধে তমালের অভিযোগ নিশ্চয় আইনের ধোপে টেকে। কারণ তমালকে সে মারধর করে দড়ি বেঁধে পাইনবনে ফেলে রেখেছিল এবং আমি তার সাক্ষী। কিন্তু তমাল নিপাত্তা হয়ে গেছে।

কাল রাতে টেবিলল্যাম্পের আলোয় যে স্যুটকেসটা দেখেছিলাম, এখন সেটা গোছানো মনে হল। আমার সঙ্গে সবসময় দরকারি ছোটখাটো জিনিস থাকে। তা আগেই বলেছি। একটা খুদে স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে স্যুটকেসটা খুলে ফেলতে দেরি হল না। পারমিতার পোশাকে স্যুটকেসটা ভর্তি। কাজেই এটা পারমিতার বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ রাপ্তীর পাথরের মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার লক্ষ্য করলাম। সে মৃদুস্বরে বলল, তমাল তার স্যুটকেসে পারমিতার পোশাক পর্যন্ত রাখতে দিয়েছে? কর্নেল সরকার। এখন আমার মনে হচ্ছে, তমাল আমার সঙ্গে হয়তো প্রতারণা করেছে।

স্যুটকেসটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে বললাম, তাহলে সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কেন?

সিলটা লুকিয়ে রাখার দরকার ছিল। তাই গিয়েছিল।

কোন মন্তব্য করলাম না। এই স্যুটকেসে পুরুষ মানুষের কোন পোশাক নেই। চেনগুলো টেনে খুলে ভেতরে এমন কিছু পেলাম না যা বিনয় শর্মার কোন

সূত্র জোগাতে পারে। এবার ওয়াড্রোব খুলে দেখলাম, সেটা ফাঁকা। এতক্ষণে মনে হল, পারমিতা অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্য সব গুছিয়ে রেখেছে।

বিছানা উল্টেপাল্টেও কিছু দেখতে পেলাম না। টেবিলের ড্রয়ার ফাঁকা। নেহাৎ খেয়ালবশে নিচু খাটের তলায় উঁকি দিলাম। একটা কাগজের প্যাকেট দেখে খুব আশা করলাম, এর মধ্যে কিছু গোপনীয় জিনিস পেয়ে যাব। কিন্তু খুলেই হতাশ হলাম। পারমিতারই দুপাটি জুতো মাত্র।

জুতো খাওয়ার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছি এবং আমার মুখটা নিশ্চয় তুম্বো দেখাচ্ছিল, সেই সময় রাপ্তী টেবিলের তলা থেকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট টেনে বার করল। বুঝলাম, সেও এই তল্লাসিতে যোগ দিতে চায়।

সে বাস্কেট থেকে দলাপাকানো ছেঁড়া কয়েকটা খবরের কাগজ বের করল। তারপর নির্বিকার মুখে বলল, আপনি যদি চিঠিপত্র দেখতে চান, দেখাতে পারি।

সে ছেঁড়া এবং দলাপাকানো দুটো ইনল্যাণ্ড লেটার তুলে আমার হাতে দিল। তা পকেটে চালান করে বললাম, এই যথেষ্ট। এবার যেকোন সময় পুলিশ এসে যাবে। আমাদের এখনই বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

দরজায় ইণ্টারলকিং সিস্টেম আছে। ভেতর থেকে বিনা চাবিতে খোলা যায়। কিন্তু বাইরে থেকে চাবি ছাড়া খোলা যায় না। ২২ নং স্যুইট থেকে বেরুলে সেই হোটেল গার্ড কেন কে জানে আমাকে সেলাম ঠুকল। তার মুখে কাঁচুমাচু ভাব লক্ষ্য করলাম। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার সময় ছিল না। নিজের স্যুইটে ফিরে চিঠি দুটো নিয়ে বসলাম।

ডটপেনে লেখা ইংরেজি চিঠি। দুটো চিঠিই পারমিতাকে লেখা। অনেক পরিশ্রমে জোড়াতালি দিয়ে আতস কাঁচের সাহায্যে পড়ে বোঝা গেল, প্রথম চিঠিতে পারমিতাকে অবিলম্বে দেখা করতে বলা হয়েছে। তলায় নামসই আছে। কিন্তু তা ছেঁড়াখোঁড়া এবং অস্পষ্ট। দ্বিতীয় চিঠিটাও একই হাতের লেখা। কাটাছেঁড়া শব্দ এবং বাক্যাংশ থেকে বোঝা গেল, ট্রেন সংক্রান্ত খবর দেওয়া হয়েছে। তলায় সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর 'এস এল'।

রাপ্তী ঠোঁট কামড়ে ধরে চুপচাপ বসে ছিল। ঘাড় দেখে বললাম, তুমি এখানে ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে পারো। পুলিশ আসার আগেই আমি ব্রেকফাস্টে বসতে চাই।

রাপ্তী উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি যাই।

সে কি! কোথায় যাবে তুমি?

ইস্টার্ন লজে। তারপর বাস ধরে সরাডিহা যাব। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতা।

সরাডিহায় কেন?

ওখানে আমার এক মামা থাকেন।

একটু হেসে বললাম, তুমি তমাল বেচারাকে ফেলে রেখে চলে যাবে ?

রাপ্তী ফুঁসে উঠল। তমালের ওপর আর আমার এতটুকু আস্থা নেই।

তমাল তার স্যুটকেস পারমিতাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। তাই কি তোমার আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে ?

কর্নেল সরকার। তমাল তার সঙ্গে একই ঘরে ছিল।

দরজায় কেউ নক করছিল। তাই সে থেমে গেল। মুহূর্তেই বুঝলাম, ওই ঘরে রাপ্তীকে নিয়ে গিয়ে ভুল করেছি। কোন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর এই আচরণ সহ্য করা সম্ভব নয়। রাপ্তী যে ঘটনাটা একভাবে ভেবে রেখেছিল, প্রত্যক্ষ বাস্তব সেই ঘটনাটা বদলে দিয়েছে।

দরজা একটু ফাঁক করে দেখলাম সতীশ কুমার এবং একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সতীশ কুমার বললেন, আলাপ করিয়ে দিই। পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর শ্রীরমেশ সিংহ। রমেশজী। ইনিই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

রমেশ সিংহ আমাকে সোজাসুজি চার্জ করলেন। এই হোটেলের ২২ নং স্যুইটের জনৈক তমাল সেন সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কারণ কি ?

গম্ভীর মুখে বললাম, তমাল সেন আমার ভাগনি রাপ্তীর স্বামী। এখানে বেড়াতে এসে ওরা গুন্ডার পাল্লায় পড়েছিল।

এখানে কোন গুণ্ডা নেই। আমরা গুণ্ডাদের শায়েস্তা করেছি।

তারা শায়েস্তা হয়নি। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে তমাল একটু আহত হয়েছিল। আমাকে জানিয়েছিল যে গুণ্ডারা পাল্টা মার দেওয়ার জন্য এই হোটেলে হানা দিতে পারে। তাই মিঃ সতীশ কুমারকে সতর্ক করে রেখেছিলাম। এখন তমালের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে আমার ভাগনিও নিখোঁজ। আপনারা তাদের খুঁজে বের করুন।

রমেশ সিংহ আরও চটে গেলেন। ওঁরা থানায় জানান নি কেন ?

অচেনা জায়গা বলে সাহস পায় নি। আপনাদের জানালে গুণ্ডারা আরও খাপ্পা হয়ে যেত। তাই চেপে গিয়েছিল।

আপনি কর্নেল ?

হ্যাঁ। তবে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। কিন্তু আমি বৃদ্ধ মানুষ, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

কথাবার্তা ইংরেজিতে হচ্ছিল। রমেশ সিংহ আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, আপনি যে সত্যি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল, তার প্রমাণ ? আপনার পরিচয়পত্র দেখতে চাই।

নেমকার্ড বের করে দিলাম। সতীশ কুমার বিব্রত বোধ করেছিলেন।

বললেন, রমেশজী, আমাদের হোটেলের সুনাম আছে। দয়া করে মিঃ সেন এবং মিসেস সেন সম্পর্কে একটু মনোযোগ দিলে বাধিত হব।

রমেশ সিংহ নেমকার্ড পড়ছিলেন। যথারীতি বললেন, নেচারিস্ট মানে?

যে প্রকৃতিকে ভালবাসে।

আপনার পরিচয়পত্র এটা নয়। এটা যে কেউ ছাপিয়ে নিতে পারে।

হাসতে হাসতে বললাম, আপনি কি ভাবছেন আমিই আমার ভাগনি আর তার স্বামীকে নিপাত্তা করে দিয়েছি?

সতীশ কুমার বললেন, রমেশজী, অকারণ সময় নষ্ট হচ্ছে।

রমেশ সিংহ আমার নেমকার্ড পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, আপনি পুলিশের অনুমতি ছাড়া হোটেল ছেড়ে যাবেন না!

কথাটা বলে উনি সতীশ কুমারের সঙ্গে ২২ নং সুাইটের দিকে এগিয়ে গেলেন। পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক আমার ওপর কেন খাপ্পা হলেন, বুঝতে পারলাম না। রাপ্তীকে আমার ঘরে দেখলে উনি নির্ঘাত বিভ্রাট বাধাবেন। দ্রুত দরজা খুলে ঘরে ঢুকে বললাম, রাপ্তী! চলো, আমরা বাইরে কোথাও ব্রেকফাস্ট সেরে নেব। তাছাড়া শিগগির আমাকে একটা ট্রাঙ্ককল করতে হবে।

বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। করিডর থেকে নেমে লেকের দিকের রাস্তায় পৌঁছে বললাম, তোমার ইস্টার্ন লজে কি ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা আছে?

রাপ্তী শুধু বলল, কি বিচ্ছিরি।

সবকিছুই এখন সত্যি বড্ড বিচ্ছিরি রাপ্তী। কিন্তু কি আর করা যাবে?

লেকের ধারে গিয়ে বাইনোকুলারে পূর্ব-দক্ষিণে পাহাড়ের গায়ে পাইনবনটা একবার খুঁটিয়ে দেখলাম। কাকেও দেখা গেল না।

কিছুক্ষণ পরে ইস্টার্ন লজের কাছাকাছি গেছি, হঠাৎ রাপ্তী বলে উঠল, তমাল ওখানে কি করছে?

রাস্তার ধারে একটা ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় তমালকে বসে থাকতে দেখলাম। তার পাশে একটা সুাটকেস এবং কোলের ওপর একটা ছোট ব্রিফকেস। চোখে সানগ্লাস। বটগাছটা ইস্টার্ন লজের উল্টোদিকে।

আমাদের দেখতে পেয়ে সে উঠে দাঁড়াল। রাপ্তী তার সঙ্গে কথা বলল না। সোজা লজের ভেতর ঢুকে গেল। তমালের কাছে গিয়ে বললাম, তুমি কি রাপ্তীর জন্য এখানে অপেক্ষা করছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আর একমুহূর্ত এখানে থাকতে চাইনে। পারমিতা আমার সঙ্গে এতটা বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমি চিন্তাও করিনি।

একটু হেসে বললাম, তুমি তার সঙ্গে একই ঘরে ছিল। এতে রাপ্তী রেগে আগুন হয়ে গেছে। তবে তার রাগটা স্বাভাবিক।

তমাল মাথা নেড়ে বলল, একঘরে ছিলাম। তাতে কি হয়েছে? বাপ্তীকে তো আমি গত পরশু রাতে এসে সব বলে গেছি। রাপ্তী আধুনিক মনের মেয়ে। আমার ওপর তার আস্থা রাখা উচিত।

যাই হোক। তুমি নিখোঁজ হওয়ায় হোটেল থেকে পুলিশ ডাকা হয়েছে।

আপনি প্লিজ রাপ্তীকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আই ওয়াজ রিয়্যালি ট্রাপড বাই পারমিতা। বিনয় শর্মার সঙ্গে সেই যোগাযোগ করে এসেছিল। তমাল উত্তেজিত ভাবে ফের বলল, বিনয় শর্মাও কি সাংঘাতিক লোক তা আমি জানতাম না।

তুমি দশ লাখ টাকার লোভে ওদের ফাঁদে পা দিয়েছিলে। তমাল, টাকার লোভ সাংঘাতিক লোভ। আর এও সত্যি যে, তুমি পারমিতাকে ফটো তোলার ছলে পাহাড়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে পাহাড় থেকে নীচের খাদে ফেলে দেওয়া।

অমনি তমাল আমার একটা হাত চেপে ধরল। আমার মাথার ঠিক ছিল না কর্নেল সরকার। হ্যাঁ, আমি ওই মেয়েটার হাত থেকে বাঁচতে চাইছিলাম। ও যে কি সাংঘাতিক চরিত্রের মেয়ে আপনি জানেন না। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে।

বললাম, রাপ্তীর সঙ্গে বোঝাপড়াটা তুমি কলকাতায় গিয়ে করবে। এখন চল, আমার খিদে পেয়েছে। রাপ্তী বলছিল, ইস্টার্ন লজের খাবার বিচ্ছিরি। কিন্তু কি আর করা যাবে?

আমরা ইস্টার্ন লজে ঢোকার আগেই রাপ্তী কাঁধে প্রকাণ্ড ব্যাগ ঝুলিয়ে এবং হাতে একটা স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, কর্নেল সরকার। আমি বাস স্ট্যাণ্ডের ওখানে খেয়ে নেব। চলি।

সে তমালকে কোন কথা না বলে হনহন করে এগিয়ে চলল। তমাল তাকে ব্যস্তভাবে অনুসরণ করল। এটা দাম্পত্য সমস্যা। আমি ভেবে দেখলাম, আমার বরাতে ইস্টার্ন লজের বিচ্ছিরি ব্রেকফাস্ট নেই। কারণ আব এখানে থাকার মানে হয় না।

একটা সাইকেল রিক্সা ডেকে আবার হোটেল দ্য লেক ভিউয়ে ফিরে এলাম। ডাইনিং হলে ঢুকে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলাম। একটু পরে সতীশ কুমার এসে বললেন, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? রমেশজী খুব রেগে চলে গেলেন। আপনাকে গ্রেফতার করবেন বলে হুমকি দিচ্ছিলেন।

বললাম, সতীশজী! আপনি অনুগ্রহ করে আমার নামে লখনউতে একটা ট্রাঙ্ককল বুক করুন। নাম্বার আমি লিখে দিচ্ছি। খুব জরুরী কিন্তু।

সতীশ কুমার চিরকুটটা নিয়ে চলে গেলেন। ব্রেকফাস্টের পর কফিতে চুমুক দিয়েছি, তখন একজন হোটেলবয় এসে খবর দিল, ম্যানেজার সাহেব ডাকছেন।

টেলিফোনে সাড়া দিতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কর্ণেল সরকার। আমি কিন্তু মোটেও অবাক হইনি যে আপনি চন্দ্র সরোবরে পাড়ি জমিয়েছেন। তবে যতটা জানি, ওখানে এখন প্রচণ্ড শীত। গত ডিসেম্বরে বরফ পড়ার খবরও শুনেছিলাম।

এটা নভেম্বর মাস মিঃ সিংহ। যাই হোক, আমি আপনাকে মুন লেকে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। জরুরি আমন্ত্রণ।

ওঃ কর্নেল সরকার। আপনি কি ওখানেও খুনোখুনি বাধিয়ে ফেলেছেন?

না, না মিঃ সিংহ। একটা বুদ্ধমূর্তির ব্যাপার।

বুদ্ধমূর্তি! প্লিজ, একটু আভাষ দিন।

বুদ্ধমূর্তির আড়ালে কি আছে এখনও জানি না। তবে আপনার সদলবলে আসা জরুরি। এখানে এক সিংহের পাল্লায় পড়েছি। মনে হচ্ছে তিনি আপনার চেয়ে পরাক্রমশালী। তবে সেটা কোন সমস্যা নয়। আপনাকে আজ বিকেল নাগাদ দেখতে পাব কি?

ঠিক আছে। আপনি যখন ডাকছেন, তখন বুঝতে পারছি—

রাখছি মিঃ সিংহ। হোটেল দ্য লেক ভিউ। স্যুইট নাম্বার উনিশ।

ফোন রেখে সতীশ কুমারকে ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মিসেস সেন কি ফিরেছেন?

সতীশ কুমার উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, না। ওঁদের স্যুইটের দরজায় অন্য একজন গার্ড বহাল করেছি। ওঁদের কেউ দৈবাৎ ফিরে এলে যেন আমায় খবর দেয়। কারণ পশ্চিমের করিডর হয়ে ওঁরা কেউ ঢুকলে আমি দেখতে পাব না। কিন্তু কর্নেলসাহেব, আপনি রমেশজীকে বললেন, মিসেস সেন আপনার ভাগনি এবং তিনিও নাকি নিখোঁজ। অথচ মিসেস সেন তাঁর স্বামীকে ট্যাক্সি করে নিয়ে যেতে চাইলে আমাকে আপনার কথামতো বাধা দিতে হল। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সময়মতো সবই বুঝতে পারবেন। বলে দোতলায় নিজের স্যুইটে ফিরে গেলাম। তারপর ব্যালকনিতে বসে হ্রদের জলটুঙ্গিতে সেক্রেটারি বার্ডের সন্ধানে সবে বাইনোকুলার তুলেছি, সেইসময় দেখলাম লেকের তীরে বিনয় শর্মা, পারমিতা এবং ষণ্ডামার্কা সেই লোকটা হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে চলেছে। তারা হোটেলের দিকে তাকালে আমাকে দেখতে পেত। কিন্তু তারা তাকাল না। কিছুক্ষণ পরে কটেজ এরিয়ার চড়াইপথে তাদের যেতে দেখলাম। তাদের এই ব্যস্ততার নিশ্চয় কোন কারণ আছে।

ওই ষণ্ডামার্কা লোকটাই যে আজ ভোরে পূর্ব উপত্যকায় আমাকে অনুসরণ করেছিল এবং সুযোগ পেলেই আক্রমণ করত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিনয় শর্মা হলে সম্ভবত পাল্টা গুলি ছুঁড়ত। সে কাল দুপুরে পাইন-বনের নীচে অর্কিডের ফুলটার কাছে আমাকে বলেছিল, তার কাছে ফায়ার আর্মস আছে। তখন ভেবেছিলাম মিথ্যা বলছে। এখন মনে হচ্ছে, আসলে পরোক্ষে সে আমাকে হুমকিই দিয়েছিল।

এদিকে রাপ্তী বলে গেছে, পারমিতার কাছে নাকি ফায়ার আর্মস আছে।

অতএব লখনউ থেকে পুলিশ সুপার রণধীর সিংহ এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমার বেশি ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। স্থানীয় পুলিশ আমাকে পাত্তা দেবে না। এ ধরণের দুষ্টচক্রের মোকাবিলা করতে হলে পুলিশের সাহায্য দরকার। শর্টকাট করতে হলে রণধীর সিংহকে সরডিহা হয়ে আসতে হবে এবং ঘণ্টা তিনেক সময় তো লাগবেই।

বাইনোকুলার তুলে আবার হ্রদের জলটুঙ্গিতে সেক্রেটারি বার্ডটিকে খুঁজতে থাকলাম। · আমাকে চমকে দিয়ে পাখিটা জঙ্গল থেকে কালকের মতোই উড়ল এবং আজ তার গতি পূর্ব-দক্ষিণ পাহাড়ের দিকে। একটু পরেই পাখিটা পাইনবনের শীর্ষে গিয়ে বসল।

তখনই বেরিয়ে পড়লাম। হ্রদের তীরে এখন ভিড় জমেছে। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। বিনয় শর্মা বা কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে কিনা গ্রাহ্য করিনি। অবশ্য ওদের উত্তরের পাহাড়ে কটেজ এরিয়ায় যেতে দেখেছি। এদিকে আর আসতে দেখিনি।

অর্কিডের ফুলটিকে কেউ নির্মমভাবে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলেছে দেখে ব্যথিত হলাম। গুঁড়ি মেরে সতর্কভাবে পা ফেলে পাইনবনের কাছে পৌঁছলাম। তারপর বাইনোকুলারে পাখিটাকে খুঁজতে থাকলাম। খুঁজতে খুঁজতে সেই পাথরটার কাছে গেলাম, যেখানে তমাল আহত অবস্থায় বন্দি হয়ে পড়ে ছিল।

এবার পাখিটা চোখে পড়ল। কিছুটা ওপরে একটা পাইনগাছের শীর্ষে বসে লম্বা ঠোঁট দিয়ে সে পাখনা চুলকোচ্ছিল। দ্রুত ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। হঠাৎ সে উড়ে পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটা বেঁটে পাইনগাছের শীর্ষে গিয়ে বসল। চূড়ার নীচে ঢালু অংশটা ফাঁকা এবং ঘন ঘাসে ঢাকা। সেখানে অজস্র পাথরের চাঁই পড়ে আছে। কিন্তু যেভাবেই কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করি না কেন, তার চোখে পড়ে যাব। ক্যামেরার টেলিলেন্সের আওতা থেকে তার অবস্থান বেশ দূরে। আরও বাধা সামনাসামনি সূর্য।

তাই বাঁদিকে এগিয়ে গেলাম। চূড়ার উত্তর দিকে ঘুরে যদি ওঠা যায়, পাখিটাকে নাগালে পেতেও পারি। কিন্তু কিছুটা গিয়ে দেখি, ওদিকে খাড়া

পাথরের পাঁচিল। নীচে গভীর খাদ। বাইনোকুলারে খাদটা দেখছিলাম। দেখার কোন কারণ ছিল না। আসলে এটা আমার নিছক অভ্যাস। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ মাত্র।

দেখতে দেখতে খাদের উত্তরে অনুরূপ খাড়া পাথরের পাঁচিলের গায়ে একটা চাতাল চোখে পড়ল। তার মানে, একটা পাহাড় কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেন চিড় খেয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। কিন্তু উল্টো দিকে অর্থাৎ উত্তরের পাঁচিল খাড়া হলেও স্থানে স্থানে ধাপবন্দি ছোট-বড় ব্যালকনির মতো চাতাল আছে। যে চাতালটা প্রথমে চোখে পড়েছিল, সেটা সবচেয়ে প্রশস্ত। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, চাতালের শেষপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড ফাটল এবং সেই ফাটলের কাছাকাছি খাড়া পাথরের গায়ে পদ্ম খোদাই করা আছে।

দেখা মাত্র চমকে উঠলাম। বাইনোকুলার নামিয়ে খালি চোখে পদ্মটা আর দেখা গেল না। উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলাম। তাহলে কি ওই ফাটলটা প্রাচীন যুগের কোন গুহা এবং সেই গুহার ভেতরই কি সেই বুদ্ধমূর্তি আছে?

সেক্রেটারি বার্ড আমাকে তার ছবি তুলতে দিতে একান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু তাকে ধন্যবাদ দেওয়া চলে, যদি সে আমাকে বুদ্ধমূর্তিটি আবিস্কারের সুযোগ দিয়ে থাকে। সেই ছিন্নভিন্ন মৃত অর্কিডফুলের পাশ দিয়ে নেমে পাথর আর ঝোপঝাড়ে ভরা গিরিখাতে ঢুকলাম। এসব জায়গায় শঙ্খচূড় কেন, পাইথন সাপও থাকতে পারে। বাইনোকুলারে খুঁটিয়ে সামনেটা দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। মাঝেমাঝে পাহাড়ি অর্কিডের দেখাও পাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন অর্কিডের চেয়ে সেই চাতালে পেঁছনো জরুরি কাজ।

একটা দুর্গম গিরিখাতে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ প্রাণ গেলেও ঢুকতে চাইবে না, যদি না তার এ ধরণের অভিযানের কোন ট্রেনিং থাকে। কিছুক্ষণ পরে পাথরের কয়েকটা ধাপ এবং ছোট্ট চাতাল পাওয়া গেল। এরপর আর উঠে যেতে বিশেষ অসুবিধা হল না।

বড় চাতালটাতে উঠে ফাটলের পাশে খোদাই করা পদ্মটা আর খুঁজে পেলাম না। তখন বুঝলাম, এই পদ্ম দূর অতীতের কোন দক্ষ ভাস্কর এমন কৌশলে খোদাই করেছিল যে, নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকেই এটা চোখে পড়বে। দক্ষিণের পাইনবনের পাহাড় থেকে সম্ভবত প্রাচীন যুগের আগ্নেয়গিরির (মুন লেক তো প্রকৃতপক্ষে আগ্নেয়গিরিরই ক্রেটার বা জালামুখ) শেষ বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তার ফলে অনেকটা অংশ ফেটে চৌচির হয়ে খসে পড়েছিল এবং পাঁচিলের মতো একটাই খাড়াই সৃষ্টি হয়েছিল। গিরিখাতে জমাট লাভার স্তর লক্ষ্য করেছি।

পদ্মটা দেখতে না পেলেও এখন আমি ফাটলের সামনে পেঁছে গেছি। আগে বাইনোকুলারে তিনদিক দেখে নিলাম। তারপর ফাটলের ভেতরে টর্চের

আলো ফেললাম। কিন্তু হতাশ হয়ে দেখলাম, কুয়োর মতো একটা গহ্বর যেন পাতালে নেমে গেছে। তলা অব্দি আলো পৌঁছল না।

বুদ্ধমূর্তি এর ভেতর সত্যিই আছে না নেই, সেই কাজটা বরং কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ঠিক হবে। কিন্তু খোদাইকরা পদ্ম একটা আশঙ্কার কারণ হয়ে থাকছে। যদি বিনয় শর্মা আমার মতোই বাইনোকুলার সংগ্রহ করে অভিযানে নামে?

পাহাড়ের গা বেজায় এবড়োখেবড়ো। মনে পড়ল, পদ্মটা দেখেছিলাম ফাটলের ডান পাশে আন্দাজ ফুট পাঁচ-ছয় দূরত্বে। বাইনোকুলারে দেখার হিসেবে দূরত্বটা অবশ্য বেড়ে যায়। পিঠে বাঁধা কিটব্যাগ থেকে একটা হাতুড়ি আর লোহার গোঁজ বের করলাম। পাহাড়ি এলাকায় গেলে এসব জিনিস এবং শক্ত দড়ি সঙ্গে নিই। ফাটলের ফুটখানেক তফাৎ থেকে হাতুড়ি দিয়ে গোঁজটা ক্রমাগত ঠুকে অনেক চাবড়া খসিয়ে ফেললাম। অতীতের এক দক্ষ ভাস্করের কীর্তি নষ্ট করার জন্য অনুশোচনা হচ্ছিল ঠিকই. কিন্তু একটা গোঁয়ার্তুমি আমাকে পেয়ে বসেছিল। হাতুড়ির ঘায়ে পাহাড়ের আর্তনাদ প্রচণ্ডভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। বিনয় শর্মার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। যখন মনে হল, অনেকখানি অংশ এলোমেলো করে দিতে পেরেছি, তখন ক্ষান্ত হলাম। তারপর চাতাল থেকে চাবড়াগুলি পায়ে ঠেলে নীচে ফেলে দিলাম।

এবার ফের পাইনবনের অংশে গিয়ে দেখতে হবে, আমার পরিশ্রম সফল হয়েছে কিনা।

আর বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছি না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কালাপাহাড়ি কীর্তি করতে হয়েছিল এবং আমি সফল হয়েছিলাম।

হোটেলে ফিরলাম পৌনে দুটো নাগাদ। প্রচণ্ড পরিশ্রমে আমি তখন এতই ক্লান্ত যে সেই ষণ্ডামার্কা লোকটা কেন, একজন রোগাপটকা মানুষও আমাকে ধাক্কা দিলে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতাম।

গরম জলে স্নান করার পর অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। বোতাম টিপে একজন হোটেল বয়কে ডেকে লাঞ্চ পাঠাতে নির্দেশ দিলাম।

রণধীর সিং-এর না এসে পৌঁছনো অব্দি কিছু করার ছিল না। লাঞ্চের পর ব্যালকনিতে বসে বাইনোকুলারে কটেজ এরিয়া খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। ১২৭ নম্বর কটেজ চোখে পড়ছিল। কিন্তু বারান্দা বা লনে কেউ নেই। বিনয় শর্মা কটেজ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে উঠেছে কি? ওদের ব্যস্তভাবে ওদিকে যেতে দেখেছিলাম।

দরজায় কেউ নক করল। উঠে গিয়ে দরজা একটু ফাঁক করে যাকে দেখতে পেলাম, তার মুখে দাড়ি এবং চোখে সানগ্লাস ছিল। তখনই জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে রিভলভার বের করেছিলাম। অমনি সে ফিসফিসিয়ে উঠল, আমি

তমাল! আমি তমাল।

তাকে চিনতে পারলাম। মুখে দাড়ি, চোখে সানগ্লাস, মাথায় টুপি এবং হাতে এখন শুধু সেই ব্রিফকেসটা নিয়ে সে ঘরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে বললাম, তোমার ছদ্মবেশে ত্রুটি আছে।

তমাল দাড়ি খুলতে যাচ্ছিল। বাধা দিলাম। সে বলল, আমার না এসে উপায় ছিল না।

সেই সিলটার জন্য তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাপ্তী তোমাকে সিলটা কোথায় আছে তা বলে দিয়েছে। তার মানে, তোমার সঙ্গে তার রীতিমত বোঝাপড়া হয়েছে।

তমালের চেহারায় যে বোকা-বোকা ভাব লক্ষ্য করেছিলাম, নকল দাড়ি গোঁফের ফলে তা রাপ্তীর ভাষায় বিচ্ছিরি দেখাল। সে একটু হেসে বলল, পারমিতাকে আমি ফটো তোলার ছলে পাহাড় থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিলাম শুনে সে শান্ত হয়েছে। আপনি বাইনোকুলারে ঘটনাটা দেখেছিলেন। কাজেই আপনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। রাপ্তী আপনার কাছে এর সত্যতা যাচাই করলেই আমার সাতখুন মাফ।

গম্ভীর মুখে বললাম, তোমার সাতখুন মাফ হোক বা না হোক, একটা খুনের চেষ্টা আমি মাফ করতে পারছি না। নরহত্যা মহাপাপ।

তমাল নার্ভাস মুখে বলল, কিন্তু—কিন্তু আমি পারমিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ঝোঁকের মাথায়—

তুমি ওকে দিয়ে মিউজিয়ামের সিলটা চুরি করিয়েছ।

মিথ্যা। একেবারে মিথ্যা। তমাল এবার জোর দিয়ে বলল, রাপ্তী রাগের চোটে কথাটা অন্যভাবে আপনাকে বলেছে। আসলে পারমিতার টাকার দরকার ছিল। তাই নিজেই চুরি করে আমাকে বেচেছিল। কারণ আমার কিউরিও শপ আছে। তাছাড়া আমি অনেকদিন থেকে তার চেনাজানা। অচেনা কাকেও বেচতে সাহস পায় নি সে।

কিন্তু সে কেমন করে জানল ওতে চন্দ্র সরোবর এলাকায় প্রাচীন বুদ্ধমূর্তির কথা আছে?

পারমিতা মিউজিয়ামে চাকরি করত। সব জিনিসের রেকর্ডের হিস্টরি মিউজিয়ামের ক্যাটালগে আছে। তমাল জোরে শ্বাস ছেড়ে বলল, আমি ওর কথার সত্যতা যাচাই করতে আমার প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ রঘুবীর প্রসাদের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি প্রাচীন লিপি পড়তে পারেন। তিনিই বললেন, চন্দ্র সরোবরের পূর্ব-দক্ষিণ তীরের পাহাড়ে গুহার মধ্যে বুদ্ধমূর্তি আছে এবং গুহার দ্বারে পদ্ম খোদাই করা আছে।

বিনয় শর্মার সঙ্গে কি করে তোমার যোগাযোগ হল ?

পারমিতা এর আগেও মিউজিয়াম থেকে কয়েকটা জিনিস চুরি করে তাকে বেচেছিল। কিন্তু সিলটা চুরির সময় তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। পারমিতা পরে আমাকে বলেছে, বিনয় শর্মা তখন হংকংয়ে ছিল।

তাহলে পারমিতাই বিনয় শর্মাকে তোমার কাছে—

তমাল ব্যস্তভাবে বলল, টাকার লোভ আমার নেই বলব না। পারমিতার লোভ কিন্তু আরও বেশি। সিলটা আমাকে মাত্র একশো টাকায় সে বেচতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে তার চাকরি গেছে। কিন্তু সে সিলটার দাম কত হওয়া উচিত, তা জানে। কারণ এর সঙ্গে কুষাণ যুগের একটা বুদ্ধমূর্তির সম্পর্ক আছে। তাই বিনয় শর্মা কলকাতায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সে যোগাযোগ করেছিল। বিনয় শর্মা আমাকে বলল, মূর্তিটা পেলে সে দশ লাখ টাকা ক্যাশ দেবে। কিন্তু পারমিতা তার সঙ্গে চক্রান্ত করেছে তা জানতাম না।

একটা কথা। তুমি এখানে এসে কি সেই গুহা খুঁজে বের করতে পেরেছিলে ?

আজ্ঞে না। আপনি বিশ্বাস করুন। তমাল করুণ মুখে বলল। যখন টের পেলাম ওরা দুজনে বুদ্ধমূর্তি নিজেরাই হাতাতে চায় এবং সেইজন্য সিলটাই ওদের দরকার, তখন আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম। আমার সৌভাগ্য, সেই সময় রাপ্পী আমাকে ফলো করে এখানে চলে এসেছিল।

এখন রাপ্পী কোথায় ?

সরডিহায় তার মামার বাড়িতে আছে। ওর মামা ওখানকার ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ার।

তাহলে তুমি সিলটা ফেরত চাইতে এসেছ তো ?

সে তো আপনাকে বললাম।

সিলটা মিউজিয়ামেরই প্রাপ্য।

তমাল মুখ নামিয়ে বলল, আমার একশোটা টাকা গচ্চা গেছে। তাছাড়া শয়তান বিনয় শর্মা আমাকে কিছু অ্যাডভান্স করার ছলে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন করে মারধর করল। আপনি গিয়ে না পড়লে সে আমার ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার করত।

তোমার অপরাধের আক্কেল সেলামি। এভাবে জাতীয় ঐতিহ্য সম্পদ তুমি বিদেশে পাচারে সাহায্য করেছ।

তমাল আমার পায়ে ধরতে এল। তার কাঁধ ধরে তুলে বসিয়ে দিলাম। সে মুখ নিচু করে বসে রইল।

চুরুট ধরিয়ে বললাম, তোমাকে একটুখানি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বলুন কী করব ?

তোমাকে দাড়ি-টাড়ি খুলে কটেজ এরিয়ায় যেতে হবে। বিনয় শর্মা কোন্ কটেজে উঠেছে তুমি জানো। যদি তাকে কটেজে না পাও, লেকের ধারে ঘুরে বেড়াবে।

তমাল আঁতকে উঠে বলল, ওরে বাবা। সে আমাকে গুলি করে মারবে।

না। সিলটা তার দরকার। কিন্তু সে কিংবা পারমিতা তোমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এলে তুমি তাকে বলবে, গুহাটা তুমি আবিষ্কার করেছ।

কিন্তু আমি তো—

চুপচাপ শোন। সে তোমাকে মেরে ফেলবে না। পারমিতাও তোমাকে গুলি করে মারবে না। কারণ ওদের দরকার শুধু বুদ্ধমূর্তি। এবার দেখ, আমি গুহাটা কোথায় তা এঁকে দেখাচ্ছি।

আপনি গুহাটা আবিষ্কার করেছেন?

করেছি। তুমি সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ ওদের সেখানে নিয়ে যাবে। বলে হোটেলের প্যাডের একটা কাগজে গুহাটার ম্যাপ এঁকে তার হাতে দিলাম।

সে বলল, কিন্তু আমি এই হোটেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কি কৈফিয়ত ওদের দেব?

বলবে, সাদা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো কর্নেল তোমার পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল। তাই তুমি গা-ঢাকা দিয়েছিলে। এও বলবে, কিভাবে যেন সেই বুড়ো কর্নেল তোমাদের উদ্দেশ্য পরে টের পেয়েছিল। তাই তোমাকে উদ্ধার করে আনলেও পরে সে ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। যাইহোক, তুমি এই পয়েন্ট থেকে একটা গল্প দাঁড় করাবে। পারমিতা জানে, হোটেলের ম্যানেজার ট্যাক্সি চাপিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। কাজেই তোমার কথায় ওরা আর সন্দেহ করতে পারবে না।

এইসময় দরজায় কেউ নক করল। চাপা স্বরে বললাম, কুইক। তুমি বাথরুমে ঢুকে যাও। যেই আসুক, আমি এখন বেরিয়ে যাব। তাতে তোমার বেরুতে অসুবিধে হবে না। তুমি ভালই জানো, ভেতর থেকে দরজা খোলা যায়। তুমি করিডর দিয়ে ছদ্মবেশেই নেমে যাবে কিন্তু। দাড়ি পরে খুলে ফেল।

তমাল বাথরুমে ঢুকে গেল। আমি গিয়ে দরজা একটু ফাঁক করলাম। সাদা পোশাকে রণবীর সিংহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফিক্ করে হেসে সম্ভাষণ করলেন, গুড আফটারনুন কর্নেল সরকার।

উপসংহার

সেবার নভেম্বরে সেক্রেটারি বার্ডের খোঁজে মনুলেকে গিয়ে যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার মোটামুটি একটা বিবরণ দাঁড় করিয়েছি। এরপর কেউ যদি ভাবেন, বাকি কাজটুকু সহজে সমাধা হয়েছিল, তাহলে তিনি ভুল করবেন।

আসলে বিনয় শর্মা কত ধূর্ত এবং নৃশংস, তা ভাবতে পারিনি।

রণধীর সিংহকে হোটেলের পূর্বদিকের লনে নিয়ে গিয়ে সংক্ষেপে ঘটনাটা জানিয়েছিলাম। ওঁর জিপ অনুসরণ করে একটা পুলিশ ভ্যান এসেছিল সরাডিহা থানা থেকে। ভ্যানে বেতারযন্ত্র ছিল এবং সেটা একটু দূরে বড় রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। রণধীর সিংহ জানতেন, আমি তাঁকে আসতে বলা মানেই একটা নাটকীয় অভিযান। মনুলেক ফাঁড়ির সেই সাব ইন্সপেক্টর রমেশ সিংহ অবশ্য একটু ভড়কে গিয়েছিলেন। পরে আমি তাঁকে বিব্রত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক করে ফেলেছিলাম।

এখানে সাড়ে চারটে বাজতেই সন্ধ্যা জাঁকিয়ে বসে। পাঁচটায় একজন দু'জন করে সাদা পোশাকের সশস্ত্র পুলিশ গিয়ে পূর্বদক্ষিণের পাহাড়ি খাদে ঝোপঝাড় এবং পাথরের আড়ালে ওঁত পেতেছিল। আর একটি দল পূর্বের উপত্যকা দিয়ে ঘুরে খাদের পূর্ব দিকটা ঘিরে ফেলেছিল।

আমি, রণধীর সিংহ এবং কয়েকজন সশস্ত্র কনস্টেবল বড় চাতালটার কাছাকাছি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওঁত পেতে ছিলাম।

ওদিকে কটেজ এরিয়ায় স্থানীয় ফাঁড়ির কিছু পুলিশ ১২৭ নম্বর কটেজের আনাচে-কানাচে থেকে লক্ষ্য রেখেছিল। ওদের কোন অ্যাকশান নিতে নিষেধ করা হয়েছিল। তবে ওরা কাকেও কটেজ থেকে বেরুতে দেখলে যেন তখনই একজনকে বেতার ভ্যানে খবর দিতে পাঠায়। বেতার ভ্যানের অফিসার খবর পেলেই তাকে শুধুমাত্র অনুসরণ করবেন।

এ ছিল একটা বড় ধরণের অপারেশন। কারণ জাতীয় ঐতিহ্য সম্পদ বিদেশে পাচারের কোন সুযোগ যেন কেউ না পায়, সরকারি নীতিটা ছিল এরকম কঠোর। এখনও অবশ্য তাই আছে। কিন্তু তখন পাচারের কারবার সর্বত্র জাঁকিয়ে উঠেছিল। বাস্তবে যা হয়। বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো।

সন্ধ্যা ছ'টা আর যেন বাজতেই চায় না। রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির কাঁটার ওপর চোখ রেখে বসে আছি। প্রচন্ড ঠান্ডাহিম হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই হাওয়াটা মধ্যরাতের পর থেমে যায় এবং তারপর কুয়াশা জমতে শুরু করে।

একসময় ছ'টা বাজল। কিন্তু বিনয় শর্মাদের সাড়া নেই। প্রতিটি মুহূর্তে টর্চের আলো দেখার আশা করছি। কিন্তু একই নিবিড় অন্ধকার এবং হাওয়ার অদ্ভুত শনশন শব্দ।

সাড়ে ছ'টা বাজল। কেউ এল না। রণধীর সিংহ হাত বাড়িয়ে আমাকে স্পর্শ করলেন। চাপা স্বরে বললাম, আরও কিছুক্ষণ দেখা যাক।

সাতটায় আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। উঠে দাঁড়ালাম। তারপর সাবধানে চাতালে উঠলাম। ওখান থেকে তিনটে দিক দেখা যায়। ভাবলাম, পাইনবনে বিনয় শর্মারা হয়তো অপেক্ষা করছে। সতর্কতার কারণে ওরা অপেক্ষা করতেই পারে।

কিন্তু পাইনবনে কোন আলো দেখা গেল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফাটলের দিকে পা বাড়াতেই কি একটা শুকনো খসখেসে জিনিস জুতোয় ঠেকল। ওই মৃদু শব্দেই বুঝলাম জিনিসটা কাগজ জাতীয় কিছু। পিছন ফিরে বসে দু-হাঁটুর মাঝখান দিয়ে টর্চের আলো ফেলে চমকে উঠলাম।

একটুকরো পাথর চাপা দেওয়া একটা কাগজ। তাতে আঁকাবাঁকা হরফে ইংরেজিতে যা লেখা আছে তার সারমর্ম হল এই ঃ

> তোমার আদরের বাচ্চা এখন পাতাল গুহায় বুদ্ধদেবের সঙ্গে খেলা করছে।

পড়ামাত্র শিউরে উঠলাম। আস্তে ডাকলাম, মিঃ সিংহ। সর্বনাশ হয়েছে।

রণধীর সিংহ উঠে এলেন। তারপর চিঠিটা পড়েই ফাটলে ঝুঁকে জোরালো টর্চের আলো ফেললেন। আমি বাইনোকুলারে সেই আলোয় পাতালগুহা দেখে নিলাম। ওমাল কাত হয়ে নীচে পড়ে আছে। দেখামাত্র বললাম, মিঃ সিংহ। এখনই ওকে তুলে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

রণধীর বললেন, ভদ্রলোকের বেঁচে থাকার কথা নয়। তবে দেখছি কি করা যায়।

বললাম, আমার কাছে একটা দড়ি আছে। কিন্তু দড়িটা তত লম্বা নয়। আপনি শিগগির কাকেও টাউনশিপে পাঠান। ওখানে একটা মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং সেন্টার দেখেছি। ওঁরা সাহায্য করতে পারেন। আর আপনার বাহিনীকে ফিরে যেতে বলুন। ওয়্যারলেস ভ্যান থেকে সরডিহা থানাকে ম্যাসেজ পাঠাতে হবে। সব রাস্তা আর রেলস্টেশন—

রণধীর আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বাকি সবকিছু আমার হাতে ছেড়ে দিন।

রণধীর সিংহের তুল্য দক্ষ পুলিশ অফিসার এ যাবৎ খুব কমই দেখেছি। তিনি তখনই একজন অফিসারকে সংক্ষেপে নির্দেশ দিয়ে টর্চের আলোর সংকেত করলেন। এদিকে ওদিকে কয়েকটা তীব্র সার্চ লাইট এবং টর্চ জ্বলে উঠল।

রণধীর চিৎকার করে বললেন, ডিসপার্স। ব্যাক টু দি আউটপোস্ট। অ্যান্ড ব্রিং হিয়ার টু সার্চলাইটস্।

সুশৃঙ্খল ভাবে বাহিনীটি চলে গেল। দু'জন সশস্ত্র কনস্টেবল দুটি সার্চলাইট নিয়ে এল। সেই আলোয় পাতাল গুহার তলা বাইনোকুলারে দেখে আশান্বিত হলাম। তলাটা বালিতে ভরতি এবং এক কোণ দিয়ে ঝিরঝিরে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেল, ওটা একটা ভূগর্ভস্থ প্রস্রবন। পাহাড়ের তলার ফাটল দিয়ে বেরিয়ে পূর্বের উপত্যকায় ঝরনা হয়ে বইছে।

তমালের শরীরে কোন ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেলাম না। বাইনোকুলারে যেটুকু লক্ষ্য করা সম্ভব হল, তাতে বলা চলে, ও এখনও বেঁচে আছে।

মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং সেণ্টারের একদল তরুণ সদস্য এল প্রায় একঘণ্টা পরে। তারা সাহসী এবং উৎসাহী। তাদের সাহায্যে তমালকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে যখন লেকের তীরে পেঁছিলাম, তখনই একটি অ্যাম্বুল্যান্স এসে গেল।

রাত দশটা নাগাদ জ্ঞান ফেরার পর তমালের মুখে শুনলাম, বিনয় শর্মার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কটেজ এরিয়ায়। পারমিতাকে সে দেখতে পায় নি। শর্মা তাকে তখনই সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গুহা দেখিয়ে দিতে বলে এবং তমালের কাঁধ ধরে ঘনিষ্ঠভাবে হাঁটতে থাকে। তার ফায়ার আর্মসের নল তখন তমালের পাঁজরে ঠেকানো। এর ফলে তমাল তার সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। তখন চারটে বেজে গেছে। আসন্ন সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়েছে। কেউ টের পাচ্ছিল না ওভাবে একটা লোক আরেকটা লোককে কিডন্যাপ করার মতো নিয়ে যাচ্ছে। গুহার চাতালে উঠে তমাল কৌতূহল বশে একটু ঝুঁকেছে, তখনই বিনয় শর্মা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। তারপর তমালের আর কিছু মনে নেই।

আমার আশঙ্কা হয়েছিল, তাহলে আজ যখন তাদের তিনজনকে ব্যস্তভাবে ফিরে যেতে দেখেছিলাম, তখন তারা নিশ্চয় গুহার খোঁজ পেয়ে বুদ্ধমূর্তি আত্মসাৎ করে নিয়ে গেছে।

কিন্তু পরদিন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তার সঙ্গে ট্রাঙ্ককল যোগাযোগ করে হাস্যাস্পদ হলাম। বহু বছর আগেই তাঁরা পাতাল গুহা থেকে বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন। সেই মূর্তি দিল্লি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। তবে তাঁরা এ সংক্রান্ত কোন সিলের কথা জানতেন না।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। কিন্তু বিনয় শর্মা, পারমিতা এবং সেই ষণ্ডামার্কা লোকটিকে পাকড়াও করা গেল না ভেবে আক্ষেপ থেকে গেল।

তমাল পরদিন বিকেলেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। হোটেল দ্য লেক ভিউয়ে আমার স্যুইটে ওকে নিয়ে এলাম। তারপর কফি খেতে খেতে পারমিতাকে লেখা চিঠিতে 'এস এল' স্বাক্ষরের কথা বললাম। শোনামাত্র সে উত্তেজিত

হয়ে উঠল। সে বলল, সুরেশ লাল। তাকে আমি চিনি। সে আমার কিউরিও শপ থেকে বহু অ্যাণ্টিক কেনাকাটা করে। অ্যাণ্টিক সংগ্রহ ওর হবি। কিন্তু বিনয় শর্মা অন্য লোক।

সুরেশ লালের চেহারা কেমন?

বেশ হৃষ্টপুষ্ট গড়ন। গায়ের রঙ কালো। দেখলে গুণ্ডা গুণ্ডা মনে হয়।

একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ। তাহলে সেই ষণ্ডামার্কা লোকটাই সুরেশ লাল।

তমাল বলল, কোথায় দেখলেন তাকে?

এখানেই দেখেছি।

এই সময় দরজায় কেউ নক করল। দরজা ফাঁক করে দেখি, একজন হোটেলবয় দাঁড়িয়ে আছে। সে সেলাম দিয়ে বলল, কর্নেল সায়েবের টেলিফোন আছে।

তমালকে বসিয়ে রেখে নীচে ম্যানেজার সতীশ শর্মার ঘরে টেলিফোন ধরতে গেলাম। সাড়া দিতেই রাপ্তীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কর্নেল সরকার। আমি রাপ্তী বলছি সরাডিহা থেকে।

বলো ডার্লিং।

রাপ্তীর খুশিখুশি কথা ভেসে এল। বাহ্! তাহলে এবার আমিও আপনার জয়ন্ত চৌধুরীর পাশে ঠাঁই পেলাম। তো আপনি বিয়ে টিয়ে বলেছিলেন মনে আছে? এবার বলুন, আমার টিয়ে করা হাজব্যাণ্ডের খবর কি? ওকে নিখুঁত অবস্থায় ফেরৎ চাই।

পেয়ে যাবে। কাল মর্নিংয়ে তমালকে বাসে তুলে দেব।

শুনুন কর্নেল। জয়ন্তবাবুর মতো শুধু কর্নেলই বলছি কিন্তু।

বলো ডার্লিং।

ওনলি ফর ইওর ইনফরমেশন কিন্তু। তমালকে জানাবেন না। পারমিতার সঙ্গে আজ দুপুরে হঠাৎ এখানে আমার দেখা হয়ে গেছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি এখানে কি করছ? ও আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিল। বলল এখনই ট্রেন ধরতে হবে। আমি কি করলাম জানেন?

বিচ্ছিরি কিছু করলে?

রাপ্তীর হাসি শোনা গেল। খুবই বিচ্ছিরি কর্নেল। চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করে বললাম, এই মেয়েটা ডাকাত। আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ওর কাছে ফায়ার আর্মস আছে। ব্যাস। লোকেরা ওকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল। সার্চ করে পুলিশ ওর হ্যাণ্ডব্যাগে সত্যিই একটা স্মল গান পেয়েছে। একটু আগে মামাবাবু খোঁজ নিয়ে এসে বলেছিলেন, ওই মেয়েটাকেই নাকি পুলিশ খুঁজছিল। মুন লেকের একটা হোটেলে ও স্যুটকেস ফেলে পালিয়ে এসেছিল। পুলিশ—

ট্রাঙ্ককলের লাইন কেটে গেল। সতীশ শর্মাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের স্যুইটে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালের বাসে তমালকে সরাডিহা পাঠিয়ে হোটেল ফিরছি। পথিমধ্যে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর রমেশ সিংহ মোটর বাইক থামিয়ে বললেন, আপনার খোঁজে বাসস্ট্যাণ্ডে যাচ্ছিলাম। পুলিশ সুপার সিংহসায়েব ওয়্যারলেসে আপনাকে জানাতে বললেন, বিনয় শর্মা এবং সুরেশ লাল নামে তার এক সঙ্গী সরাডিহা রেলস্টেশনের রেস্টরুমে ধরা পড়েছে। বিনয় শর্মা একজন দাগি স্মাগলার। তার আসল নাম রাকেশ লাল। দুই লাল এখন কালো হয়ে গেছে···

মৃতেরা কথা বলে না

চন্দ্রনাথ দেববর্মন একটা ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট চালিয়ে দিয়ে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলেন। প্রিন্টটা ঠিক ওরিজিনাল নয়। তবে উজ্জ্বল এবং রঙিন। ছবির শুরুটা এমন স্বাভাবিক আর শালীন যে বোঝা যায় না শেষাবধি কিছু পাওয়া যাবে। একটা সেতুর দৃশ্য। পিছনে পাহাড়ি জঙ্গল। সেতুর ওপর পিছন ফিরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে হাত তুলে ঘড়ি দেখছে। বিরক্তিকর। রঙ্গনাথন ভুল করেছে, নাকি ইচ্ছে করেই তাঁকে ঠকিয়েছে? লোকটা ধড়িবাজ। হংকংয়ের কারবারি। মাসে অন্তত দু'বার কলকাতা আসে। এলেই একটা করে ক্যাসেট দেয় এবং ফেরার সময় চেয়ে নিয়ে যায়।

চন্দ্রনাথের বয়স ষাট পেরিয়েছে। বেঁটে, শক্তসমর্থ গড়নের মানুষ। মোঙ্গলোয়েড চেহারা। মাকুন্দে মুখ। যৌবনে পুনঃপুনঃ প্রেমে ব্যর্থ এবং দু' দফা লিভ টুগেদার করেছেন। এও ব্যর্থতা। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সহবাসে এমন কিছু থাকতেও পারে, যা কোনও নারীই সহ্য করতে পারে না। এই তাঁর সিদ্ধান্ত। কিন্তু ক্রমশ রক্তমাংসের নারীর প্রতি তাঁর প্রচণ্ড বিদ্বেষ জন্মে গিয়েছিল। সে কারণে বাকি জীবন একা কাটাতে চেয়েছিলেন। কাটাচ্ছেনও তাই। তবু অভ্যাস। এখনও ছায়ায় কায়ার উত্তাপ পেতে চান।

ডিলাক্স মার্কেটিং রিসার্চ ব্যুরোর মালিক চন্দ্রনাথ। এটা তাঁর নতুন কারবার। এই ব্যুরো কোনও কোম্পানির লেজুড় নয়। একেবারে স্বাধীন। কম লোক দিয়ে অনেক বেশি কামানো যায়। ছোট ও মাঝারি কনজ্যুমার গুডস প্রস্তুতকারীরা তাঁর মক্কেল। কোনো মক্কেলের বাজার পাওয়া পণ্যের চাহিদা হঠাৎ পড়তে শুরু করেছে কেন, উপাদানে গণ্ডগোল ঘটছে এবং কেউ বা কারা এটা ঘটাচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়নের কোনও নেতার কারচুপি, নাকি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বাজারে ঢুকেছে, কিংবা ডিস্ট্রিবিউটারের বদমাইশি—এসব ছাড়াও নতুন কোনও পণ্যের চাহিদার বাজার কেমন, ইত্যাদি অসংখ্য তথ্য চন্দ্রনাথের ব্যুরোকে সংগ্রহ করতে হয়। প্রয়োজনে ডিকেটটিভ এজেন্সির সাহায্য নিতে হয়। আজকাল ডিটেকটিভ এজেন্সিরও অভাব নেই। চন্দ্রনাথের সম্পর্ক তিনটির সঙ্গে, যাদের নাম দেখে কিছু বোঝা যাবে না। কেয়াবস্, ডিয়ার এসকর্ট এবং ফিনিক্স।

একটা বাস এসে থামল সেতুতে। এক তরুণী নামল। চন্দ্রনাথ হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালেন। বাসটা চলে গেলেই দু'জন পরস্পরের হাত

ধরল। মার্কিন উচ্চারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না চন্দ্রনাথের। বছর তিনেক আমেরিকায় ছিলেন। অনেক পোড় খেয়েছেন এবং অনেক ঘাটের জল।

তরুণ-তরুণী কথা বলতে বলতে হাঁটছে। জলের ধারে একটা পার্ক। পার্ক জনহীন নয়। কমবয়সীরা খেলা করছে। বিরক্তিকর! অন্তত একটা চুমুও—

টেলিফোন বাজল। ফোন তুলতে গিয়ে দেয়াল ঘড়ির দিকে চোখ গেল। রাত দশটা তিরিশ। সাড়া দিলেন অভ্যাসমতো, ইয়া।

মিঃ দেববর্মন? কোনও নারীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। স্মার্ট ইংরেজি। আপনি কি একা?

চন্দ্রনাথ একটু সতর্ক হয়ে বললেন, হ্যাঁ। আপনি কে?

আপনাকে আমি চিনি।

তাতে কী?

এই যথেষ্ট নয় কি মিঃ দেববর্মন?

কী চান আপনি?

একটু গল্প করতে। না, না মিঃ দেববর্মন। এটা জরুরি।

কেন? বলে পর্দায় চোখ বুলিয়ে নিলেন চন্দ্রনাথ, কিছু মিস করছেন কি না। নাহ্। তরুণ-তরুণী পার্কের শেষ প্রান্ত দিয়ে হেঁটে চলেছে। কখনও ক্লোজ শট, কখনও লং। মৃদু আবহসঙ্গীত এবং পাখির ডাক এবং প্রকৃতি।

মিঃ দেববর্মন! আপনি এখন কি করছেন?

উত্তেজনামেশা কৌতূহল চন্দ্রনাথকে ফোন রাখতে দিল না। একটু হাসির সঙ্গে বললেন, এটা কি কোনও ফাঁদ?

না, না মিঃ দেববর্মন! আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

ঠিক আছে। অনেক ফাঁদ আমি দেখেছি। বলুন।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিন প্লিজ!

আমি টি ভি দেখছি এবং হুইস্কি খাচ্ছি। আপনার কোনও প্রস্তাব আমি গ্রহণ করব না। বুঝলেন?

মিঃ দেববর্মন! আপনার কি আগ্নেয়াস্ত্র আছে?

আছে।

দরজা ঠিকমতো লক করা আছে?

আছে। কিন্তু কেন এসব কথা? আপনি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন? কে আপনি?

আপনি উত্তেজিত। শান্ত হোন। আর হাতের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী রাখুন।

তরুণ-তরুণী জলের ধারে হাঁটছে। গতি পাহাড়টার দিকে। আছড়ে

পড়া জলের শব্দ এবং আবহসঙ্গীত ক্রমে জোরালো হচ্ছে। চন্দ্রনাথ খাপ্পা হয়ে বললেন, পুলিশ দফতরে আমার লোক আছে। এখনই আপনার নাম্বার জেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। আর আমার টেলিফোনে টেপরেকর্ডার ফিট করা থাকে, জানেন তো?

মিঃ দেববর্মন। কেউ দরজায় নক করলেও—

হঠাৎ কথা থেমে গেল। চন্দ্রনাথ কয়েকবার উত্তেজিতভাবে হ্যালো হ্যালো করেও আর সাড়া পেলেন না। কোনও শব্দও শোনা গেল না। একটু অপেক্ষা করে ফোন রাখলেন। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দৃষ্টিতে শূন্যতা ছিল।

তরুণ-তরুণী পাহাড়ি রাস্তার চড়াইয়ে উঠছে। দূরে গাছপালার ভেতর একটা বাড়ির আভাস। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে এতক্ষণে চুম্বন।

কিন্তু চন্দ্রনাথের মনে অন্য উত্তাপ। উঠে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের খুদে রিভলভার বের করলেন। ৬টা গুলি ভরে এগিয়ে গেলেন ড্রয়িংরুমের দরজার দিকে, যেটা বাইরে যাওয়ার দরজা এবং চওড়া করিডর আছে। দরজা ঠিকমতো লক করা আছে। আইহোলে দেখলেন আলোকিত করিডর নির্জন। দুধারে দুটো অ্যাপার্টমেন্ট। বাঁদিকেরটা এক বাঙালি অধ্যাপক দম্পতির। ডানদিকেরটায় থাকেন এক পার্শি বৃদ্ধা মিসেস খুরশিদ এবং তাঁর অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পরিচারিকা। চন্দ্রনাথ বেডরুমে ফিরে এলেন। এখন তরুণ-তরুণী বাড়িটাতে ঢুকছে। খুব পুরনো কাঠের বাড়ি। এবার তাহলে চরম মুহূর্তের দিকে এগোচ্ছে ওরা।

নাহ্। কাট্ করে একটা রান্নাঘরের দৃশ্য। এক প্রৌঢ়া ওভেনে কিছু রান্না করছেন। বিজ্ঞাপন।

এরা এভাবেই সময় নষ্ট করে। অনেক ঘুরিয়ে তবে ঠিক জায়গায় পৌঁছায়। চন্দ্রনাথের এ বয়সে অত ঘোরপ্যাঁচ অসহ্য লাগে। সোজাসুজি সেক্সের পক্ষপাতী তিনি এবং এসব ব্যাপার পাপ বলে মনেও করেন না। শরীর আছে। কাজেই জৈবতার ধর্ম আছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক দান। এত ঢাকঢাক গুড়গুড় করার মানে হয় না। অথচ এই সব ক্যাসেট যারা তৈরি করে, তারা ঝানু ব্যবসায়ী। সেক্সের সঙ্গেও বিজ্ঞাপন। তেল সাবান স্নো, কিংবা রান্নার কড়াই। তার সঙ্গেও মিউজিক! অসহ্য!

কিন্তু মেয়েটি কে? কেন ওভাবে হঠাৎ টেলিফোন করে তাঁকে ভয় দেখাল? হঠাৎ থেমে গেলই বা কেন? চন্দ্রনাথ উদ্বিগ্নভাবে হুইস্কিতে চুমুক দিলেন। অটোমেটিক রিভলভারটা হাতের কাছেই বিছানায় রেখে দিলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল।

পুলিশকে জানাবেন কি? তাঁর একটা সুন্দর রাত্রি খুন হয়ে গেল।

মন বসবে বলে মনে হচ্ছে না। একটা অনুসন্ধান চলেছে মনের ভেতর। কে বা কারা তাঁকে খুন করতে চাইবে? এ ধরনের কারবারে প্রতিপক্ষ অবশ্যই থাকে। তাই বলে সাংঘাতিক কিছু করে ফেলবে? অবিশ্বাস্য। ব্যক্তিগত শত্রুতাও তো তাঁর কারও সঙ্গে নেই।

তরুণটিকে আগে করেছে । তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার একটা সিগারেট ধরালেন চন্দ্রনাথ। কিন্তু আবার কাট্ এবং পোশাকের বিজ্ঞাপন।

সেইসময় টেলিফোন বাজল। চন্দ্রনাথ আস্তে টেলিফোন তুলে সাড়া দিলেন, ইয়া!

আপনি তৈরি হয়ে আছেন তো মিঃ দেববর্মন?

একই কণ্ঠস্বর। চন্দ্রনাথ বললেন, হঠাৎ ফোন ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন?

আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

হ্যাঁ। আমার হাতে সিক্সবাউন্ডার। অটোমেটিক। কিন্তু আমি জানতে চাই, কে বা কারা আমাকে—

আপনি নিশ্চয় জানেন।

জানি না। যতটা সম্ভব শক্ত গলায় চন্দ্রনাথ বললেন। আমি বুঝি না।

তাই বুঝি?...একটু বিরতির পর শোনা গেল, মুখোমুখি হলে আভাস দিতে পারতাম যেটুকু আমি জানি। ফোনে তা সম্ভব নয়। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

কাছাকাছি।

একটু ভেবে নিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, আসলে চাইলে আসতে পারেন।

আমি জানি আপনি শক্তিমান মানুষ মিঃ দেববর্মন! কিন্তু—

তাহলে ছেড়ে দিন। বিরক্ত করবেন না।

ঠিক আছে। ঝুঁকি নিয়েই আমি যাচ্ছি। কিন্তু আমাকে রক্ষার দায়িত্ব আপনার।

চন্দ্রনাথ শক্ত গলায় বললেন, আসুন। হ্যাঁ, একটা কথা। আপনি গাড়িতে আসবেন, না হেঁটে আসবেন? এত রাতে সিকিউরিটি স্টাফ আপনাকে ঢুকতে দেবে না।

তা নিয়ে ভাববেন না মিঃ দেববর্মন! আমি এই হাউসিং কমপ্লেক্সের মধ্যেই আছি।

তা-ই? তাহলে আসুন।

টেলিফোন রেখে ক্যাসেট বন্ধ করলেন চন্দ্রনাথ। হুইস্কিতে আরও দুটো চুমুক দিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর ড্রয়িংরুমে গেলেন।

হাতে রিভলভার। দরজার আইহোলে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি দরদর করে ঘামছিলেন রাত-পোশাকের ভেতরে।

এটা তিনতলা। অটোমেটিক লিফ্‌ট আছে। সেটা এখান থেকে দেখা যায় না। বাইরের মুখোমুখি দুটো অ্যাপার্টমেণ্টের পর করিডর বাঁদিকে বেঁকেছে। তারপর আবার বাঁদিকে একটা অ্যাপার্টমেণ্ট সবগুলোই প্রায় দেড় হাজার বর্গফুটের বেশি। শুধু চন্দ্রনাথেরটা ৯ শো বর্গফুট। কার্পেট এরিয়ার হিসেব। এটা ১৩ নম্বর অ্যাপার্টমেণ্ট। আনলাকি থারটিন।

প্রতীক্ষা—এই ধরনের প্রতীক্ষা বড় অসহ্য। চন্দ্রনাথ আলোকিত নির্জন করিডরের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু নেশা হয়েছে। নেশা এবং উত্তেজনা তাঁর দৃষ্টিকে যেন অস্বচ্ছ করে দিচ্ছে ক্রমশ। দরজা খুলে দাঁড়ালেই বা ক্ষতি কী? হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি।

লিফটের সামনে ১০ নম্বর অ্যাপার্টমেণ্টে গরগর শব্দে মিঃ অগ্রবালের পাজি কুকুরটা গর্জন শুরু করেছে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে দরজা খুলে বেরুলেন চন্দ্রনাথ দেববর্মন। তিনি চিরকালের এক দুর্ধর্ষ লড়ুয়া।…

দুই

ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ছাড়ার কথা বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। কিন্তু সেদিনই বিকেলে প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন জনসভায় ভাষণ দিতে। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সারা পথ পুলিশে ছয়লাপ। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনও মাছি গলতে দেয়নি। জেনিথ ফার্মাসিটিউক্যালসের চিফ এক্সিকিউটিভ শান্তশীল দাসগুপ্ত এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়েই জ্যামে আটকে গিয়েছিল। কোম্পানির লোকাল ব্রাঞ্চের আনকোরা গাড়িতে এয়ারকণ্ডিশনিং ছিল অবশ্য। নইলে এই শেষ মার্চেই আবহাওয়া যা তেজী, চামড়া ভাজা-ভাজা হয়। ড্রাইভার নেমে গিয়ে খবর আনল। অন্তত তিন ঘণ্টা আটকে থাকতে হবে। গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু শান্তশীলকে আজ রাতে কলকাতা ফিরতে হবে। কারণ পরদিন সকালেই স্ত্রী মধুমিতাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি বহরমপুরে যেতে হবে। শ্বশুর-মশাই অসুস্থ। তাঁকে নিয়ে সেদিনই যেভাবে হোক কলকাতা আনতে হবে। নার্সিংহোমে বলা আছে। কর্মব্যস্ত একজন জামাইয়ের পক্ষে এটা একটা উটকো ঝামেলা। কিন্তু উপায় নেই। প্রেম করা বিয়ে।

রাত সাড়ে আটটায় রাস্তা মুক্ত হলো। প্লেনটাও প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে বাঙ্গালোরে অপেক্ষা করছিল। অবশেষে ভুবনেশ্বরে নেমে আবার যখন উড়ল, তখন রাত কাঁটায়-কাঁটায় পৌনে দশটা।

দমদমে পৌঁছে শান্তশীল একটু অবাক হয়েছিল। তার জিপসি মারুতিতে মউ (মধুমিতা) নেই। ড্রাইভার আক্রাম একা এসেছে। সে সেলাম দিয়ে সবিনয়ে জানাল, মেমসাব আসতে পারেননি। কী সব জরুরি কাজ আছে। এবং সে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে গাড়ি নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছে।

সানশাইন হাউজিং কমপ্লেক্সের বি-মার্কা বাড়ির দোতলায় শান্তশীলের অ্যাপার্টমেন্ট। ওটার মালিক তার কোম্পানি। মউ দরজা খুলে বলল, এয়ারপোর্টে ফোন করেছি—অন্তত পাঁচবার। কী ব্যাপার?

তার মুখে গাম্ভীর্য ছিল। শান্তশীলের অনুমান, সেটার কারণ মউয়ের বাবার অসুখ। ভুবনেশ্বর যাওয়ার দিন থেকেই এই গাম্ভীর্য এবং অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেছে শান্তশীল। এখন সে ভীষণ ক্লান্ত। অল্পকথায় দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার পর সে পোশাক না বদলেই সেলার খুলল। আগে এক চুমুক ব্র্যান্ডি।

মউ আস্তে বলল, প্রায় এগারোটা বাজে। কাল মর্নিংয়ে—

জানি। একটু সামলে উঠতে দাও।

মউ ঠোঁট কামড়ে ধরে তাকে দেখছিল।

শান্তশীল বলল, কী? আবার কিছু খবর এসেছে নাকি?

নাহ্।

তোমাকে বড় বেশি উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে মউ!

মউ ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, ও কিছু না। তুমি দেরি করো না। আমি কিচেনে যাচ্ছি।

সে চলে গেল। শান্তশীল দ্রুত ব্র্যান্ডি শেষ করে চাঙ্গা বোধ করল। পোশাক বদলে সে বাথরুমে ঢুকল। বাথরুমের দরজা বন্ধ করার প্রশ্ন ওঠে না। এটা ড্রয়িংরুম সংলগ্ন বাথরুম। আরেকটা আছে বেডরুম সংলগ্ন। ড্রয়িংরুমে এবং বেডরুমে দুটো টেলিফোন আছে। বেডরুমেরটার নাম্বার একান্তই প্রাইভেট এবং ডাইরেক্টরিতে ছাপা থাকে না। কোম্পানির ব্যাপারে এটা হটলাইন বলা যায়। ড্রয়িংরুমের ফোনটা বেজে উঠতে শুনল শান্তশীল। এত রাতে কার ফোন? বহরমপুর থেকে ট্রাঙ্ককল নাকি?

জ্বালাতন! জৈবকৃত্যের সময় বলেও নয়, প্রেমের দাম বড্ড বেশি আদায় করা হচ্ছে—শান্তশীল ইদানীং মউ সম্পর্কে এরকম ভাবে। অথচ মউকে ছেড়ে বাঁচবে না এমন একটা বিশ্বাসও তাকে ছুঁয়ে আছে যেন। মউকে সে সত্যিই ভালবাসে এবং মউও তাকে প্রকৃতই ভালবাসে, তা নিজের পদ্ধতি অনুসারে সে যাচাই করে নিয়েছে। তবে মউ অভিনেত্রী ছিল, গ্রুপথিয়েটার থেকে কমার্শিয়্যাল থিয়েটার এবং শেষে টেলিসিরিয়ালে চান্স পেয়ে মোটামুটি নাম করেছিল। হিন্দি ফিল্মে অফার এসেছিল। কেরিয়ারের সেই বাঁকে, জিরো

আওয়ারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই শান্তশীল তাকে আশ্চর্য দক্ষতায় করায়ত্ত করেছিল। কিংবা এটা প্রেমের চোরাবালিতে মউয়ের আকস্মিক পতন। অবশ্য শান্তশীলের পক্ষ থেকে কোনও বাধা ছিল না। অথচ মউ তাকে ছেড়ে এক পা কোথাও বাড়াতে চায়নি বা চায় না। কী অসামান্য সেই উচ্চারণ, 'বাইরে গেলে আমি নষ্ট হয়ে যাব!'

নাহ্, অভিনয় মনে হয়নি। শান্তশীলের মধ্যে মেলশোভিনিজম আছে, যা সে সাবধানে চাপা দিয়ে রাখে এবং মউয়ের মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের মানসিকতাসঞ্জাত আত্মসমর্পণের ঝোঁক আছে, শান্তশীলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তা লক্ষ্য করেছিল। আসলে শান্তশীলের উত্থান ধাপে ধাপে। অনেক ঘা খেয়ে, অনেক অপমান দাঁত চেপে সহ্য করতে করতে এবং অনেক শ্রম-বুদ্ধি-স্মার্টনেসের পরিণাম তার কেরিয়ারিস্ট জীবনের এই অবস্থান। সে নিজেকে মার্কিন ভঙ্গিতে বলে 'ইয়াপ্পি,—ইয়ং আরবান অ্যামবিশাস প্রোফেশনাল পার্সন। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে জেনিথ ওষুধ সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহক পদে বসা কেরিয়ারিস্ট মধ্যবিত্ত যুবকের পক্ষে একসময় তো অকল্পনীয় ছিল। এখন এটা হচ্ছে। 'তরুণ রক্ত' শিল্প-বাণিজ্য মহলে এখনকার শ্লোগান।

কিন্তু মউয়ের উত্থানে আছে পর পর কিছু আকস্মিকতা। সেটা স্বাভাবিক অভিনয় জগতে। হঠাৎ কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাই বেশি কাজ করে। মউ অভিনয়জগতের প্রভাবশালী কিছু লোকের চোখে পড়ে গিয়েছিল। তারা এখনও কেউ কেউ পিছু ছাড়েনি। কিন্তু শান্তশীলের ঝকমকে এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তাদের দমিয়ে দেয়।

টেলিফোনের রিং বন্ধ হয়েছিল। শান্তশীল দাঁত ব্রাশ করতে করতে (খাওয়ার আগেই এত রাতে দাঁত ব্রাশ করার কারণ আজ ভুবনেশ্বরের ফাইভস্টার হোটেলে এ কাজের সময় পায়নি) পর্দার এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে দেখল, মউ টেলিফোনে কথা বলছে। কণ্ঠস্বর চাপা। তাছাড়া তখনও কোমোডে জলের কলকল শব্দ। কিছু বোঝা গেল না।

শান্তশীল দাঁত ব্রাশ করে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে নিল। ভুবনেশ্বরের যে প্রান্তে তার কোম্পানির নতুন কারখানা এবং অফিস, সেখানে প্রচণ্ড ধুলো। লনের ঘাস বৃক্ষলতাগুল্ম ধুলোয় লাল। মার্চের শেষে জোরালো হাওয়া দূরের একটা টিলার গায়ের রাস্তা থেকে ক্রমাগত লাল ধুলো উড়িয়ে নিয়ে আসছিল। ম্যানেজার গোপাল দাস বলেছিলেন 'সাইট সিলেকশন ঠিক হয়নি। আমার বাংলোয় গেলে দেখবেন কী শোচনীয় অবস্থা! হোলি শেষ হয়নি হাঃ হাঃ হাঃ!'

তোয়ালেতে মুখ মুছে ক্রিম ঘষে শান্তশীল বেরিয়ে এল। ড্রয়িংরুমে

মউ নেই। খেয়ালবশে আর এক চুমুক ব্র্যান্ডি পান করে ধীরেসুস্থে সে কিচেন-কাম-ডাইনিংয়ে গেল। অবাক হালো, মউ নেই।

সে আস্তে ডাকল, মউ!

কোনও সাড়া পেল না। টেবিল থালা সাজানো আছে। জলের গ্লাস খালি। খাদ্যের সুদৃশ্য পাত্রগুলি ঢাকা। শান্তশীল বেডরুমের পর্দা তুলল। মউ নেই। ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে সন্দিগ্ধ করল এ মুহূর্তে। এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের পর্দা সরাল। দরজা বন্ধ। সে ডাকল, মউ!

সাড়া না পেয়ে দরজা খুলল। বাথরুমে মউ নেই। এক মিনিট? কিংবা তারও বেশি। শান্তশীল ড্রয়িংরুম থেকে আবার ডাইনিংয়ে ঘোরলাগা অবস্থায় ঘুরছিল। তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল ডাইনিং টেবিলে একটুকরো কাগজ রাখা। কাগজটা তখন তার সহজেই চোখে পড়া উচিত ছিল। পড়েনি। কাগজে খুব তাড়াতাড়ি করে লেখা আছে ঃ

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো। আমি আসছি। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেলেই ইন্দ্রকের তিনতলায় যাবে। ফিরে এসে সব বলল। ফেরা না হলে—

তোমার মউ

বাক্যগুলির সঠিক মানে বোঝার আগে তন্মুহূর্তের প্রতিক্রিয়ায় শান্তশীলের মুখ দিয়ে অশালীন একটা কথা বেরিয়ে গেল, ফাকিং হোর!

এমন কুৎসিত গাল মউকে সে আড়ালেও দেওয়ার কথা কল্পনা করেনি কোনও দিন। পরমুহূর্তে তার সম্বিৎ ফিরল। বাক্যগুলির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকাল। এ একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা। দুঃস্বপ্নের মতো।

অতর্কিতে মউয়ের নেপথ্যজীবন হিংস্র দাঁত বের করেছে যেন। আরও একটু পরে সে বুঝল, 'ফিরে এসে সব বলব' বাক্যটা দ্বিতীয় বাক্য 'আমি আসছি'-র পর লেখা উচিত ছিল। বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে গন্ডগোলটা ঘটেছে। কিন্তু 'ফেরা না হলে—'

মাই গুডনেস! শান্তশীল কাগজটা যেমন রাখা ছিল তেমনিই রেখে ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিল। ইদানীং সিগারেট কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এসময়ে সিগারেট জরুরি। সে ব্র্যান্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে ড্রয়িংরুমে এল। শান্তভাবেই অবস্থার মুখোমুখি হবে স্থির করল।

ইজিচেয়ারে বসে সে সিগারেট ধরাল। বুঝতে পারল না মউ কখন বেরিয়ে গেছে যে তখন থেকে তাকে পাঁচ মিনিট গুনতে হবে? পাঁচ···চার···তিন···দুই···এক এইভাবে জিরো আওয়ারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। এতক্ষণ জিরো আওয়ার হয় তো পেরিয়ে গেছে। আবার শান্তশীলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ফাকিং হোর!

কিন্তু 'তোমার মউ' কথাটা বুকের ভেতর নখের আঁচড় কাটছে টের পেল

সে। এই নাটকীয়তার অর্থ কী? ই ব্লকের তিনতলায় কার কাছে এভাবে ছুটে গেছে মউ? ওই ব্লকের কোনও বাসিন্দার সঙ্গে আলাপ নেই শান্তশীলের। মাসতিনেক আগে কোম্পানি তাকে এই অ্যাপার্টমেন্টটা দিয়েছে। তার আগে ক্যামাক স্ট্রিটের একটা পুরনো বাড়িতে ছিল। পদোন্নতির পর এখানে। সে সকাল ন'টায় বেরিয়ে যায়। ফিরতেও রাত প্রায় ন'টা-দশটা হয়ে যায়। মউ একা থাকে। তাই শান্তশীল কিছুক্ষণ অন্তর ফোন করে তাকে। বাড়িতে না থাকলে কাজের মেয়ে ললিতা ফোন ধরে জানায়, মেমসায়েব মার্কেটিংয়ে গেছেন। ললিতা ভোরে আসে এবং সন্ধ্যায় চলে যায়।

'মার্কেটিং'! ললিতা আর কিছু বলতে পারে না। শান্তশীল এতদিন তলিয়ে ভাবেনি। এখন তার কাছে স্পষ্ট, ওটা ললিতাকে মুখস্থ করানো একটা শব্দ মাত্র।

ঠিক আছে! পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এলে চরম বোঝাপড়া হবে।

কিন্তু 'ফেরা না হলে—'

নড়ে বসল শান্তশীল। ঘড়ি দেখল। এগারোটা পনেরো। জিরো আওয়ার নিশ্চয় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ই ব্লকটা কোনদিকে?

ড্যাম ইট! শান্তশীল সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে উচ্চারণ করল। সে রাত এগারোটা পনের মিনিটের পর ই ব্লকের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে না। কক্ষনো না। চুল খামচে ধরে সে বসে রইল।

এগারোটা কুড়ি মিনিটে সে সিকিউরিটি অফিসে টেলিফোন করল। আমি শান্তশীল দাশগুপ্ত। বি ব্লকের ৭ নম্বর অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে বলছি। ফার্স্ট ফ্লোর। প্লিজ পুট মি টু মিঃ রণধীর সিংহ। দিস ইজ আর্জেণ্ট।

সিকিউরিটি অফিসার রণধীর সিংহ এক্স-সার্ভিসম্যান। তাঁর সাড়া এল, বলুন স্যার!

ই ব্লকের সেকেণ্ড ফ্লোরে কি কিছু ঘটেছে? খোঁজ নিন তো!

জাস্ট এ মিনিট স্যার! দয়া করে একটু ধরুন!·· এক মিনিট পরে সাড়া এল। আমাদের লোক গেল। আপনার নম্বর জানাবেন?

শান্তশীল নম্বর বলল। তারপর আড়ষ্ট হাতে ফোন রাখল। আবার একটু ব্র্যাণ্ডি ঢেলে আনল গ্লাসে। চুমুক দিয়ে চোখ বুজল। হ্যাঁ, জীবনে এই ঘা খাওয়াটা সবচেয়ে জোরালো। সবচেয়ে অপমানজনক। এ অপমান সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের। কারণ একটি মেয়ে তাকে প্রতারিত করেছে এবং বিশ্বাসের উপর আঘাত হেনেছে।

কিছুক্ষণ পরে টেলিফোন বাজল। শান্তশীল তাড়াহুড়ো না করে টেলিফোন তুলল।

মিঃ দাশগুপ্ত? ব্লক বি, অ্যাপার্টমেণ্ট সেভেন?

হ্যাঁ। বলুন!

আমি রণধীর সিংহ বলছি। ই ব্লকের এক নম্বর লিফটের মধ্যে এক ভদ্রমহিলার বডি পাওয়া গেছে। তাঁকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে মারা হয়েছে। পুলিশকে জানানো হয়েছে। দুঃখিত মিঃ দাশগুপ্ত! আপনার সঙ্গে পুলিশ আসার আগেই আমার কথা বলা দরকার। আমি যাচ্ছি। ঠিক আছে?

কেন আমার সঙ্গে কথা বলা দরকার মিঃ সিংহ?

অন্যভাবে নেবেন না স্যার! কারণ আপনিই আমাকে ই ব্লকে খোঁজ নিতে বলেছিলেন।

হুঁ্যা। বুঝেছি। আসুন।

টেলিফোনে হাত রেখে বসে রইল শান্তশীল। সে ভাবতে চেষ্টা করল, এটা একটা বড় স্ক্যাণ্ডাল এবং এই স্ক্যাণ্ডাল তার কেরিয়ারের কোনও ক্ষতি করবে কি না! হুঁ্যা। প্রেম ট্রেমের চেয়ে বড় কথা, সে একজন 'ইয়াপ্পি' ··

তিন

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আটটা অব্দি ছাদের বাগান পরিচর্যার পর ড্রয়িংরুমে বসে কফি পান করতে করতে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছিলেন। সেই সময় ডোরবেল বাজল। একটু পরে তাঁর পরিচারক ষষ্ঠীচরণ একটা নেমকার্ড এনে বলল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এয়েছেন বাবামশাই!

কার্ডে লেখা আছে: এস সোম। মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ। জেনিথ ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড। ঠিকানাটা চৌরঙ্গি এলাকার। হুঁ, নামকরা ওষুধ সংস্থা। এদের কয়েকটা লাইফ-সেভিং ড্রাগ বিখ্যাত। দেশের সর্বত্র বিজ্ঞাপনের বিশাল হোর্ডিং দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্নেল বললেন, নিয়ে আয়।

তিরিশের কাছাকাছি বয়স, অমায়িক হাবভাব, সুদর্শন এক যুবক ঢুকে করজোড়ে নমস্কার করল। পরনে কেতাদুরস্ত টাইস্যুট এবং হাতে ব্রিফকেস। সে সোফায় বসে আস্তে শ্বাস ছাড়ল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। মানে, বাধ্য হয়েই এসেছি।

কর্নেল তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আপনার পুরো নাম বলুন প্লিজ!

শুভ্রাংশু সোম। থাকি লেকগার্ডেনসে। ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম আপনার কথা। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে—

তারপর নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছে যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কর্নেল হাসলেন। যাই হোক, বলুন।

তার আগে একটা অনুরোধ কর্নেল সরকার। প্লি-ই-জ। পুলিশকে

আমি এড়িয়ে থাকতে চাই। সেইজন্যই আপনার কাছে আসা। সব শুনলে বুঝতে পারবেন কেন আমি আড়ালে থাকতে চাইছি।

বলুন!

গতরাতে সানশাইন হাউজিং কমপ্লেক্সে আমার খুব পরিচিত এক ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন।

কর্নেল লক্ষ্য করলেন, কথাগুলিতে স্বাভাবিক উত্তেজনা ছাড়াও একটা আর্তির সুর স্পষ্ট। যদিও মুখের রেখায় উত্তেজনাই স্পষ্ট। অবশ্য কথাগুলি সে আস্তে উচ্চারণ করল এবং প্রত্যেকটা শব্দের পর বিরতি ছিল। কর্নেল বললেন, জায়গাটা কোথায়?

ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে। চারটে ব্লক নিয়ে হাউজিং কমপ্লেক্স। উচ্চমধ্যবিত্তরাই থাকেন। বেশির ভাগ বিগ কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ছোট কোম্পানির মালিকরাও—তো যিনি গতরাতে খুন হয়েছেন, তিনি আমার কোম্পানিরই নতুন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের স্ত্রী। নাম মধুমিতা দাশগুপ্ত। বিয়ের আগে অভিনয় করতেন স্টেজে এবং টি ভি ফিল্মে।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, কী ভাবে খুন হলেন ভদ্রমহিলা?

শুভ্রাংশু রুমালে মুখ মুছে বলল, ভেরি মিস্টিরিয়াস মার্ডার। মউ থাকে বি ব্লকে দোতলায় ৭ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে।

কর্নেল দ্রুত বললেন, মউ?

মধুমিতার ডাকনাম মউ। শুভ্রাংশুকে একটু নার্ভাস দেখাল। গতরাতে সাড়ে এগারোটায় নাকি ওর বডি পাওয়া যায় ই ব্লকের ১ নম্বর লিফটের ভেতর। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে মাথার ডানপাশে গুলি। আশ্চর্য ব্যাপার, নাইটগার্ড বা অ্যাপার্টমেন্টের কেউ নাকি গুলির শব্দ শুনতে পায়নি। অটোমেটিক লিফ্‌ট। তার চেয়ে আরও আশ্চর্য, মউয়ের স্বামী শান্তশীল ঠিক ওই সময় টেলিফোনে সিকিউরিটি অফিসারকে ই ব্লকে কিছু ঘটেছে কি না খোঁজ নিতে বলেন। সিকিউরিটির লোক গিয়ে মউয়ের বডি আবিষ্কার করে।

তখন লিফ্‌ট কোন ফ্লোরে ছিল?

সেকেণ্ড ফ্লোরে। ২নং লিফ্‌ট খারাপ। ১নম্বরটা চালু ছিল। সিকিউরিটির দু'জন গার্ড ১নং লিফ্‌ট দিয়ে সেকেণ্ড ফ্লোরে উঠতে চেয়েছিল। লিফ্‌ট নামতেই তারা মউয়ের বডি দেখতে পায়।

ষষ্ঠীচরণ রীতি অনুসারে কফি আনল। কর্নেল বললেন, কফি খান মিঃ সোম। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

শুভ্রাংশু কফির পেয়ালা তুলে বলল, তারপর পুলিশ যায় রাত বারোটা নাগাদ। বুঝতেই পারছেন সানশাইনের বাসিন্দারা সিনিক টাইপ। পরস্পর তত মেলামেশা নেই। তো—

কফি খান।

শুভ্রাংশু কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, এরপর অদ্ভুত ঘটনা সেকেন্ডে ফ্লোরের ১৩নং অ্যাপার্টমেন্টের এক ভদ্রলোককে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। তাঁর নাম চন্দ্রনাথ দেববর্মন। কী একটা মার্কেটিং রিসার্চ ব্যুরোর মালিক।

তাঁকে অ্যারেস্ট করল কেন?

দুটো লিফটই ১০নং অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। সেখানে থাকেন একজন ব্যবসায়ী। তাঁর অ্যালসেসিয়ান হঠাৎ নাকি খেপে গিয়ে দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কুকুরটা এমন করছে কেন তা বোঝার জন্য তিনি দরজার আইহোলে চোখ রাখেন। তিনিই চন্দ্রনাথবাবুকে দেখতে পান। ওঁর হাতে নাকি ফায়ার আর্মস ছিল। চন্দ্রনাথবাবুকে লিফটের সামনে থেকে দ্রুত চলে আসতে দেখেন।

সেই ব্যবসায়ীর নাম কী?

জানি না।

আপনি কিভাবে এইসব ঘটনা জানলেন?

কর্নেলের প্রশ্নে তীক্ষ্ণতা ছিল। শুভ্রাংশু আরও নার্ভাস মুখে বলল, আমি কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ মিঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে আজ সাতটায় দেখা করতে গিয়েছিলাম। সাড়ে সাতটায় ওঁর বাইরে যাওয়ার কথা। খুলে বলি। আমাকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে বদলি করা হয়েছে। বদলি ক্যান্সেল করানোর জন্য ওঁকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম। হি ইজ এ নাইস অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক পার্সন। হি লাইকস মি। কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথার লোক।

উনিই কি আপনাকে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন?

হ্যাঁ। শুভ্রাংশু কফিতে চুমুক দিয়ে ফের বলল, অবশ্য সংক্ষিপ্তভাবে বললেন। আরও অনেক গোপন ব্যাপার থাকতেই পারে, আমাকে যা বলার মতো নয়।

কর্নেল চুরুট অ্যাশট্রেতে রেখে দাড়ির ছাই ঝেড়ে বললেন, কিন্তু আপনি আগে থেকেই আমার কাছে আসতে চেয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না!

শুভ্রাংশু একটু চুপ করে থেকে বলল, গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করার শখ ছিল আমার। সেই সূত্রে মউয়ের সঙ্গে পরিচয়। খানিকটা হৃদ্যতার সম্পর্কও হয়েছিল। কিন্তু মউ ছিল হঠকারী টাইপের। একটু স্বার্থপরও ছিল। টি ভি সিরিয়ালে নাম করার পর আমাকে এড়িয়ে চলত। শেষে আমারই কোম্পানির নতুন চিফ এক্সিকিউটিভ মিঃ দাশগুপ্তকে বিয়ে করে বসল। কিন্তু না কর্নেল সরকার, মউয়ের সূত্রে আমি মিঃ দাশগুপ্তের কাছে কোনও সুযোগসুবিধা নিইনি! ওঁর সঙ্গে আমার সরাসরি সম্পর্ক ছিল।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, প্লিজ মেক ইট ব্রিফ!

সরি! শুভ্রাংশু পাংশুমুখে একটু হাসল। গত ২রা মার্চ রবিবার দুপুরে মউ হঠাৎ আমাকে ফোনে বলেছিল ও বিরাট ভুল করেছে। ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে ইত্যাদি। আমি কোনও মন্তব্য করলাম না। মউ তারপর আমাকে অবাক করে বলল, কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির ঠিকানা আমার জানা আছে কি না। বললাম কেন? মউ বলল, সে একজন ব্ল্যাক-মেলারের পাল্লায় পড়েছে। ফোনে সব বলা যাবে না। তারপর লাইন কেটে গেল। আমি রিং করলাম। কিন্তু রিং হতে থাকল। মউ ফোন ধরল না। পরের ফোন পেলাম ২২ মার্চ রাত ৮টা নাগাদ। মউ বলল, ব্ল্যাকমেলার এবার পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইছে। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় থাকে লোকটা? মউ বলল, হংকংয়ে থাকে। কিন্তু প্রায়ই কলকাতা আসে। সানশাইনে ওর এক বন্ধু আছে। তার কাছে আসে এবং সেখান থেকে মউয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ২৮ মার্চ রাত ৯টায় তাকে তার সেই বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে টাকাটা পেঁছে দিতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম, ব্ল্যাকমেল করে কী ব্যাপারে? মউ শুধু বলল, একটা ভিডিও ক্যাসেট। তারপর লাইন কেটে গেল। আমি আগের মতো রিং করলাম। কিন্তু আর মউ ধরল না।

কর্নেল অভ্যাসমতো টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, কিন্তু মউ গতরাতে খুন হয়ে গেছে বলছেন। ব্ল্যাকমেলারের সোনার হাঁস মারা পড়েছে। কাজেই আর ব্ল্যাকমেলের প্রশ্ন থাকছে না!

শুভ্রাংশু উত্তেজিতভাবে বলল, বাট হু কিলড্ মউ? হোয়াই? মিঃ দাশগুপ্ত গতকাল ভুবনেশ্বরে ছিলেন। ওঁর ফ্লাইট দেরি করায় প্রায় রাত পৌনে দশটায় নাকি দমদম এয়ারপোর্টে পেঁছান। সানশাইনে পেঁছাতে প্রায় আধঘণ্টা লাগার কথা। ওঁর অ্যালিবাই অবশ্য স্ট্রং। কিন্তু—

বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওঁর?

হ্যাঁ। তারপর নাকি মউ এখনই আসছি বলে বেরিয়ে যায়। মিঃ দাশগুপ্ত আমাকে শুধু এটুকু বলেছেন।

কর্নেল অ্যাশট্রে থেকে আধপোড়া চুরুট তুলে সযত্নে ধরালেন। বললেন, আপনি আমার কাছে ঠিক কী চাইছেন?

শুভ্রাংশু ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। বলল, কে মারল মউকে? কেন মারল? ব্ল্যাকমেলার নয়, এটুকু বলা যায়। তাই নয় কি কর্নেল সরকার? আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিঃ দাশগুপ্তের অ্যালিবাইয়ে কোনও ফাঁক আছে।

কর্নেল তার চোখে চোখ রেখে বললেন, পুলিশ তো কিলারকে ধরেছে!

আমার মনে হচ্ছে ভুল লোক। কোথায় একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। ই ব্লকের ১০ নম্বরের ব্যবসায়ী লোকটার কথায় পুলিশ ভুল পথে গেছে। আপনিই ঠিক লোককে ধরে দিতে পারেন। আমি জানি।

কীভাবে জানেন ? আমার ঠিকানা কে দিল আপনাকে ?

মউয়ের প্রথম ফোন পাওয়ার পর আমি একটা ডিটেকটিভ এজেন্সির খোঁজ পেয়েছিলাম। ফিনিক্স নাম। লাউডন স্ট্রিটে অফিস। ফিনিক্সের মিনিমাম ফি দশ হাজার। ওদের একজন—হ্যাঁ, প্রণয় মুখার্জি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বিনা পয়সায় মিস্ট্রি সলভ্ করেন এক ভদ্রলোক। তাঁর কাছে যান।

কর্নেল হাসলেন। প্রণয় বলছিল ? সে এখনও গোয়েন্দাগিরি করছে নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ওঁদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছে চালিয়াতির ব্যবসা।

কর্নেল আবার ঘড়ি দেখে বললেন, প্রণয় রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিগুলোতে রিটায়ার্ড পুলিশ আর এক্স-সার্ভিস ম্যানদেরই আড্ডা। তবে ওরা সুশ্রী মেয়েদের ট্রেনিং দিয়ে কাজে লাগায়।

শুভ্রাংশু কাঁচুমাচু মুখে বলল, কর্নেল সরকার ! বুঝতেই পারছেন আমার তেমন কিছু সামর্থ্য নেই। স্মল ফ্রাই। অথচ মউয়ের এই শোচনীয় মৃত্যু আমাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে।

কিন্তু তার স্বামী বিগ গাই ! কর্নেল হাসলেন। তাকে সব খুলে বলুন।

শুভ্রাংশুর ঠোঁটের কোণায় বিকৃতি ফুটে উঠল। মিঃ দাশগুপ্ত নিজেকে 'ইয়াপ্পি' বলেন !

ইয়াপ্পি ?

হ্যাঁ। ইউ নো দা টার্ম। আমার মনে হয়েছে, স্ত্রীর ব্যাপারে তত মাথাব্যথা নেই। খুব নির্লিপ্ত। তাই আমার সন্দেহ জেগেছে।

আপনি মউয়ের মুখে একটা ভি ডি ও ক্যাসেটের কথা শুনেছিলেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। শুভ্রাংশু চাপা গলায় বলল, যদিও আমি মউকে অতটা নিচে দেখার কথা ভাবতে পারছি না—মানে, কল্পনা করাও অসম্ভব, কিন্তু আমি তার কতটুকুই বা জানতাম ? মানি, কেরিয়ার এসব জিনিসের প্রতি তার লোভ তো ছিলই। আপনি বুঝতে পারছেন কী মিন করছি !

হুঁ ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট।

একজ্যাক্টলি ! নড়ে বসল শুভ্রাংশু। তবে এমনও হতে পারে মউকে ড্রাগের সাহায্যে—কর্নেল সরকার ! আজকাল এমন সব ড্রাগ বেরিয়েছে, যা খাইয়ে দিলে সে জানবে না কী করছে বা তাকে দিয়ে কী করানো হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি কিছু পড়াশুনা করেছি।

কর্নেল নেমকার্ডটা দিয়ে বললেন, এতে আপনার বাড়ির ঠিকানা নেই। পিছনে লিখে দিন। ফোন নাম্বার দিন। দেখা যাক কি করতে পারি।

শুভ্রাংশু তার ব্যক্তিগত ঠিকানা লিখে দিয়ে কুণ্ঠিত মুখে বলল, আমার কাঁধে মোটামুটি একটা বড় ফ্যামিলির বোঝা। তা না হলে—

হাত তুলে কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, প্রণয় ইজ রাইট মাই ডিয়ার ইয়ং-ম্যান! আমি ফি নিই না। আচ্ছা, আপনি আসুন। আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

শুভ্রাংশু আড়ষ্টভাবে বেরিয়ে গেল। কর্নেল আবার খবরের কাগজে মন দিলেন। সানশাইন হাউসিং কমপ্লেক্সে কোনও খুনখারাপির ঘটনা আজকের কাগজে নেই। গভীর রাতের ঘটনা। তাছাড়া নামী কোম্পানির প্রধান কার্য-নির্বাহী অফিসারের স্ত্রী। স্ক্যান্ডালের ভয়ে আপাতত চেপে দেওয়ার চেষ্টাও থাকা সম্ভব।

নটা দশ বাজে। সাড়ে নটায় বেহালায় গাঙ্গুলী নার্শারিতে পৌঁছনোর কথা। অভয় গাঙ্গুলী অপেক্ষা করবেন কর্নেলের জন্য। কয়েকটা বিদেশী ক্যাকটাস এসেছে নার্শারিতে।

উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। সানশাইন হাউসিং কমপ্লেক্সের ই ব্লকের ১ নং লিফটের ভেতর এক যুবতীর মৃতদেহ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। সুন্দরী তো বটেই। টেলিসিরিয়ালে নাম করেছিল।

এবং তাকে নিয়ে একটা ব্লু ফিল্ম!

টেলিফোনে গাঙ্গুলীমশাইকে জানিয়ে দিলেন কর্নেল, জরুরি কাজে আজ যেতে পারছেন না। তবে ক্যাকটিগুলো যেন বেহাত না হয়।

কর্নেল স্মৃতি থেকে শুভ্রাংশু সোমের বিবরণ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। তার ইন্টারেস্টের কারণ কি নিছক পুরনো প্রেম? মউকে মন থেকে মুছে দিতে পারেনি? মউয়ের স্বামী 'ইয়াপ্পি' বলে নাকি নিজেকে। আজকাল কোন যুবক 'ইয়াপ্পি' নয়? ব্যতিক্রম থাকতে পারে। কিন্তু শুভ্রর প্রকৃত ইন্টারেস্ট কি শুধু রহস্যটা জানা? জেনে কী লাভ? সে মউয়ের স্বামীকে যেন সন্দেহ করছে। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়িকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে।.....

চার

'মৃতেরা কথা বলে না!' হঠাৎ এই বাক্যটা মাথায় ভেসে এল শান্তশীলের। ড্রয়িংরুমের পাশের ঘরে একটা কম্পিউটারের সামনে বসে সে যন্ত্রের মতো কাজ করছিল। অফিসেরই কাজ। আজ এবং আগামীকাল তার অফিস যাওয়ার কথা ছিল না। মউকে নিয়ে বহরমপুর যেত। আগামীকাল ফিরে আসত অসুস্থ শ্বশুরমশাইকে নিয়ে। কিন্তু মউ মরে গেল।

এখন সাড়ে বারোটা বাজে। কিছুক্ষণ আগে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে তার হটলাইনে সংক্ষেপে জানিয়েছে ঘটনাটা। বলেছে, আপাতত তার কোনও সাহায্যের দরকার নেই। হলে তা অবশ্যই জানাবে। ভুবনেশ্বরের রিপোর্ট দুপুরের মধ্যেই তৈরী করে ফেলবে। দুটোর মধ্যে কেউ যেন এসে নিয়ে যায়।

সেই রিপোর্ট তৈরী করতে করতে অদ্ভুতভাবে লাইনটা মাথায় ভেসে এল, 'ডেডস ডু নট স্পিক।'

কোথায় পড়েছিল স্মরণ হলো না। দেওয়ালে পিকাসোর একটা প্রিন্টের দিকে তাকিয়ে রইল শান্তশীল। ছবিটা 'উইপিং উওম্যান'। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা এবং অসহায়তা চোখে বেঁধে। ছবি বোঝে না শান্তশীল। এটা কোম্পানিরই ডেকরেটারদের সাজিয়ে দেওয়া। এ মুহূর্তে কয়েকরকম রঙ এবং কালো মোটা রেখা ছাড়া ওই বোধটা ধরা দিল না তার চোখে। মউ বলতো, ছবিটা অসহ্য। সে কি ছবি বুঝত?

নাহ্। ফিল্মের ছবি ছাড়া অন্য কোনও ছবিতে মউয়ের আগ্রহ ছিল না। বেডরুমে সেই পপুলার টেলিসিরিয়ালের কয়েকটা স্টিল কালার প্রিন্ট বাঁধিয়ে রেখেছিল। ড্রয়িংরুমেও বড় করে বাঁধানো আছে একটা। সবই মউয়ের বিভিন্ন মুডের ফটোগ্রাফ। সেগুলো কিছুক্ষণ আগে নামিয়ে প্যাকেটে বেঁধে একটা আলমারির মাথায় রেখে দিয়েছে শান্তশীল। মউ হঠাৎ গতরাত থেকে একটা দুঃসহ স্মৃতি হয়ে গেছে তার কাছে। ব্যর্থতার স্মৃতি। কিংবা একটা পতনের ছবি।

'মৃতেরা কথা বলে না।' আবার ভেসে এল বাক্যটা। কাজের মেয়ে ললিতাকে আজ এবং আগামীকাল দু' দিনের ছুটি দেওয়া আছে। ললিতা কোথায় থাকে, জানে না শান্তশীল। জানার দরকার মনে করেনি। পরশু ললিতা এলে পুলিশকে জানানোর কথা আছে। পুলিশ তাকে জেরা করবে। কারণ চন্দ্রনাথ দেববর্মনের খুনের কোনও মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে না। ই ব্লকের কেউ কোনওদিন মউকে ওখানে দেখেনি বলেছে।

কিন্তু একমাত্র ললিতাই বলতে পারে মউয়ের গতিবিধির কথা। মউ মৃত। সে কথা বলবে না। কিন্তু তার হয়ে কথা বলার লোক নিশ্চয় আছে। প্রথম লোক ললিতা।

শান্তশীল আবার কম্পিউটারে মন দিতে গিয়ে বুঝল তার হাত ঠিক মতো কাজ করছে না। এ ঘরে সে সিগারেট খায় না। উঠে ড্রয়িংরুমে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ইজিচেয়ারে বসল। স্মৃতির দিকে পিছু ফিরতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে ঘুরল। ড্যাম ইট! জীবনে কতবার ভুল জায়গায় পা ফেলেছে। তারপর সামলেও নিয়েছে। কিন্তু এই ভুলটা একেবারে অন্যধরনের। খুবই অপমানজনক।

ডোরবেল বাজল। আবার পুলিশ নাকি? বিরক্ত হয়ে শান্তশীল দরজায় গেল। আইহোলে দেখল সিকিউরিটি অফিসার রণধীর সিংহ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে লম্বা চওড়া এক বৃদ্ধ—ফাদার খ্রিস্টমাস ধরনের চেহারা। বিদেশী বলে মনে হলো। কী ব্যাপার?

শান্তশীল দরজা খুলে বলল, বলুন মিঃ সিংহ!

রণধীর বললেন, ইনি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান স্যার! আপনাকে বিরক্ত করায় দুঃখিত। কিন্তু আমি নিরুপায়। যাই হোক, ইনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আমার সুপরিচিত।

শান্তশীল বলল, আসুন!

কর্নেল ভেতরে ঢুকলেন। রণধীর বললেন, আমি কাছাকাছি থাকছি কর্নেল সায়েব! আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

রণধীর স্যালুট ঠুকে চলে গেলেন। শান্তশীল দরজা বন্ধ করে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল কর্নেলকে। নিজে বসল ইজিচেয়ারে। কর্নেল ঘরের ভেতর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বসলেন। তারপর অমায়িক কণ্ঠস্বরে বললেন, আপনাকে এখন বিরক্ত করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

শান্তশীল আস্তে বলল, আপনি বাঙালী?

কর্নেল পকেট থেকে নেমকার্ড বের করে দিলেন।

শান্তশীল কার্ডটা পড়ে বলল, আপনি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল। তলায় ছাপানো আছে নেচারিস্ট। তো আমার কাছে কী? আমি নেচার-টেচার বুঝি না। আমি নেচার-লাভার নই। যাই হোক, বলুন!

আপানাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

কী বিষয়ে?

কর্নেল হাসলেন। নাহ্। নেচার বিষয়ে নয়। আপনার স্ত্রীর শোচনীয় হত্যাকাণ্ড—

তা নিয়ে আপনার মাথাব্যাথা কেন জানতে পারি?

আমি আপনার শুভাকাঙ্খী মিঃ দাশগুপ্ত!

ওটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়। আমার স্ত্রীর ব্যাপারটা পুলিশ দেখছে। আপনি কেন এতে নাক গলাতে চান? বলেই শান্তশীল সংযত হলো। সরি!

কর্নেল আস্তে বললেন, ৭ মার্চ হোটেল কণ্টিনেণ্টালে আপনার কোম্পানি একটা পার্টির আয়োজন করেছিল। যেখানে আপনি সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন।

শান্তশীল তাকাল। সো হোয়াট?

সেই পার্টিতে হংকংয়ের এক বড় ব্যবসায়ী রঙ্গনাথনের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল!

শান্তশীল কথাটা বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল। একটু পরে বলল, হয়ে থাকতে পারে। নামটা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ?

কর্নেল চুরুটকেস বের করে একটা চুরুট ধরালেন। তারপর একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, আপনি কি চান না আপনার স্ত্রীর কিলার ধরা পড়ুক ?

সে তো ধরা পড়েছে! শান্তশীল সোজা হয়ে বসল। কট উইদ দা মাড ারউইপন।

হ্যাঁ। চন্দ্রনাথ দেববর্মনের একটা পয়েণ্ট বাইশ ক্যালিবারের রিভলবার পাওয়া গেছে। লাইসেন্স্ড্ আমস। এক রাউণ্ড ফায়ার করেছিল সে, তা-ও সত্য। কর্নেল শান্তশীলের চোখে চোখ রেখে বললেন, কিন্তু মিঃ দাশগুপ্ত, মর্গের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, আপনার স্ত্রীর মাথার ভেতর যে গুলিটা আটকে ছিল, তা পয়েণ্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের রিভলভার থেকে ছোঁড়া থ্রি নট থ্রি বুলেট।

শান্তশীল উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উত্তেজনা দমন করে বলল, মর্গের রিপোর্টের কথা এখনও আমি জানি না। বাট নাও আই মাস্ট আস্ক দা কোয়েশ্চান, হু আর য়ু ?

কর্নেল একটু হাসলেন। সেটা ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ির কাছে জেনে নেবেন। তবে আমি আপনার শুভাকাঙ্খী।

শান্তশীল কর্নেলকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে একবার দেখে নিয়ে বলল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আমি বেশীক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করব না। এবার বলুন, ৭ মার্চ রাতে হোটেল কণ্টিনেণ্টালের পার্টিতে রঙ্গনাথন এবং আপনার স্ত্রীকে কি একান্তে কথা বলতে দেখেছিলেন ? স্মরণ করার চেষ্টা করুন প্লিজ !

শান্তশীল একটু ভেবে নিয়ে বলল, মউ—আমার স্ত্রী, টেলিসিরিয়ালে হিরো-ইন হিসাবে নাম করেছিল। সেই পার্টিতে শি ওয়াজ ন্যাচারালি অ্যান অ্যাট্রাক্-টিভ ফিগার। অনেকেই তার অটোগ্রাফ আর ছবি নিচ্ছিল। আর রঙ্গনাথন ? তিনিও মউয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পার্টিতে যেভাবে পরস্পর কথা বলে, সেইভাবে।

আচ্ছা মিঃ দাশগুপ্ত, এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বলুন।

পার্টি শেষ হওয়ার পর আপনার স্ত্রীর মধ্যে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন কি ?

শি ওয়াজ টায়ার্ড। ফেরার পথে বলেছিল, এ সব ন্যাস্টি ভিড় তার ভাল লাগে না। আর সে কোনও পার্টিতে যাবে না।

আর কিছু ?

নাহ্। আমি জানতাম তার অভিনয় জীবন যে কোনও কারণে হোক, আর ভাল লাগছিল না। বোম্বের হিন্দি ফিল্মওয়ালাদের অনেক বড় অফার সে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আপনার সঙ্গে কখন কোথায় মধুমিতা দেবীর প্রথম আলাপ হয় ?

শান্তশীল আস্তে শ্বাস ফেলে বলল, আমার কোম্পানির স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব একটা নাটক করেছিল। লাস্ট অক্টোবরে। তারিখ মনে নেই। ক্লাবের নাটকে হিরোইনের রোলে মউকে ওরা হায়ার করে এনেছিল। নাটকের আগে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান হয়। আমি ছিলাম চিফ গেস্ট। ওদের অনুরোধে আমাকে নাটকের শেষ অব্দি থাকতে হয়েছিল।

আপনি মধুমিতা দেবীর অভিনয় দেখে নিশ্চয় মুগ্ধ হয়েছিলেন ?

অস্বীকার করছি না। গ্রিনরুমে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করি। তাকে আমার নেমকাড ও দিয়েছিলাম।

শুভ্রাংশু সোমকে তো আপনি চেনেন!

শান্তশীল তাকাল। একটু পরে বলল, হ্যাঁ। নাইস চ্যাপ। আপনি চেনেন নাকি ওকে ?

কর্নেল সে-কথার জবাব না দিয়ে বললেন, বাই এনি চান্স শুভ্রাংশু কি মধুমিতা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে এসেছিল কোনওদিন ?

আমি বুঝতে পারছি না কেন এ কথা জানতে চাইছেন ?

প্লিজ অ্যানসার দিস কোয়েশ্চান!

ইজ ইট ইমপর্ট্যান্ট ইন দিস কেস ?

মে বি। আমরা অনেক সময়েই জানি না যে আমরা কী জানি।

শান্তশীল নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, শুভ্রাংশু কী একটা গ্রুপথিয়েটারেও অভিনয় করে। সেই দলে মউও অভিনয় করত একসময়। [illegible] মাচ আই নো— শুভ্রাংশু বলেছিল অবশ্য। তো হ্যাঁ, য়ু আর রাইট। শুভ্রাংশু মউকে সঙ্গে নিয়ে ওদের দলের স্যুভেনিরের বিজ্ঞাপনের জন্য বার দুই এসেছিল। এটা হতেই পারে সে মউ সম্পর্কে আমার দুর্বলতা টের পেয়েছিল। আমাকে এক্স-প্লয়েট করার উদ্দেশ্য থাকতেই পারে। কিন্তু আমি কোম্পানির ইন্টারেস্ট দেখি। বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতেই পারে। তবে কোনও এমপ্লয়ির এফিসিয়েন্সিই আমার কাছে একমাত্র বিবেচ্য। এনিওয়ে, ওদের স্যুভেনিরে আমার কোম্পানির ফুলপেজ বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছিলাম।

শান্তশীল হঠাৎ থেমে গেল। কর্নেল বললেন, চন্দ্রনাথ দেববর্মনের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে ?

নাহ্। মর্নিংয়ে ওকে জগিং করতে দেখেছি। একসময় আমারও অভ্যাস ছিল।

ডিলাক্স মার্কেটিং রিসার্চ ব্যুরোর সঙ্গে আপনার কোম্পানির যোগাযোগ আছে?

শান্তশীল কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল, ডিলাক্স মার্কেটিং রিসার্চ ব্যুরো—এ মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। তবে আমাদের নিজস্ব মার্কেটিং রিসার্চ সেকশন আছে। তারা অনেকক্ষেত্রে বাইরেকার হেল্প নেয়। খোঁজ নেব। কেন?

আচ্ছা মিঃ দাশগুপ্ত, আপনার স্ত্রীর পার্সোন্যাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট থাকার কথা!

শান্তশীল কর্নেলের দিকে তাকাল। একটু পরে বলল, এটা কি একটা প্রশ্ন হলো কর্নেল সরকার?

মিঃ দাশগুপ্ত, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তার মানে, আপনি আপনার স্ত্রীর শোচনীয় মৃত্যুর পর নিশ্চয় তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টের কাগজপত্র দেখেছেন। কিছু সন্দেহজনক লেনদেন ওতে লক্ষ্য করেছেন কি না, সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য।

শান্তশীল একটু উত্তেজিতভাবে বলল, মউ টেলিসিরিয়ালে এবং ছোটোখাটো অনেক ফিল্ম থেকে তত বেশী টাকা পায়নি। কিন্তু ওর কাঁধে একটা বোঝা ছিল। বহরমপুরে ওর বাবা-মা থাকেন। দুই ভাই আর এক বোন থাকে। আমার শ্বশুরমশাই রিটায়ার্ড করে ওখানেই বাড়ি করেছেন। আমি কখনও যাইনি সেখানে। আজ দুজনে যাওয়ার কথা ছিল। শ্বশুরমশাই অসুস্থ—বলে সে দম নিল। জোরে শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, হ্যাঁ। মউয়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আমি দেখেছি।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, গত দু-তিন মাসে মোটা অঙ্কের টাকা ড্র করেছিলেন কি মধুমিতা?

মোটা অঙ্ক মানে দু'বার দশ হাজার টাকা তুলেছিল। ফেব্রুয়ারি এবং এ মাসে। এটা স্বাভাবিক। শ্বশুরমশাই গতমাস থেকে অসুস্থ।

এখন একজ্যাক্ট ব্যালান্স কি পঞ্চাশ হাজারের ওপরে? নাকি নিচে?

শান্তশীল হতাশ ভঙ্গীতে বলল, দিস ইজ টু মাচ! পুলিশও আমাকে এত প্রশ্ন করেনি। দে নো মাই সোশ্যাল স্ট্যাটাস! মাই পজিশন! অ্যাণ্ড য়ু আর আস্কিং মি দিজ ননসেন্স কোয়েশ্চানস! কে আপনি তাও এক্সপ্লেন করছেন না। আপনি কি ব্ল্যাকমেল করতে এসেছেন আমাকে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ। ব্ল্যাকমেল ইজ দা রাইট ওয়ার্ড মিঃ দাশগুপ্ত! আপানার স্ত্রীকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছিল।

শান্তশীলের চোখে একমুহূর্ত চমক ঝিলিক দিল। তারপর শান্তভাবে বলল, প্লিজ এক্সপ্লেন ইট—ইফ সো মাচ য়ু নো।

আমার ধারণা, আপনার স্ত্রীর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স পঞ্চাশ হাজারের অনেক নিচে।

থার্টি সিক্স মতো। কিন্তু কে মউকে ব্ল্যাকমেল করছিল? কেন করছিল? করলে আমাকে সে গোপনই বা করবে কেন? আমার ক্ষমতা সে জানত। শান্তশীল দ্রুত একটা সিগারেট ধরাল। হ্যাঁ—তার অতীত জীবনে স্ক্যান্ডালাস কিছু থাকতেই পারে। আমি জানি অভিনেত্রীদের অনেকের জীবনে কী সব ঘটে থাকে। মউ ভালই বুঝত, আমি তার আগের জীবন নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে রাজী নই। আই অ্যাম এ মর্ডান ম্যান অ্যান্ড শি নিউ ইট ওয়েল।

মিঃ দাশগুপ্ত! তবু আপনি একজন পুরুষমানুষ। চূড়ান্ত মর্ডান হয়ে ওঠা ওয়েস্টেও কোনও পুরুষমানুষ তার স্ত্রীকে নিয়ে তোলা ব্লু ফিল্ম বরদাস্ত করতে পারে না—দ্যাট আই ক্যান অ্যাসিওর। আপনি আফটার অল ভারতীয়।

ব্লু ফিল্ম বললেন? শান্তশীল ভুরু কুঁচকে তাকাল।

হ্যাঁ ব্লু ফিল্ম।

য়ু মিন, মউকে নিয়ে তোলা ব্লু ফিল্ম?

ধরুন তা-ই।

সরি কর্নেল সরকার! আমি বিশ্বাস করি না। ক্ষমা করবেন, এ সব উদ্ভট কথাবার্তা শোনার সময় আমার নেই। আমার হাতে জরুরি কাজ আছে। দেড়টা বাজে।

শান্তশীল উঠে দাঁড়াল। কর্নেল অগত্যা উঠলেন। তারপর দেওয়ালে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, ওখানে একটা বড় ছবি ছিল সম্ভবত। আপনার স্ত্রীর ছবি হতেই পারে। হ্যাঁ, ওই টেবিলে একটা ছিল। চিহ্ন লক্ষ্য করছি। স্ত্রী। স্মৃতি আপনার পক্ষে আপাতত অসহনীয় হতেই পারে। তবে শিগগির ভুলেও যাবেন। থ্যাঙ্কস্। চলি।

শান্তশীল নিষ্পলক তাকিয়ে শুনছিল। কর্নেল বেরিয়ে যাওয়ার পর এগিয়ে গিয়ে জোরে দরজা বন্ধ করল।…

পাঁচ

সিকিউরিটি অফিসার রণধীর সিংহ একটা ফুলে ভরা গুলমোহরের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর হাতে ওয়াকিটকি। কার সঙ্গে ওয়াকিটকিতে কথা বলছিলেন। কর্নেলকে দেখে কথা বন্ধ করে স্যালুট করলেন। তারপর কর্নেল কাছে গেলে আস্তে বললেন, কথা হলো?

কর্নেল বললেন। স্ট্রং নার্ভের মানুষ। সত্যিই ইয়াপ্পি।

ওঁর অ্যালিবাইও স্ট্রং। কিন্তু চিন্তা করুন স্যার! স্ত্রী অমন একটা সাংঘাতিক চিঠি লিখে গেছেন। অথচ উনি নিজে খোঁজ নিতে না গিয়ে আমাকে

ফোন করেছিলেন। পুলিশ যাই বলুক, আমার খটকা লেগে আছে। চিঠিটা সম্পর্কে কী বললেন উনি?

চিঠিটার কথা তুলিনি। বলে কর্নেল চারিদিকটা দেখে নিলেন। ই ব্লক কোনটা?

ওই তো! বি ব্লকের পেছনে। পাশে একটা ছোট পুকুর আছে। একসময় পুরো তিন একর জলা ছিল। ভরাট করে এই হাউজিং কমপ্লেক্স গড়া হয়েছিল। পুকুরটা তার চিহ্ন।

চলুন। স্পটটা একটু দেখে যাই।

এ এবং বি ব্লকের মাঝখানে একটা সংকীর্ণ রাস্তা। দুধারে কেয়ারি করা গুল্মলতা। রাস্তাটা গিয়ে বেঁকেছে একটা পাঁচতলা বাড়ির সামনে। সুদৃশ্য এ-কালীন স্থাপত্য। তবে অন্য ব্লকের বাড়িগুলোর চেয়ে এটা ছোট। বোঝা যায়, পুকুরটা টিকিয়ে রাখার প্ল্যান বাড়িটাকে ছোটো করেছে। দুজন সিকিউরিটি গার্ড উর্দি পরে ঘাসে বসেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিল। একটা বিশাল নাগকেশরের গাছ ছায়া ফেলেছে সামনের লনে।

কর্নেল বললেন, এটা শেষ প্রান্ত?

রণধীর বললেন, হ্যাঁ স্যার! ওই দেখুন বাউণ্ডারি ওয়াল। কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে আসা যায় না। দেওয়াল যথেষ্ট উঁচু এদিকটায়।

দেওয়ালের ওপারে কি আছে?

মাছের ভেড়ি। কাজেই খুনী বাইরের লোক হতেই পারে না। আপনাকে আগেই বলেছি রাত ন'টার পর সিকিউরিটি চেকিং ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না সানশাইনে। এদিকে আসুন।

বাড়ির নিচের তলায় গাড়ির গ্যারাজ এবং পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। একপাশে দুটো লিফ্‌ট। লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে কর্নেল চারদিক দেখছিলেন। মাত্র দুটো গাড়ি। তেরপলের কভারে একটা গাড়ি ঢাকা। অন্যটার গায়ে হেলান দিয়ে উর্দিপরা ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। সে আপন মনে খৈনি ডলছিল।

রণধীর বললেন, ২নং লিফ্‌ট আগামী কাল সারাতে লোক আসবে। আজ এসেছিল। কিন্তু পুলিশ তাদের কাজ করতে দেয়নি।

১নং লিফ্‌ট ওপরে তিনতলায় আছে। কারণ ২নম্বরে লাল আলো। কর্নেল বোতাম টিপলেন। লিফ্‌ট নেমে এল। রণধীর বললেন, একটুখানি রক্ত ছিল, ধুয়ে ফেলা হয়েছে। মিসেস দাশগুপ্তের মাথার ডানদিকে গুলি করা হয়েছিল। লিফটের বাঁ-কোনায় কাত অবস্থায় বডি ছিল। সেকেণ্ড ফ্লোর?

কর্নেল মাথা দোলালেন।

তিনতলায় লিফ্‌ট থেকে বেরিয়েই কর্নেল লিফটের দিকে তাকালেন। সেই সময় উল্টোদিকের ঘরে কুকুরের গর্জন শোনা গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে

কর্নেল বাইনোকুলারে খুঁটিয়ে লিফটের ওপরটা, দুই পাশ এবং নিচের অংশ লক্ষ্য করলেন। তারপর বাঁদিকে সিঁড়ির কাছে গেলেন। দেওয়ালে চৌকো সিমেন্টের ঝরোকা। ফাঁক দিয়ে বিশাল ভেড়ি চোখে পড়ে। ঝরোকার একটা ফাঁকে ইঞ্চিটাক জায়গা খসে গেছে। কর্নেল তিন ধাপ নেমে সেখানটা ছুঁলেন।

রণধীর বললেন, কী দেখছেন স্যার?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, মিঃ দেববর্মন সত্যিই এক রাউণ্ড ফায়ার করেছিলেন। তাঁর ফায়ার আমসের গুলি এখান দিয়ে বেরিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। তার মানে, খুনীকে তিনি সত্যিই সিঁড়ি দিয়ে পালাতে দেখেছিলেন।

কিন্তু ১০ নম্বরের অগ্রবালজি কোনও গুলির শব্দ শোনেননি!

কুকুরের গর্জন। তাছাড়া তাঁর মন ছিল কুকুরের দিকে। ওই তো শুনছেন! আমার মতে কুকুরটার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো দরকার। ভদ্রলোককে বলবেন।

রণধীর গম্ভীরমুখে বললেন, বলব।

অগ্রবালজির কীসের কারবার জানেন?

ল্যাক এক্সপোর্ট করেন শুনেছি। আপনি ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে—

নাহ্‌ কুকুরটা বড্ড বাজে। নিশ্চয় কোনো অসুখে ভুগছে। আর কুকুর সম্পর্কে আমার অ্যালার্জি আছে।

রণধীর হাসলেন। আমি কিন্তু ডগ-লাভার সোসাইটির মেম্বার স্যার।

কর্নেল সিঁড়ি থেকে উঠে করিডর ধরে এগিয়ে গেলেন। করিডর বাঁক নিয়ে শেষ হয়েছে ১৩ নং অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। নেমপ্লেটে লেখা আছে সি এন দেববর্মন। বাঁদিকেরটায় লেখা মিসেস আর খুরশিদ। ডানদিকেরটাতে প্রোফেসর এস কে রায়, এম. এ, পি. এইচ ডি। লকে একটা কালো প্লেট ঝোলানো। তাতে লেখা আছে 'প্লিজ ডোণ্ট ডিসটার্ব।'

কর্নেল ভাবছিলেন চন্দ্রনাথ দেববর্মনের স্টেটমেণ্টের কথা। অরিজিৎ লাহিড়ির মুখে সেটা শুনেছেন। মিলে যাচ্ছে। চন্দ্রনাথ মিথ্যা কিছু বলেননি। কিন্তু মউ কেন তাঁকে টেলিফোন করেছিল এবং কেনই বা ছুটে এসেছিল প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে—তাঁকে বাঁচাতে? এই জটটা ছাড়ানো যাচ্ছে না। চন্দ্রনাথ তাকে নাকি চিনতেনই না। বলেছেন, দেখে থাকতে পারি, আলাপ ছিল না।

রণধীর বললেন, পুলিশ মিঃ দেববর্মনের ঘর সিল করে গেছে।

হুঁ। দেখতে পাচ্ছি। তো এই প্রোফেসর ভদ্রলোকের বয়স কত—আনুমানিক?

ওঁকে খুব কম দেখেছি। ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই হবে। খুব দাম্ভিক টাইপ।

একা থাকেন?

না স্যার! ওঁর স্ত্রী সানশাইন কালচারাল কমিটির সেক্রেটারি। নাচ গান

নাটক এসব নিয়ে থাকেন। এ ব্লকে কালচারাল কমিটির অফিস। এখন ঘরেই থাকার কথা। আলাপ করবেন ?

কর্নেল কালো প্লেটটার দিকে আঙুল তুলে সকৌতুকে চাপাস্বরে বললেন, প্লিজ ডোণ্ট ডিসটার্ব।

এই সময় বাঁদিকে মিসেস খুরশিদের ঘর থেকে জিনস ব্যাগি শার্টপরা এক তরুণ বেরুল। হঠাৎ দেখলে সাহেব মনে হয়। সে কর্নেলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রণধীরকে বলল, হাই সিনহা !

হাই কুমরো !

সে হাসল। মাই গ্র্যাণ্ডমা ইজ ওয়েট।

ও নটি বয় ! শি ইজ অ্যান অনারেবল লেডি, মাইণ্ড দ্যাট !

ম্যান ! য়ু আর কিলিং লাভ্‌লি গার্লস—হোয়াটস হার নেম, আই থিংক্ শি ওয়াজ আ ফিল্মস্টার—ইজ ইট ? ও কে ! বাই !

সে চলে গেল শিস দিতে দিতে। রণধীর বিকৃত মুখে বললেন, ডার্টি জেনারেশন !

মিসেস খুরশিদ পার্শি মহিলা।

হ্যাঁ স্যার ! বড় ব্যবসা আছে। ছেলেরা চালায়। বৃদ্ধা মাকে এখানে রেখেছে। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা তাঁর দেখাশুনা করেন।

কর্নেল ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, আশ্চর্য তো !

কী স্যার ?

কলকাতার পার্শিরা নিজস্ব এরিয়া গড়ে নিয়েই বাস করেন। তাঁদের নিজস্ব সোসাইটি আছে। অথচ এখানে এই বৃদ্ধা মহিলাকে নির্বাসনের মতো রাখা হয়েছে কেন ? উনি চলাফেরা করতে পারেন ?

হুইলচেয়ারে চলাফেরা করেন। পায়ের অসুখ আছে।

আমরা এবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাব।

ও কে।

সিঁড়িতে নামতে নামতে কর্নেল বললেন, সিঁড়ি ধোয়া হয়েছে মনে হচ্ছে ?

হ্যাঁ স্যার ! তবে গত রাতে আমি নিজে থরো চেক করেছিলাম। পুলিশও করেছিল। সিঁড়িতে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। নাথিং।

ফার্স্ট ফ্লোরটা একটু দেখতে চাই।

এ ফ্লোরে কোনও অ্যাপার্টমেণ্ট নেই। ন'টা ঘর আর একটা কমন বাথরুম আছে। সারভ্যাণ্টস রুম। কোনওটাতে কারও ড্রাইভারও থাকে। আসলে অফিস হিসেবে ভাড়া দেওয়ার প্ল্যান ছিল। কিন্তু কর্পোরেশন হাউজিংয়ের প্ল্যানই স্যাংশন করেছে। কাজেই—

বুঝেছি।

নিচের লনে পেঁছে রণধীর বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার লাঞ্চ আমার কোয়ার্টারে সেরে নিলে কৃতার্থ হব।

থ্যাঙ্ক্‌স্‌! আরেকদিন হবে। আজ চলি।

গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রণধীর বললেন, আমাকে একটু মনে রাখবেন স্যার! তাই অ্যাম নট ফিলিং ওয়েল হিয়ার।

বুঝতে পারছি।

রাতের ঘটনার পর সিকিউরিটি কঠোর করা হয়েছে। বড় রাস্তায় একটা পুলিশভ্যানও দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেলকে খাতায় ফের নাম সই করে ডিপারচার টাইম লিখে বেরুতে হলো। কয়েক পা এগিয়েই একটা ট্যাক্সি পেলেন। কোনও খালি ট্যাক্সি এ পর্যন্ত তাঁকে না করে না।

ইলিয়ট রোডে তিনতলায় নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরলে ষষ্ঠী বলল, নাল-বাজারের নাহিড়িসায়েব ফোং করতে বলেছেন।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, করছি ফোং। তুই খাবার রেডি কর।

টেলিফোনে অরিজিৎকে পেয়ে বললেন, নতুন কিছু ঘটেছে?

রঙ্গনাথনকে ট্রেস করেছি।

কোথায়?

হোটেল কণ্টিনেন্টালে। তবে নজর রাখা হয়েছে মাত্র।

কত নম্বরে?

সুইট নাম্বার ১২৭। সিক্সথ ফ্লোর। আমি বলি কী, প্রথমে আপনি গিয়ে কথা বলুন।

ঠিক আছে। শোনো! সানশাইনে গিয়েছিলাম। এখনই ফিরছি।

খবর পেয়েছি। কিছু পেলেন নাকি?

নাহ্‌।

ওঃ ওল্ড বস! হাতের কার্ড এখন শো করবেন না জানি। ও কে!

আমি ক্ষুধার্ত, ডার্লিং!

সরি। ছাড়লাম···

খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে ড্রয়িংরুমে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন। শান্তশীলকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল কেন সে অমন সাংঘাতিক চিঠি পেয়েও নিজে ছুটে যায়নি ই ব্লকে এবং সিকিউরিটি অফিসারকে বলেছিল খোঁজ নিতে?

সন্দেহের তালিকায় এখন সে এক নম্বরে উঠে এল। চিঠিটা পাওয়ার পর ছুটে গিয়ে বউকে গুলি করে মেরে ভালমানুষ সেজে সে সিকিউরিরিটিতে ফোন করে থাকবে। তার কোনও লাইসেন্স্‌ড্‌ আর্মস নেই, তা ঠিক। কিন্তু তার বউ প্রাক্তন ফিল্মস্টার। চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ থাকতেই পারে। মেলশোভিনিস্ট টাইপের ইয়াপ্পি। সুন্দরী মেয়েদের সে কেরিয়ারের অংশহিসেবেই করায়ত্ত

করতে পারে এবং গণ্য করতে পারে এও এক অর্জিত সম্পদ বলে।

তার ড্রাইভার আক্রাম বলেছে, সকালে সায়েব-মেমসায়েবের বহরমপুর যাওয়ার কথা ছিল। এটা অবশ্য শান্তশীলের একটা চাল হতেও পারে। ভুবনেশ্বরে বসেই বউকে কোনও ছলে খুন করার প্ল্যান ছকে থাকতেও পারে।

শুধু ওই চিঠিটা—

কিন্তু হঠাৎ চিঠিটা শান্তশীলকে খুন করার দৈবাৎ সুযোগ দেয়নি তো? মার্ডার-উইপন পাঁচিলের পিছনে ছুঁড়ে ফেললেই ভোঁড়ির অগাধ জলে তলিয়ে যাবে।

কর্নেল চোখ বুজে টাকে হাত বুলোচ্ছিলেন। একসময় চোখ খুললেন। নাহ্। ইয়াপ্পিরা খুন-খারাপির পথে কদাচ হাঁটে না। এ যুগের এক প্রজন্মের এই বিচিত্র মানসিকতা! তা শুধু পেশাগত দক্ষতাকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার অবলম্বন গণ্য করে। পেশাগত দক্ষতাই তার মূলধন। আগের দিনের নিষ্ঠাবান কারিগরদের মতো সে ক্রমাগত কুশলী হতে চায়।

শান্তশীল বলছিল ভুবনেশ্বরের রিপোর্ট তৈরি করতে ব্যস্ত সে। এটাই প্রকৃত ইয়াপ্পির চরিত্রলক্ষণ। নাহ্। কর্নেলের চোখে এযাবৎকাল দেখা অতি-অতি ধূর্ত খুনীর আদলও মেলানো যায় না এক ইয়াপ্পির মুখ।

সন্দেহের তালিকা থেকে নেমে গেল শান্তশীল।

এবার প্রশ্ন, চন্দ্রনাথ কি সত্য কথা বলেছেন পুলিশকে? যাকে চেনেন না, সে কেন তাঁকে বাঁচানোর জন্য অত ঝুঁকি নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে যাবে?

চন্দ্রনাথের জামিন পেতে অসুবিধে হবে না। কোটিপতি লোক। তাছাড়া পাবলিক প্রসিকিউটার পুলিশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জামিনে আপত্তি করবেন না সম্ভবত। তিনি আপত্তি না করলে ম্যাজিস্ট্রেটরও আপত্তির কথা নয়। চন্দ্রনাথ শিগগির জামিন পেলেই ভাল হয়। তাঁর সঙ্গে কথা বললে কোনও সূত্র মিলতেও পারে। তার আগে—

কর্নেল টেলিফোন তুলে হোটেল কন্টিনেন্টালে ডায়াল করলেন। মহিলা রিসেপশনিস্টের মিঠে গলা ভেসে এল। কর্নেল বললেন, প্লিজ পুট মি টু স্যুইট নাম্বার ওয়ান টু সেভেন।

প্লিজ হোল্ড অন, স্যার।

ওকে!

কিছুক্ষণ পরে রিসেপশনিস্ট বলল, সরি স্যার! রিং হচ্ছে কেউ ধরছেন না।

কর্নেল ফোন রেখে উঠে দাঁড়ালেন। পোশাক বদলাতে গেলেন পাশের ঘরে।…

ছয়

হোটেল কণ্টিনেণ্টাল নতুন পাঁচতারা হোটেল। কর্নেল লাউঞ্জে ঢুকে দেখলেন ইতস্তত সাজিয়ে রাখা সুদৃশ্য আসনে নানা বয়সের পুরুষ এবং মহিলা বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে সাদা পোশাকে পুলিশও থাকার কথা। পাশে কাচের দেওয়ালের ওধারে বার। রিসেপশন কাউণ্টারে সায়েব-মেমসায়েবদের দঙ্গলও ছিল। কর্নেল গিয়ে এক মহিলা রিসেপশনিস্টকে মৃদুস্বরে বললেন, সুইট নাম্বার ওয়ান টু সেভেনে মিঃ রঙ্গনাথনের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

জাস্ট আ মিনিট স্যার! বলে মহিলা পিছনে বোর্ড দেখে নিলেন। তারপর ফোন তুলে ডায়াল করলেন। একটু পরে বললেন, রিং হয়ে যাচ্ছে।

উনি বেরিয়ে যাননি তো?

না স্যার! বেরিয়ে গেলে কি বোর্ডে চাবি দেখতে পেতাম।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, উনি ডাইনিংয়ে থাকতে পারেন কি?

সম্ভবত না। এক মিনিট প্লিজ! ফোনে কান রেখে তরুণী রিসেপশনিস্ট পাশের এক যুবককে বলল, সুজিত! মিঃ রঙ্গনাথনের ঘরে কি লাঞ্চ পাঠানো হয়, নাকি উনি ডাইনিংয়ে খেতে আসেন? আমি তো জানি উনি ডাইনিংয়ে খেতে আসেন না। তা ছাড়া এখন—সরি! সাড়ে তিনটে বাজে।

যুবকটি কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল, মিঃ রঙ্গনাথন জানিয়েছিলেন লাঞ্চ পাঠাতে হবে না শরীর ভাল না।

কখন জানিয়েছিলেন?

কিছুক্ষণ আগে। আপনি কি ওঁর পার্টনার?

হ্যাঁ। বলে কর্নেল নিজের নেমকার্ড দিলেন।

রিসেপশনিস্ট ফোন নামিয়ে রেখে অন্য কাজে মন দিল। যুবকটি বলল, মিঃ রঙ্গনাথন মর্নিংয়ে বেরিয়েছিলেন। এগারোটা নাগাদ ফিরে আমাকে বলে যান শরীর খারাপ। কেউ এলে যেন ওঁর ঘরে পাঠিয়ে দিই। আপনি যেতে পারেন। সিক্সথ ফ্লোর। ওয়ান টু সেভেন।

কর্নেল লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন। লিফটের সামনে ছোট্ট লাইন ছিল। লিফট ছিল এইট্থ ফ্লোরে। এবার নামতে শুরু করেছে। কর্নেলের পিছনে একজন এসে দাঁড়াল। কর্নেল ঘুরে দেখেই হাসলেন। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর বিমল হাজরা। হাজরা খুব আস্তে বললেন, সামথিং রং স্যার। বলছি খন।

সিক্সথ ফ্লোরে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে হাজরা বললেন, এক ঘণ্টা আগে

আমিও মিট করতে চেয়েছিলাম। রিসেপশানিস্ট বলল, রিং হচ্ছে। ফোন ধরছে না কেউ। আপনি না এলেও এবার আমি চেক করতাম।

১২৭ নম্বর সুইটের দরজায় ল্যাচকি সিস্টেম। হাজরা দরজায় নক করলেন। কোনও সাড়া এল না। আবার কিছুক্ষণ নক করলেন। সাড়া এল না। পাশ্চিম রীতি মেনে চলা হয়েছে সুইটে। কোনও ডোরবেল নেই। এই হোটেলে বিদেশীরাই এসে থাকেন। বেশির ভাগ লোক ব্যবসায়ী।

কর্নেল বাধা দেওয়ার আগেই উত্তেজিত হাজরা ল্যাচকিয়ের হাতল ঘোরালেন। দরজা খুলে গেল। তাহলে খোলাই ছিল দরজা!

প্রথমে বসার ঘর। পিছনে কাশ্মীরি নকশাদার কাঠের পার্টিশান। তার ওধারে চওড়া বিশাল বেডরুম। জানালার দিকে ভারি পর্দা। মেঝেয় পা দেবে যাওয়া কার্পেট। ইজিচেয়ার। কোণায় একটা বড় টি ভি।

বিছানার ওধারে মেঝেয় রক্তিম কার্পেটের ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে মধ্যবয়সী বেঁটে একটা লোক। পরণে টাইস্যুট, পায়ে জুতো। শ্যামবর্ণ লোকটার মুখে পুরু গোঁফ আছে। তার ঝাঁকড়া চুল রক্তে লাল। কর্নেল ঝুঁকে দেখে নিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে মাথার ডানদিকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করা হয়েছে মিঃ হাজরা। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। রিসেপশনের নাম্বার ফোনের চার্টে পেয়ে যাবেন। নিজের পরিচয় দিয়ে ম্যানেজারকে আসতে বলুন। না—অন্য কোনও কথা নয়। শুধু বলুন, এটা আর্জেন্ট।

হাজরা বিছানার পাশে নিচু টেবিলে রাখা ফোনের কাছে বসলেন। ডায়াল করলেন।

কর্নেল ঘরের ভেতরটা দেখছিলেন। মেঝের কার্পেট জায়গায় জায়গায় এলোমেলো হয়ে আছে। রক্তের ছোপ লক্ষ্য করতে করতে বসার ঘরে গেলেন। সোফায় রক্তের ছিটে আছে। কথা বলতে বলতে লোকটাকে খুনী গুলি করেছে। তারপর টানতে টানতে বেডরুমের ওপাশে নিয়ে গেছে।

হাজরা তাঁর পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে করিডরে দাঁড়ালেন। কর্নেল মেঝে থেকে একটা নেমকার্ড কুড়িয়ে নিলেন। 'রঞ্জন রায়। ভিডিওজোন। ২৮/সি সাউদার্ন রো, কলকাতা-১৭।' ওপরে ডানকোণে একটা টেলিফোন নম্বর। টেবিলে একটা হুইস্কির বোতল। বিদেশী হুইস্কি। দুটো গ্লাস কাত হয়ে মেঝেয় পড়ে আছে। কর্নেল নেমকার্ডটা পকেটে ভরে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাথরুমে কেউ নেই।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে ম্যানেজার এলেন। লম্বা সুদর্শন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। মুখে প্রচণ্ড উদ্বেগ থমথম করছে। এনিথিং রং স্যার?

হাজরা তাঁকে ইশারায় ঘরে আসতে বললেন। তারপর ম্যানেজার প্রায় আর্তনাদ করলেন, ও মাই গড!

কর্নেল দ্রুত বললেন, প্লিজ হইচই করবেন না। যা করার পুলিশ করবে। আপনি ততক্ষণ আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি হোটেল কণ্টিনেণ্টালের ম্যানেজার? আপনার নাম বলুন প্লিজ!

ব্রিজেশ কুমার। বাট—

আপনি চিনতে পারছেন বডিটা কার?

মিঃ রঙ্গনাথনের। বড় ব্যবসায়ী। হংকংয়ে ওঁর কারবার। কলকাতা এলে আমাদের এখানেই ওঠেন।

হাজরা স্থানীয় থানায় ফোন করার পর লালবাজারে ফোন করতে ব্যস্ত হলেন।

কর্নেল বললেন, মিঃ কুমার! আপনাদের কোন বোর্ডারের সঙ্গে কে দেখা করতে আসছে, তার রেকর্ড থাকে কি?

না—মানে, রিসেপশনে কেউ এসে কোনও বোর্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাঁর ঘরে রিং করে জেনে নেওয়া হয়। বোর্ডার হ্যাঁ করলে পাঠানো হয়। তবে ওই দেখুন নোটিশ। রাত ন'টার পর কোনও একা মহিলা বা পুরুষ বোর্ডারের ঘরে কোনও পুরুষ বা কোনও মহিলা ভিজিটারের প্রবেশ নিষেধ।

মিঃ রঙ্গনাথন কি এমন কোনও নির্দেশ কখনও দিয়েছিলেন, কিছু ঘটলে কোথাও যোগাযোগ করতে হবে?

হ্যাঁ স্যার। ওটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মিঃ রঙ্গনাথনের রেফারেন্স আমি রেকর্ড দেখে জানাতে পারি।

আজ শেষবার কখন আপনার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল?

সকাল ন'টায়। উনি বেরুনোর সময় আমাকে বলে গিয়েছিলেন, ১০টার পর ফিরবেন। কেউ এলে যেন জানিয়ে দিই। অবশ্য তারপর কখন ফিরেছিলেন আমি জানি না। রিসেপশনে জানা যাবে।

উনি কবে হংকং ফিরবেন বলেছিলেন আপনাকে?

৩১ মার্চ সকালের ফ্লাইটে।

উনি এখানে ওঠেন কোন তারিখে এবং কখন?

২৭ মার্চ ইভনিংয়ে। হংকং থেকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। বরাবর তা-ই করেন।

আপনার হোটেলে সিকিউরিটি সিস্টেম কী রকম?

ভেরি স্ট্রং স্যার। প্রত্যেক ফ্লোরে দু'জন সিকিউরিটি গার্ড আছে। তাদের ওয়াকিটকি আছে। তবে—ম্যানেজার কষ্ট করে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। তবে য়ু নো স্যার, দিস ইজ আফটার অল ইণ্ডিয়া। আমি ওয়েস্টের হোটেলের সিস্টেম দেখেছি। আমাদের দেশের জাতীয় চরিত্র—মানে, কর্তব্যবোধে শৈথিল্য আছে, তা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি এই ফ্লোরের

গার্ডদের কাছে কৈফিয়ত চাইব। কারণ এতে হোটেলের সুনাম হানি শুধু ঘটল না, নিরাপত্তার প্রশ্নও—

ম্যানেজার নার্ভাস হয়ে থেমে গেলেন। এয়ারকণ্ডিশনড ঘরেও তাঁর কপালে ঘামের ফোঁটা। আড়ষ্ট হাতে রুমালে মুখ মুছলেন।

কর্নেল বললেন, মিঃ হাজরা। আমি মিঃ কুমারের সঙ্গে রিসেপশনে যাচ্ছি।

আচ্ছা স্যার···

ব্রিজেশ কুমারকে লিফটে ঢুকেই কর্নেল বলেছিলেন, রিসেপশনে এখনই কাকেও কিছু জানাবেন না যেন। অ্যাণ্ড ফর ইওর ইনফরমেশন, লাউঞ্জে এবং বাইরে রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন আছে। পুলিশ যা করার করবে। তার আগেই আমাকে ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দেবেন। ডোণ্ট ওয়ারি প্লিজ।

কিন্তু রিসেপশন কাউণ্টারে ম্যানেজারের চেহারা দেখে কর্মীরা একটা কিছু আঁচ করেছিলেন। কর্নেল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে লাউঞ্জের এক কোণে নিরিবিলি জায়গায় বসলেন। লক্ষ্য করলেন, কর্মীরা কেমন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

একটু পরে মিঃ কুমার কর্নেলের কাছে এলেন। হাতে একশিট কাগজ। বসে চাপা স্বরে বললেন, মিঃ রঙ্গনাথনের রেফারেন্স কম্পিউটারাইজড্ করা ছিল। এই নিন। সুজিত চৌধুরি নামে রিসেপশন কাউণ্টারে একটি ছেলে আছে। সে বলল, এগারোটায় রঙ্গনাথন ফিরেছিলেন। শরীর খারাপ। লাঞ্চ খাবেন না।

জানি। রঙ্গনাথনের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল কি না?

ওঁর সঙ্গে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে লিফটে উঠতে দেখেছিল সুজিত।

আপনি সুজিতবাবুকে ডাকুন।

সুজিত তাকিয়েছিল এদিকে। ম্যানেজারের ইশারায় চলে এল। কর্নেল বললেন, রঙ্গনাথনের সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর চেহারা মনে আছে আপনার?

সুজিতকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। বলল, দাড়ি ছিল। চোখে সানগ্লাস। মোটামুটি ফর্সা।

পোশাক?

জিনস, লাল শার্ট—

কী বয়সী?

সুজিত একটু ভেবে বলল, অত লক্ষ্য করিনি। তবে আমার বয়সী—

আপনার বয়স কত?

২৮ বছর স্যার!

রঙ্গনাথনের সঙ্গীর হাতে কিছু ছিল?

হাতে? নাহ্। দেখিনি?

আপনি সিওর?

হ্যাঁ স্যার।

ঠিক আছে। আপনি আসুন।

সুজিত চলে যাওয়ার পর মিঃ কুমার বললেন, কণ্টিনেণ্টালে এই প্রথম মিসহ্যাপ। আমার কেরিয়ারের ক্ষতি হবে। আমার আগেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

কর্নেল চুরুট ধরাচ্ছিলেন। বললেন, কেন?

ব্রিজেশ কুমার বিব্রতভাবে বললেন, রঙ্গনাথন হংকংয়ের ব্যবসায়ী। রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স থেকে আমাদের নির্দেশ দেওয়া আছে, বিশেষ করে হংকং থেকে আসা লোকেদের সম্পর্কে যেন ওঁদের খবর দিয়ে রাখি। আগে যতবার রঙ্গনাথন এসেছেন, খবর দিয়েছি। এবারই দিইনি। কারণ ভদ্রলোককে আমার অনেস্ট বলে মনে হয়েছিল। খুব মিশুকে মানুষ ছিলেন। খুব আমুদে।

কর্নেল কাগজটাতে চোখ বুলিয়ে দেখেছিলেন চন্দ্রনাথ দেববর্মনের নাম ঠিকানা লেখা আছে। কাজেই সানশাইনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের যোগ আছেই। লাউঞ্জে এখনও স্বাভাবিক অবস্থা। শুধু রিসেপশনের কর্মীদের মধ্যে কেমন চাপা চাঞ্চল্য। ওরা এদিকে বারবার তাকাচ্ছে।

কর্নেল বললেন, মিঃ কুমার! আপনি নিজের জায়গায় যান।

ম্যানেজার আড়ষ্টভাবে বললেন, আপনার পরিচয় পেলে খুশি হতাম স্যার!

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর নেমকার্ড দিলেন। ব্রিজেশ কুমার চলে গেলেন। এতক্ষণে পুলিশ এল। বেশ বড় একটা দল। অমনই লাউঞ্জে চমক খেলে গেল। যে যেখানে ছিল চুপ করল। পুলিশের দলটি লিফটে উঠে যাওয়ার পর কর্নেল বেরিয়ে পড়লেন।...

ইলিয়ট রোডে নিজের অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে কর্নেল ষষ্ঠীকে কফি করতে বললেন। জোরে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে টেলিফোন তুললেন।

একটু পরে ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ির সাড়া এল। হাই ওল্ড বস! আপনি আমাকে ডোবাবেন দেখছি! আচ্ছা, সত্যি কথাটা বলুন তো? আপনি কি রক্তের গন্ধ পান ইলিয়ট রোডের তিনতলা থেকে?

তুমি আমাকে অবশ্য ব্লাডহাউণ্ড বলে সম্মান দিলে ডার্লিং! জয়ন্ত চৌধুরী আমাকে শকুন বলে।

হাঃ হাঃ হাঃ! আপনার প্রোতেজে ভদ্রলোক কোথায়?

মাস তিনেকের জন্য ইউরোপে ঘুরতে গেছে। ওর কাগজের খরচে।

পিটি! দৈনিক সত্যসেবক একটা বড় রহস্য মিস করল।

অরিজিৎ! চন্দ্রনাথ দেববর্মন কি লকআপে?

নাহ্। ওঁকে ছাড়া হয়েছে। অন কন্ডিশন, অব কোর্স!

কোর্ট সঙ্গে সঙ্গে জামিন দিল?

কোর্ট? হাসালেন বস! সঙ্গে সঙ্গে আসামি কোর্টে তোলে পুলিশ? ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে অবশ্য তুলতে হয়। কিন্তু সেটা কাগজকলমের ব্যাপার। পুলিশ এ ধরনের সিরিয়াস জটিল কেসে ঝটপট কোর্টে তোলে না আসামিকে। জেরা, দরকার হলে থার্ড ডিগ্রি—না! মিঃ দেববর্মনকে মর্গের রিপোর্ট পেয়েই সসম্মানে ছাড়া হয়েছে। প্রসিকিউশন উইটনেস তিনি। ব্যাপারটা বুঝলেন কি? উই আর নট সিটিং আইড্‌ল্।

রাখছি অরিজিৎ! পরে কথা হবে।...

কর্নেল এবার টেলিফোন করলেন চন্দ্রনাথ দেববর্মনকে। রিং হলো অনেকক্ষণ। সাড়া পেলেন না। তখন ফোন করলেন রণধীর সিংহকে। রণধীরকে চন্দ্রনাথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, লকআপ থেকে ছাড়া পেয়ে ভদ্রলোক ফিরে এসেছিলেন। কলকাতার বাইরে যাবেন বলে বেরিয়েছেন! ওঁর অ্যাপার্টমেন্টের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে গেছেন। তবে রণধীরের ধারণা, বেশি দূরে যাননি চন্দ্রনাথ। কারণ গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। কালই ফিরবেন।

সাত

টিনা মুখার্জি বিকেল সওয়া পাঁচটায় মেট্রো সিনেমার উল্টো দিকে তার ক্রিমরঙের মারুতি দাঁড় করাল। সানগ্লাস খুলে দেখে নিল ওদিকটা। এখনও পেঁছয়নি রঞ্জন। টিনার পনের মিনিট দেরি হয়েছে পর-পর দু জায়গায় জ্যামের জন্য। রঞ্জনও সাউথ থেকে আসবে। তাই তাকেও জ্যামে পড়তে হয়েছে।

এই ভেবে টিনা তার গাড়ি পার্ক করল। সানগ্লাস পরেই বসে রইল ড্রাইভিং সিটে। রঞ্জনের ট্যাক্সি করে আসার কথা। ওর গাড়িটা নাকি গ্যারাজে।

টিনার বাবা অনির্বাণ মুখার্জি খ্যাতিমান ডাক্তার। নিজের নার্সিং হোম আছে নিউ আলিপুরে। টিনা একমাত্র সন্তান। টিনার মা ঋতুপর্ণা সমাজ-সেবায় ব্যস্ত। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সারাক্ষণ নিজের-নিজের ব্যাপারে মেতে থাকলে যা হয়। টিনা 'স্পয়েল্ড চাইল্ড' হিসেবে বেড়ে উঠেছে। দার্জিলিঙে একটা কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রী ছিল। প্রায়ই না বলে পালিয়ে আসত। তারপর আর লেখাপড়ায় তাকে ভেড়ানো যায়নি। হিন্দি ফিল্মের হিরোইনরা

তার জীবনের আদর্শ। আয়নায় নিজেকে সে সুন্দর দেখে। অন্যেরা তার রূপের প্রশংসা করে। কিছুদিন আগেও তার এক নেপালি বয়ফ্রেন্ড ছিল। সে তাকে ডায়না বলত। কিন্তু একদিন অতর্কিতে চুমু খেয়ে ফেলায় টিনা তাকে চড় মেরে ভাগিয়ে দিয়েছে। হ্যাভ ফানস, বাট নট এনি সেক্স।

রঞ্জনের সঙ্গে টিনার আলাপ হয়েছিল তাদেরই বাড়িতে। মাঝে মাঝে রঞ্জন তার বাবার কাছে আসত। কেন আসত টিনা জানে না। একদিন কথায় কথায় রঞ্জন বলেছিল, আপনার ফটোজেনিক ফেস। ভয়েস সো সুইট! অভিনয় শিখে নিলে আপনার সাকসেস অনিবার্য!

এইভাবে টিনার একটা স্বপ্ন দেখার সূচনা। রঞ্জনকে দেখলেই সে স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে যায়। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় রঞ্জন টেলিফোনে জানিয়েছিল, একটা যোগাযোগ ঘটে গেছে। হংকংয়ের এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। তিনি বিদেশের জন্য টেলিফিল্ম করছেন। বড়রকমের উদ্যোগ। কিন্তু নতুন মুখ চান। ২৮ মার্চ টিনার সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দেবে। সেদিনই সকালে সে টিনাকে রিং করে সময় জানাবে।

তারপর গতকাল ২৮ মার্চ সারাদিন প্রতীক্ষা করেও রঞ্জনের পাত্তা নেই। তার নাম্বারও জানা ছিল না টিনার। আজ বেলা একটায় রঞ্জনের ফোন। টিনা! আমি দুঃখিত। মিঃ রঙ্গনাথন ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। আজ বিকেল ৫টায় তোমার সময় হবে কি?

টিনা কিছু না ভেবেই বলেছিল, কেন হবে না? আমার তো গাড়ি আছে।

তাহলে তুমি মেট্রো সিনেমার উল্টোদিকে ঠিক পাঁচটায় আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমার গাড়ি গ্যারাজে। ট্যাক্সি করে যাব। আর একটা কথা। তুমি শাড়ি পরে যাবে কিন্তু!

ঠিক আছে। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?

কেন? মিঃ রঙ্গনাথনের কাছে।

কোথায়?

হোটেল কণ্টিনেণ্টালে উনি উঠেছেন।

কটায় অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট?

সন্ধ্যা ৬টায়।

আমি হোটেলের কোনও ঘরে ঢুকব না কিন্তু!

ওঃ টিনা! আমি জানি তুমি খুব সাবধানী মেয়ে। তবে ভয়ের কিছু নেই। ফাইভস্টার হোটেল। তুমি নিশ্চয় নাম শুনেছ!

আমি লাউঞ্জে বসে কথা বলব।

ও কে! ও কে টিনা! তবে উনি ব্যস্ত মানুষ। যদি তখনই তোমার স্ক্রিন টেস্ট করার ব্যবস্থা করেন এবং তুমি যদি পিছিয়ে যাও, তাহলে আমি কিন্তু অপ্রস্তুত হব। ভেবে দেখ।

কোথায় স্ক্রিন টেস্ট হবে ?

পার্ক স্ট্রিট এরিয়ায় ওঁর স্টুডিও আছে।···টিনা ? তুমি কি ভয় পাচ্ছ ? দেখ, আমি তো সঙ্গেই থাকছি তোমার। আমাকে তোমার বাবা চেনেন। এ একটা বড় সুযোগ টিনা ! তোমার ভবিষ্যৎ কল্পনা করো।

এ সব কথা ইংরেজিতেই হয়েছে। টিনা বাংলা বলে কদাচিৎ। সে রঞ্জনের এই শেষ কথাটাকে গুরুত্ব দিয়েছিল।···

ঘড়ি দেখল টিনা। পাঁচটা কুড়ি বাজে। ফিরে যাবে নাকি ?

সেই সময় হঠাৎ তার মনে হলো, রঞ্জন তার গাড়ি চিনতে না-ও পারে। অজস্র রঙবেরঙের গাড়ি পার্ক করা আছে। একই রঙের মারুতিও কম নেই। টিনা গাড়ি থেকে বেরুল। তারপরই দেখতে পেল রঞ্জনকে। এদিকে-ওদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বেচারা। টিনা হাসল।

একটু পরে টিনাকে দেখতে পেল রঞ্জন। হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে বলল, কতক্ষণ এসেছ ?

অনেকক্ষণ।

আমি তো খুঁজে হয়রান। শিগগির।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দক্ষিণে ঘোরালো টিনা। কিছুক্ষণ পরে মোড় পেরিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, হোটেল কণ্টিনেণ্টাল এ জে সি বোস রোডে না ?

হ্যাঁ। কিন্তু মিঃ রঙ্গনাথন শেষ মুহূর্তে জানিয়েছেন ওঁর স্টুডিওতে দেখা হবে।

পার্ক স্ট্রিট ?

ওই এরিয়ায়। সামান্য একটু ভেতরে। তোমার উদ্বেগের কারণ নেই। আমি আছি।

পার্ক স্ট্রিটে রঞ্জনের নির্দেশমতো একটা সংকীর্ণ ঘোরালো রাস্তায় ঢুকল টিনা। তারপর রঞ্জন একখানে বলল, এখানেই রাখো।

গলি রাস্তা। আলো কম। কোনও রকমে দুটো গাড়ি পাশাপাশি যাতায়াত করতে পারে। গাড়ি লক করার পর টিনা বলল, এ কোথায় আনলে আমাকে ?

ওঃ টিনা ! একটু সাহসী হও। এস।

বাঁদিকে মিটমিটে আলোয় একটা চওড়া দরজা এবং সিঁড়ি দেখা যাচ্ছিল। রঞ্জন বলল, লিফ্‌ট নেই কিন্তু। আমার হাত ধরতে পারো। দোতলায় স্টুডিও। দেখো, সাবধানে।

আমি পারব।

ও কে !

দোতলায় একটা ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে রঞ্জন বলল, এখনও এসে

পেঁছাননি দেখছি। আমাকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়েছেন। চলো, অপেক্ষা করা যাক।

টিনা দেখল দরজার মাথায় ফলকে লেখা আছে 'ভিডিওজোন'। রঞ্জন দরজা খুলে বাংলায় বলল, আরে বাবা! বাঘের গুহা নয়। রীতিমতো স্টুডিও। দেখতে পাচ্ছ না? সে সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

টিনা একটু দ্বিধার সঙ্গে ঢুকল। রঞ্জন দরজা বন্ধ করে বলল, উটকো লোক ঢুকে পড়তে পারে। দরজা বন্ধ করাই ভাল। ওই দেখ, ক্যামেরা রেডি করা আছে পাশের ঘরে। সে পাশের ঘরের পর্দা তুলে দেখাল। দরজা খোলা ছিল ওঘরের।

দুটো ঘরের মেঝে কার্পেটে ঢাকা। দেওয়ালে অজস্র ছবি সাঁটা আছে। সবই দেশি-বিদেশী চিত্রতারকাদের ছবি। মাঝে মাঝে কয়েকটা ন্যুড ছবিও।

এ ঘরে সোফাসেট, অফিসের মতো সাজানো চেয়ার টেবিল আলমারি। পাশের ঘরে শুধু একটা ডিভান। সেটা শেষ প্রান্তে রাখা। অন্য প্রান্তে একটা ম্যুভি ক্যামেরা। স্ট্যাণ্ডে চাকা লাগানো।

রঞ্জন বলল, যে কোনও মুহূর্তে মিঃ রঙ্গনাথন এসে পড়বেন। তুমি ওই ডিভানে বসো।

টিনা একটু আড়ষ্টভাবে বসল।

রঞ্জন হাসল। প্রচণ্ড আলো ফেলা হবে তোমার ওপর। সহ্য করতে পারবে তো? দেখাচ্ছি।

সে পটাপট কয়েকটা সুইচ টিপে দিতেই এক হাতে চোখ ঢাকল টিনা।

সে কী! হাত নামাও! বি স্মার্ট অ্যাণ্ড বিউটিফুল! একটা পোজ নিয়ে বসো।

ভীষণ গরম লাগছে!

ফ্যান চালিয়ে দিচ্ছি। বলে সে সুইচ টিপে ফ্যান চালিয়ে দিল।

তবু বড্ড গরম।

ওটা কিছু না। সয়ে যায়। তুমি কখনও শুটিং দেখনি মনে হচ্ছে?

নাহ্!

শোনো! তোমার কি ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস আছে? কখনও ড্রিঙ্ক করেছ?

কেন?

একটু ব্র্যাণ্ডি বা ওয়াইন খেলে তোমার আর গরম লাগবে না। আড়ষ্টতাও কেটে যাবে। দু'এক চুমুক খেয়েই দেখ। আরে বাবা! ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আলোগুলো নিভিয়ে রঞ্জন ফের বলল, ওই দেয়ালে কত স্ক্রিন টেস্ট করা মেয়েদের ছবি। প্রথম-প্রথম ওরা ঠিক তোমার মতো বিহেভ করে। তারপর দিব্যি স্মার্ট হয়ে যায়। দু-তিন চুমুক ড্রিঙ্ক যথেষ্ট। নেশা হয় না। কিন্তু আড়ষ্টতা কেটে যায়।

রঞ্জন দেয়ালের সেলার খুলে একটা গ্লাস এবং একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল বের করল।

টিনা আস্তে বলল, আই লাইক ব্র্যাণ্ডি!

সো নাইস গার্ল য়ু! সো বিউটিফুল! টেক ইট ঈজি! একটু জল মিশিয়ে দিই। কেমন?

রঞ্জন একটা বোতল থেকে জল ঢেলে দিল গ্লাসের ব্র্যাণ্ডিতে। তারপর গ্লাসটা টিনার হাতে তুলে দিল। টিনা চুমুক দিল। তারপর দেয়ালের ছবিগুলো দেখতে থাকল। বলল, ওরা কি চান্স পেয়েছে?

সবাই পায়নি। এই যে দেখছ, নীতা সেন। তার প্রথম স্ক্রিন টেস্টের ছবি এটা।

টিনা চোখ বড় করে বলল, নীতা সেন? য়ু মিন—

ইয়া! হাসল রঞ্জন। এখন যার বাজারদর সেভেনটি ফাইভ টু এইট্টি লাখ! বাট মানি ইজ নট দা কোয়েশ্চান!

টিনা পর-পর দুবার চুমুক দিল। তারপর হাসল। লাইট প্লিজ! নাও লেট মি সি, হোয়াট আই ফিল।

রঞ্জন সুইচ টিপলে সেই জোরালো আলোগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল টিনার ওপর। এবার সে চোখ ঢাকল না। রঞ্জন বলল, একটু কাত হয়ে বসো তো! লেন্সে দেখে নিই। হ্যাঁ, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর শোনো, তোমার হ্যাণ্ড-ব্যাগটা ডিভানের ওপাশে নামিয়ে রাখো। দ্যাট লুকস অড!

সে এগিয়ে টিনাকে একপাশে কাত করে বসিয়ে দিল। তারপর ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে বলল, লেন্সের দিকে তাকিয়ে থাকো। হাসি চাই। ওয়েলডান! এবার গ্লাসে চুমুক দাও!…ও কে!…এবার হ্যাঁ, লজ্জার কিছু নেই। [illegible] এমনভাবে ফেলে দাও, যেন নিজে থেকে খসে যাচ্ছে। আই মিন, তুমি তোমার শরীর থেকে মনকে আলাদা করে দাও। কিপ দেম সেপারেট। ও কে?…নাও, [illegible] দা [illegible]! ইয়েস! শো ইওর ভিগারাস—র‍্যাদার আই সে ডেঞ্জারাস বডি! অ্যাণ্ড নাও থিঙ্ক্! ইওর মাইণ্ড ইজ ইওর বডি। ও কে? [illegible] দা [illegible] ইয়া! গুড! ওয়াণ্ডারফুল!… নাও [illegible] ইওরসেল্ফ অ্যাজ ইফ এ ফ্লাওয়ার ইজ ব্লসমিং। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?…ও কে! ফাইন!… নাও লাই ডাউন অন দা ডিভান কিপ দা লেফ্ট নী আপ!…আপ! আপ! আপ! ও কে!

মুভি ক্যামেরার সুইচ অন করে রেখে রঞ্জন তৈরি হলো। সম্পূর্ণ [illegible] অবস্থায় ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে সে এগিয়ে গেল ডিভানের দিকে।

কোনও বাধা পেল না। টিনার চোখ বন্ধ।

একটু পরে রঞ্জন উঠে এসে ক্যামেরা বন্ধ করল। ফিল্মের ক্যাসেটটা বের

করে নিল। এটা আসলে ভি ডি ও ক্যামেরা। পরে সে জোরালো আলোগুলো নিভিয়ে দিল। টিনার কাছে গিয়ে , , তারপর । পারল না। কোনও রকমে দিল একুশ বছরের ।

তারপর সে স্ট্যাণ্ড থেকে ক্যামেরাটা খুলে একটা ব্যাগে ভরল। কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল স্টুডিও থেকে। দরজা ভেজিয়ে রেখে সাবধানে নেমে গেল নিচে।

গলি রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় পেঁছে রঞ্জন ট্যাক্সি খুঁজতে থাকল।

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। কিছুক্ষণ বাজার পর বন্ধ হয়ে গেল। আবার স্তব্ধতা। শিলিং ফ্যানটা শোঁ শোঁ শব্দ করলেও সাউণ্ডপ্রুফ স্টুডিওর গভীর স্তব্ধতা সেই শব্দকে গ্রাস করছে। এয়ারকণ্ডিশনড্ করার প্ল্যান ছিল রঞ্জনের। কিন্তু রঙ্গনাথন মৃত। মৃতেরা কথা বলে না।

প্রায় আধঘণ্টা পরে টিনা তাকাল। খুব দুর্বল বোধ হলো শরীর। কোথায় শুয়ে আছে বুঝতে পারল না সে। কী একটা স্বপ্ন দেখছিল যেন, ঠিক ফিল্মে যেমন হয়। তার মাথার ওপর একটা ফ্যান ঘুরছে। ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় সচকিত হলো।

উঠে বসার চেষ্টা করল টিনা। কিন্তু মাথা টলমল করছে। দৃষ্টিতে আচ্ছন্নতা। সে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। ক্রমে তার স্মৃতি ফিরে এল। রঞ্জন রায় তাকে এখানে এনেছিল। এই ডিভানে বসে সে কয়েক চুমুক ড্রিংক করেছিল। তারপর?

তারপর আর কিছু মনে পড়ছে না। তবে যে ঠিকমতো সে পরে নেই, এটা বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে আরও কী ঘটেছে।

টিনা সহসা নিজের ওপর খেপে গেল। সেই ক্ষিপ্ততা তার চেতনা প্রখর করল ক্রমশ। এবার সে সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে চাপা হিংস্র কণ্ঠস্বরে বলল, রঞ্জন! য়ু ডার্টি সোয়াইন! সন অফ এ বিচ!

সে পোশাক গুছিয়ে পরে নিল। তারপর দেখল ক্যামেরার স্ট্যাণ্ডটা আছে মাত্র। তা হলে সে একটা ফাঁদে পা দিয়েছিল।

কিন্তু এখন আর অনুশোচনার মানে হয় না। সাবধানে পা ফেলে টিনা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সেইসময় মনে পড়ল হ্যাণ্ডব্যাগটার কথা। ওতে তার গাড়ির চাবি আছে।

ডিভানের ওপাশে মেঝে থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল টিনা। নিচের রাস্তায় নেমে তার গাড়ির কাছে গিয়ে সে দম নিল। তারপর লক খুলে গাড়িতে ঢুকল। এতক্ষণে সে সুস্থ বোধ করল।

কিন্তু টিনা মুখার্জি হয়তো তত সুস্থ ছিল না। তার পায়ের চটি ফেলে এসেছে স্টুডিওতে। চটি আনতে যাওয়ার অবশ্য মানে হয় না।...

আট

কর্নেল ঘড়ি দেখলেন, সাড়ে সাতটা বাজে প্রায়। হোটেল কণ্টিনেণ্টাল থেকে সোজা গিয়েছিলেন 'ভিডিওজোন'-এর ঠিকানায়। দরজায় তালা দেওয়া ছিল। অন্যপাশে কয়েকটা ছোট কোম্পানির অফিস। খোঁজ নিয়েছিলেন। কেউ জানে না ওই ঘরটা কার, তবে মাঝে মাঝে কেউ-কেউ আসে। পুরুষ এবং মহিলা। ওটা ছবি তোলার ঘর, নাকি ক্যাসেটে গান রেকর্ডিংয়ের, সে-বিষয়ে নানা মত। শুধু একটা বিষয়ে সবাই একমত যে, বেশির ভাগ সময় ঘরটা বন্ধই থাকে। বাড়ির মালিক থাকেন বোম্বেতে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে তাঁর নামে ভাড়া জমা দেয় ভাড়াটেরা।

কর্নেল ফিরে এসে একবার পাঁচটা পনেরোতে এবং একবার প্রায় সাতটা নাগাদ ফোন করেছিলেন। রিং হচ্ছিল। কেউ ধরেনি। তারপর লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের ইন্সপেক্টর নরেশ ধরকে ঠিকানা দিয়ে খোঁজ নিতে অনুরোধ করেছেন।

এখন নরেশবাবু কী খবর দেন, তার প্রতীক্ষা। কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। চন্দ্রনাথ দেববর্মন ছাড়া পেয়ে হঠাৎ কোথায় গেলেন? কেন? প্রাণভয়ে গা ঢাকা দিলেন কি—আততায়ী তাঁর চেনা লোক বলেই?

টেলিফোন বাজল।

কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিলেন। তারপর নরেশবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।...আমি ধর কইতাছি স্যার!

বলুন নরেশবাবু।

ভিডিওজোন থেক্যা কইতাছি। আইয়া দেখি, ডোর ইজ ওপ্‌ন্‌। কিন্তু মানুষ নাই। হাঃ হাঃ হাঃ!

আচ্ছা!

তিনখান পাও লইয়া স্ট্যাণ্ড খাড়াইয়া আছে। ক্যামেরা নাই। হাঃহাঃহাঃ!

বলেন কী! তারপর?

ফ্যান ঘুরতাছে! হাওয়া খাওনের মানুষ নাই। হাঃ হাঃ হাঃ!

হুঁ। আর?

ট্যার পাইয়া কাটছে আর কি! হ্যাঁ—একখান গ্লাস কাত হইয়া আছে কার্পেটে। এইটুক খানি তরল পদার্থ আছে গ্লাসে। অ্যাঁ? হোয়াট ইজ দিস? লেডিস জুতা? দুইখান জুতা!

নরেশবাবু! শুনুন প্লিজ।

কন স্যার।

গ্লাসটা দরকার। গ্লাসের তরল পদার্থ ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করাতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইমপর্ট্যান্ট! বুঝলেন?

হুঃ! আর জুতো?

জুতো জোড়াও নিয়ে যান। ওটাও ইমপর্ট্যান্ট।

ভেরি ইমপর্ট্যান্ট! অ কাশেম মিয়া! জুতাজোড়া প্যাকেটে বান্ধো! ওই তো কত পেপার।

নরেশবাবু! দরজা সিল করে দেবেন যেন!

হ্যান্ডকাফ পরাইয়া দিমু। হাঃ হাঃ হাঃ!

ডি সি ডি ডি সায়েবকে এখনই গিয়ে রিপোর্ট দেবেন। ছাড়ছি।...

ফোন রেখে কর্নেল হাঁকলেন, ষষ্ঠী? আর এক কাপ কফি দিয়ে যা বাবা।

সাদা দাড়ি আঁকড়ে ধরলেন কর্নেল। একটু ভুল হয়ে গেছে। হোটেলের ঘরে রঞ্জন রায়ের কার্ড পেয়েই পুলিশকে ওই ঠিকানায় নজর রাখতে বলা উচিত ছিল।

হঠাৎ মনে হলো শুভ্রাংশু সোম অভিনয় করে। ফিল্মের লোকেদের সঙ্গে তার চেনাজানা থাকা সম্ভব। তাকে জিজ্ঞেস করা যায় রঞ্জন রায় এবং 'ভিডিওজোন' সম্পর্কে খবর রাখে কি না।

ষষ্ঠী কফি এনে দেওয়ার পর কর্নেল শুভ্রাংশুর কার্ড দেখে টেলিফোন করলেন। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর মহিলাকণ্ঠে সাড়া এল, হ্যালো!

শুভ্রাংশু সোম আছেন কি?

দাদা নেই। বাইরে গেছে। আপনি কে বলছেন?

চিনবেন না। আপনি কি শুভ্রাংশুবাবুর বোন?

হ্যাঁ। আপনার নাম বললে দাদা ফিরে আসার পর জানাব। দাদার বলা আছে কেউ ফোন করলে—

আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

এক মিনিট। লিখে নিই।...হ্যাঁ, বলুন!

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আপনার—তোমার নাম কী ভাই?

সুস্মিতা সোম।

বাহ্‌। আচ্ছা, তোমার দাদা কখন বাইরে গেছেন?

দাদাকে তো প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ।

আজ কখন গেছেন?

দুপুরে অফিস থেকে ফোন করে বলল, বাইরে যাচ্ছে। আজ না-ও ফিরতে পারে।

কোথায় যাবেন বলেননি?

নাহ্‌। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের যখন তখন বাইরে যেতে হয়। ছাড়ছি।...

কর্নেলের অনুমান, শুভ্রাংশুর বোন কিশোরী। কফিতে চুমুক দিয়ে 'ভিডিওজোন'-এর কথা ভাবতে থাকলেন। মেঝেয় গড়িয়ে পড়া গ্লাস, একটা ডিভান, দু পাটি লেডিজ জুতো, খালি ক্যামেরাস্ট্যান্ড এবং শিলিং ফ্যানটা ঘুরছিল।

শুভ্রাংশুর কথাগুলো মনে ভেসে এল এবার। মউ তাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল, হংকংয়ের এক ব্যবসায়ী মউকে ব্ল্যাকমেল করে। আর একটা ভিডিও ক্যাসেট তার ব্ল্যাকমেলের অস্ত্র! হুঁ, ব্লু ফিল্ম। শুভ্রাংশুর দৃঢ় বিশ্বাস, মউকে নিয়ে সেই ব্লু ফিল্ম তোলা হয়েছিল।

শুভ্রাংশু একরকম ড্রাগের কথা বলছিল! কেউ সেই ড্রাগের ঘোরে থাকলে বোঝা যায় না সে কী করছে বা তাকে দিয়ে কী করানো হচ্ছে। শুভ্রাংশু এই কথাটা বলেছিল, 'এ বিষয়ে আমি কিছু পড়াশোনা করেছি।' কেন সে পড়াশোনা করেছে এ বিষয়ে? জোনথ ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে সে চাকরি করে। এই কোম্পানি কি গোপনে সেই ড্রাগ তৈরি করে এবং শুভ্রাংশু তা জানতে পেরেছিল?

কর্নেল কফি শেষ করার পর টেলিফোন তুললেন ফের। ডায়াল করলেন। সাড়া এল।

মিঃ দাশগুপ্ত?

কে বলছেন?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আপনাকে একটু বিরক্ত করছি।

একটু পরে শান্তশীল বলল, হ্যাঁ, বলুন!

রঞ্জন রায় নামটা কি আপনার পরিচিত?

হু ইজ দ্যাট গাই?

ফিল্মমেকার।

চিনি না।

নামটা কি কখনও আপনার স্ত্রীর কাছে শুনেছেন? প্লিজ, একটু স্মরণ করুন।

নাহ্। শুনিনি।

'ডিভিওজোন' শব্দটা?

হোয়াটস্ দ্যাট?

কখনও শুনেছেন কি না কথাটা?

শুনিনি।

সিওর?

ড্যাম ইট!...সরি! আমি ওরকম কোনও শব্দ শুনিনি কারও কাছে।

মিঃ দাশগুপ্ত, একটা অনুরোধ! আপনার স্ত্রীর কাগজপত্রের মধ্যে—

কোথাও যদি রঞ্জন রায়ের নেম কার্ড বা 'ভিডিওজোন' মার্কা কোনও কাগজ খুঁজে পান, অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

জানাবো।

আর একটা কথা মিঃ দাশগুপ্ত! আপনি একটা নামী ওষুধ কোম্পানির কর্মকর্তা। মেডিসিন, তার মানে, যে-কোনোরকম ড্রাগ সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকার কথা। কী উপাদানের কী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এ বিষয়েও মোটামুটি ধারণা থাকা উচিত।

সো হোয়াট?

এমন ড্রাগ থাকা খুবই সম্ভব, যা কেউ খেলে টের পাবে না সে কী করছে বা তাকে দিয়ে কী করানো হচ্ছে।

ওটা নার্কোটিক্স। নিষিদ্ধ ড্রাগ। উই ডু নট সেল দোজ ডার্টি থিংস।

বলছি না। আমি জাস্ট আপনার কাছে জানতে চাইছি, অমন ড্রাগ থাকা সম্ভব কি না?

খুবই সম্ভব। এল এস ডি-জাতীয় ড্রাগ তো এখন আউট অব ডেট হয়ে গেছে।

মিঃ দাশগুপ্ত! শুনেছি, বহু নিষিদ্ধ ড্রাগ আজকাল ছদ্মনামের আড়ালে বিক্রি হয় তাই না?

হতেই পারে। হয়। বাট উই ডু নট প্রোডিউস অর সেল দেম। জেনিথের রেকর্ড ক্লিন। য়ু হ্যাভ পোলিস-কণ্ট্যাক্ট কর্নেল সরকার। য়ু মে আস্ক্ দেম। বাট হোয়াই—

প্লিজ মিঃ দাশগুপ্ত! অফেন্স নেবেন না। আমি আপনার সহযোগিতা চাইছি শুধু।

ওরকম কোনও ড্রাগের ব্যাপারে আমার সহযোগিতা আশা করবেন না।

কর্নেল হাসলেন। না, না মিঃ দাশগুপ্ত! আমি আপনার স্ত্রীর খুনীকে খুঁজে বের করার জন্য আপনার সহযোগিতা চাইছি।

মউয়ের মার্ডারের সঙ্গে নার্কোটিকসের কী সম্পর্ক আমি বুঝতে পারছি না।

আছে। বাই দা বাই, আপনার কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ শুভ্রাংশু সোম—

তাকে চেনেন নাকি?

চিনি। আজ সকালে সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। আমাকে বলেছে। সে-ও চাইছে আপনার স্ত্রীর খুনী ধরা পড়ুক।

একটু পরে শান্তশীল শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আই ডু নট লাইক হিম।

আজ শুভ্রাংশুকে বাইরে কোথায় পাঠানো হয়েছে জানেন?

ওটা আমার জানার কথা নয়। কেন?

ওকে একটু দরকার ছিল। ওর বাড়িতে শুনলাম বাইরে গেছে হঠাৎ।

সেটা স্বাভাবিক। ওকে! আমি একটু ব্যস্ত কর্নেল সরকার।

সরি! রাখছি। ধন্যবাদ।…

কর্নেল টেলিফোন রেখে নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। শুভ্রাংশুকে খুবই দরকার ছিল এ মুহূর্তে। সে নিশ্চয় ওরকম কোনও ড্রাগের খবর রাখে। তার কাছে এটা জানা গেলে একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যাবে। হংকংবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী যে সত্যিই ব্লু ফিল্মের কারবারি, তাতে সন্দেহের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সে খুন হয়ে গেছে। শুভ্রাংশুর কথামতো সে মধুমিতার ব্ল্যাকমেলার ছিল। কিন্তু নিছক ব্লু ফিল্মের কারবারি ব্ল্যাকমেল করবে কেন? তাহলে তো তার কারবারই বন্ধ হয়ে যাবে।

একটু চঞ্চল হলেন কর্নেল। রঞ্জন রায়ের সাহায্যে রঙ্গনাথন ব্লু ফিল্ম তৈরি করতেন তা স্পষ্ট। রঞ্জনই কি সেই ফিল্মের কপি হাতিয়ে বিত্তবান এবং বিশিষ্ট লোকেদের ব্ল্যাকমেল করে এসেছে? এ সব ঘটনা গোপনে ঘটে থাকে। স্ক্যান্ডালের ভয়ে কেউ পুলিশকে জানাতে চায় না। সম্ভবত রঞ্জন এবার এমন কাউকে ব্ল্যাকমেল করছিল, যার সঙ্গে কোনও সূত্রে রঙ্গনাথনের ঘনিষ্ঠতা আছে। রঙ্গনাথন রঞ্জনের কুকীর্তি টের পেয়ে বোঝাপড়া করতে চেয়েছিলেন বলেই হয়তো খুন হয়ে গেলেন। আর একটা পয়েন্ট। ১২৭ নং সুইটে কোনও ফিল্মের ক্যাসেট পাওয়া যায়নি। তবে রঙ্গনাথনকে হত্যার এই মোটিভটা যুক্তিযুক্ত বলা চলে।

টেলিফোন বাজল। কর্নেল সাড়া দিলেন।

কর্নেল সরকার! দাশগুপ্ত বলছি। শান্তশীল দাশগুপ্ত।

বলুন? আপনার স্ত্রীর কাগজপত্রের মধ্যে তাহলে—

না কর্নেল সরকার। আপনার সঙ্গে একটু আগে কথা বলার পর হঠাৎ আমার মনে হলো, আপনার সঙ্গে বসা দরকার। অনেক কথা বলা দরকার। কাল মর্নিংয়ে আপনার সময় হবে কি? আমি যেতে চাই আপনার কাছে।

আমিই বরং আপনার কাছে যাব। দ্যাটস দা বেস্ট প্লেস টু টক। অন দা স্পট।

বাট কর্নেল সরকার, ডেডস ডু নট স্পিক, য়ু নো!

কী বললেন?

মৃতেরা কথা বলে না

কর্নেল হাসলেন। অসাধারণ উক্তি মিঃ দাশগুপ্ত। কিন্তু আমার কাজটাই হলো মৃতদের কথা বলানো। ডেডস স্পিক টু মি।

ও কে! আপনি আসুন। আমি অপেক্ষা করব। শুধু সময়টা জানিয়ে দিলে ভাল হয়।

সকাল ন'টা।

দ্যাটস ও কে। ছাড়ছি।…

ফোন রেখে কর্নেল বুক-শেলফের কাছে গেলেন। নার্কোটিকস্ সংক্রান্ত একটা বই তাঁর সংগ্রহে আছে। তবে সেটা নার্কোটিকস্ স্মাগলিংয়ের রেকর্ড। বলা চলে, অপরাধবৃত্তান্ত। তবে ওতে নানা ধরনের নিষিদ্ধ ড্রাগ এবং তার গুণাগুণেরও উল্লেখ আছে।

বইটা এনে ইজিচেয়ারে বসলেন। টেবিলবাতি জেলে দিলেন। কিছুদিন থেকে রিডিং গ্লাস ব্যবহার শুরু করেছেন। চোখের দোষ নেই। বয়স থেমে থাকে না।

পাতা ওল্টাতে গিয়ে শান্তশীলের কথাটা মাথায় ভেসে এল, মৃতেরা কথা বলে না। হুঁ, এটা সব হত্যাকারীই ধরে নেয়। কিন্তু মৃতেরা কথা বলে। চুপিচুপি কথা বলে। অরণ্যে মর্মরধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর।...

নয়

ঋতুপর্ণা দরজা খুলে আস্তে বললেন, আমি সন্ধ্যা ছ'টায় এসে অপেক্ষা করছি। এখন ন'টা বাজে। তাছাড়া হঠাৎ একটু আগে টিনা এসেছে।

টিনা এখানে আসে নাকি? চন্দ্রনাথ একটু হকচকিয়ে বললেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো সুগন্ধ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর ওপর। ফের বললেন টিনা—

আসে। ওর কাছে এ ফ্ল্যাটের একসেট চাবি আছে। ঋতুপর্ণা শ্বাস ফেলে বললেন, ভেতরে এস।

চন্দ্রনাথ একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন, নাহ্। থাক।

ঋতুপর্ণার চোখ উজ্জ্বল দেখাল। মুখে কড়া প্রসাধন। কিন্তু চোখের ওই উজ্জ্বলতা তীব্র ক্ষোভের। ঠোঁটের কোণা বেঁকে গেল। বললেন, তুমি আমার তিনটে ঘণ্টা নষ্ট করেছ। দাম দিয়ে যাও।

কথা হচ্ছিল ইংরেজিতে। চন্দ্রনাথ ভেতরে ঢুকে বললেন, আসার পথে আমার অ্যাডভোকেটের বাড়ি হয়ে এলাম। আড়াই ঘণ্টা আটকে রাখল সে। ছারপোকা! যাই হোক, আমার একটা সাংঘাতিক মিসহ্যাপ হয়েছে।

তোমার জীবনটাই তো মিসহ্যাপে ভর্তি। বলে ঋতুপর্ণা কোণের দিকে সোফায় বসলেন। বলো!

হাল্কা স্যুটকেসটা পাশে রেখে চন্দ্রনাথ মুখোমুখি বসলেন। টিনা কী করছে?

কিছু ঘটে থাকবে, কিংবা কারো পাল্লায় পড়ে ড্রিঙ্ক করে সামলাতে পারেনি। নিউ আলিপুরের বাড়িতে গিয়ে আমাকে পায়নি। তারপর—তো ওকে একটা সেডাটিভ দিয়েছি। কিছু খেতে চাইল না। ঘুমোচ্ছে! ঋতুপর্ণা একটা সিগারেট ধরালেন। তোমার কথা বলো।

টি ভি-র শব্দ কমিয়ে দাও।

ঋতুপর্ণা শব্দ কমিয়ে বললেন, আমি ওয়াইন খাচ্ছিলাম। হুইস্কি আছে, খাবে?

এনেছি। জনি ওয়াকার। চন্দ্রনাথ সুটকেস থেকে হুইস্কির বোতল বের করলেন। আইসকিউব আনো।

কোথায় পেলে?

রঙ্গনাথনের উপহার। কিন্তু আজ বেচারা হঠাৎ খুন হয়ে গেছে। পরে বলছি। উত্তেজিত হয়ো না।

ঋতুপর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘরে আলো কম। কিন্তু তাঁর চোখে চমক ছিল। একমুহূর্ত চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ডাইনিং-কাম-কিচেনে ঢুকলেন। সঙ্গে সুগন্ধ নিয়ে ঘুরছেন ঋতুপর্ণা।

চন্দ্রনাথ তাঁর সিগারেট প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখলেন। সিগারেট ধরিয়ে ঘরের ভেতরটা লক্ষ্য করলেন। সল্টলেকের এই ফ্ল্যাটে এক মাস আগে একদিন এসেছিলেন। তেমনই সাজানো আছে। কোণে প্রায় তিন ফুট উঁচু নগ্ন যক্ষীর ভাস্কর্য নির্লজ্জ দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালে একটা ফ্রেস্কো। চুম্বনরত দুটি মুখ। ঈষৎ বিমূর্ত। ডাঃ মুখার্জি কি এই ফ্ল্যাটে কখনও আসেন? নিশ্চয় সময় পান না। একবার একটা পার্টিতে স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ঋতুপর্ণা। অবশ্য বলেননি—বলা সম্ভবও ছিল না, চন্দ্রনাথ দেববর্মনের সঙ্গে ঋতুপর্ণা বাইশ বছর আগে লিভ টুগেদার করেছিলেন।

ঋতুপর্ণা এলেন সোডা, আইসকিউব এবং গ্লাস নিয়ে। টেবিলে একটা প্লেটে কিছু স্ন্যাক্স ছিল আগে থেকে। নিপুণ হাতে জনি ওয়াকারের ছিপি খুলে গ্লাসে ঢেলে দিলেন ঋতুপর্ণা। সোডাওয়াটার এবং তিন টুকরো আইস দিয়ে একটু হাসলেন। আমার লোভ হচ্ছে। কিন্তু নাহ্। এ বয়সে আর কেলেঙ্কারি শোভা পায় না। তবে ওয়াইন আমার রাতের বন্ধু! আমার স্বামী বিদেশী ওয়াইন উপহার পায়। এটা ইতালির জিনিস। স্কচ দিয়ে আমাকে ডাঁট দেখাতে পারবে না কিন্তু!

চন্দ্রনাথ গ্লাস তুলে বললেন, কাল সারারাত ঘুমোইনি। আজ সারাদিনও একটু বিশ্রাম পাইনি।

চিয়ার্স! ঋতুপর্ণা তাঁর গ্লাস দিয়ে চন্দ্রনাথের গ্লাস স্পর্শ করলেন। তুমি তো আমার স্বামীর চেয়েও বেশি ব্যস্ত মানুষ।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, কাল দুপুর রাত থেকে আজ বিকেল অব্দি আমি পুলিশহাজতে ছিলাম।

সে কী! কেন?

খুনের দায়ে।

ঋতুপর্ণা উঠে এসে কাছে বসলেন। রঙ্গনাথন খুন হয়েছে বলছিলে। তুমি খুন করেছ নাকি?

সব বলছি পর্ণা ! আমাকে একটু চাঙ্গা হতে দাও !

ঋতুপর্ণা উত্তেজিতভাবে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, তুমি আমাকেও নোংরা খুনখারাপির ব্যাপারে জড়াবে। পুলিশ তোমার ওপর নজর রেখেছে কি না তুমি নিশ্চিত ?

জানি না।

ঋতুপর্ণা প্রায় আর্তনাদ করলেন, ও ডনি ! এভাবে তোমার আসা উচিত ছিল না। তুমি জানো আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক করি। আমার ইমেজের দাম তোমার জানা উচিত, ডনি !

উত্তেজিত হয়ো না পর্ণা ! আগে সব শোনো।

বলো ! উত্তেজনায় ঋতুপর্ণা চন্দ্রনাথের একটা হাত আঁকড়ে ধরলেন। চিরোল রক্তিম নখ চন্দ্রনাথের কবজির চামড়ায় বিঁধে গেল যেন। তবে চন্দ্রনাথের চামড়া অনুভূতিহীন।

হুইস্কিতে কয়েকটা চুমুক দেবার পর চন্দ্রনাথ শান্ত কণ্ঠস্বরে গতকাল রাত দশটা পনের থেকে যা-যা ঘটেছে, সব বললেন। কিছু গোপন করলেন না। পুলিশ তাঁকে বঙ্গনাথনের লাশ সনাক্ত করতে নিয়ে গিয়েছিল। তা-ও বললেন। তিনি যে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন, তা বলতেও দ্বিধা করলেন না।

ঋতুপর্ণা জোরে শ্বাস ফেলে বললেন, তুমি ওই মহিলার বডি তো তখনও লক্ষ্য করোনি বলছ। শুধু একটা লোককে লিফ্‌ট থেকে বেরুতে দেখেছিলে। কিন্তু দেখামাত্র তাকে গুলি করতে গেলে কেন ?

করিডরের বাঁকে যেতেই দেখি, সে লিফ্‌ট থেকে বেরুচ্ছে। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আসলে ওই মহিলা, মিসেস দাশগুপ্ত আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, কেউ আমাকে খুন করতে আসছে। তাছাড়া লোকটা আমার অচেনা। তাই তাকে দেখামাত্র বিভলভার তাক করেছিলাম। অমনই সে সিঁড়ির দিকে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পালাতে গেল। আমি গুলি ছুঁড়লাম। তাকে মিস করলাম। বলে চন্দ্রনাথ হুইস্কিতে চুমুক দিলেন।

ঋতুপর্ণা সোজা হয়ে বসে বাঁকা হাসলেন। ডনি ! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ওই মহিলা তোমার অচেনা। এটা তোমার বানানো গপ্প। আলবাৎ সে তোমার প্রেমিকা। চালাকি করো না ডনি ! আমি তোমাকে চিনি।

চন্দ্রনাথ কষ্ট করে হাসলেন। আমি বুড়ো হয়ে গেছি পর্ণা ! ভদ্রমহিলা সুন্দরী যুবতী।

কিন্তু তুমি চিরকালের শিকারি, ডনি ! চিরযুবক।

চন্দ্রনাথ একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, আমি সেক্সের জন্য আসিনি।

তুমি নির্বোধ ! অসভ্য ! জানোয়ার !

পর্ণা ! কোনও-কোনও সময় বুঝতে পারি, আমি এত একা ! তাই—

চুপ করো ! তোমার টাকার অভাব নেই। এ বয়সেও তুমি অনায়াসে কোনও তরুণীকে বিয়ে করতে পারো। বলো! তুমি চাইলে আমি আমার অনাথ আশ্রমের কোনও তরুণীর সঙ্গে বিয়ের ঘটকালি করতে পারি। চাও ?

আহ্ ! এই দুঃসময়ে বড্ড বাজে তামাশা করছ !

ঋতুপর্ণা তাঁর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি এখানে সত্যিই রাত কাটাতে এসেছ ?

ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তোমার মেয়ে এসে গেছে।

টিনা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাছাড়া ওকে সেডাটিভ দিয়েছি। ঘুম ভাঙতে দেরি হবে। তুমি খুব ভোরে চলে যেতে পারো। ওয়াইনে চুমুক দিয়ে ঋতুপর্ণা আস্তে ফের বললেন, কোনও-কোনও সময়ে আমিও এত একা হয়ে পড়ি ! জীবনের মানে খুঁজে পাই না। হ্যাঁ, তোমার জন্য ডিনার এনে রেখেছি। দুজনে একসঙ্গে খাব।

তুমি খেয়ে নাও। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

প্রিয় ডনি ! আমার প্রাণ ! ঋতুপর্ণা সহসা সরে এসে চুম্বন করলেন চন্দ্রনাথকে। নাহ্। কোনও কথা শুনব না। তুমি আমার সঙ্গে খাবে।…

চন্দ্রনাথ ক্ষুধার্ত ছিলেন। কিন্তু অন্যমনস্কতা তাঁকে খাদ্যের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করল। ঋতুপর্ণার শরীর বরাবর যেন একই সুরে বাঁধা। মেদহীন, ঋজু এবং শীর্ণ। কড়া প্রসাধনে কৃত্রিম মানবী দেখায় যদিও। মৃদু আলোয় সহসা যুবতী বলে ভ্রম হয়। কিন্তু একটু পরে বয়সের ছাপ ধরা পড়ে যায়। মূল্যবান সেন্ট্ একটা গোপন আর্তি মনে হয়।

খাওয়ার পর রাত-পোশাক পরে এলেন ঋতুপর্ণা। চন্দ্রনাথ একটু দ্বিধার পর তাঁর রাত-পোশাক পরে নিয়েছিলেন ড্রয়িংরুমে। সোফায় প্যাণ্ট শার্ট রেখেছিলেন। ঋতুপর্ণা তা গুছিয়ে রাখলেন। পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললেন, আর হুইস্কি খেও না।

চন্দ্রনাথ হাসলেন। নাহ্। বলে তাঁর স্যুটকেসের ভেতর থেকে সেই ব্লু ফিল্মের ক্যাসেটটা বের করলেন। কাল রাতে পুরোটা দেখা হয়নি। তোমার 'ভি সি আর'-টা আছে তো ?

আছে। তোমার দেখার মতো ফিল্মও আছে। তবে তোমারটা দেখা যাক। একঘেয়ে লাগলে আমার একটা চালিয়ে দেব। ঋতুপর্ণা ক্যাসেটটা নিয়ে টি ভি-র কাছে গেলেন। তারপর ঘুরে বললেন, এটাই কাল রাতে দেখছিলে নাকি ?

হ্যাঁ। রিমোটটা আমাকে দাও। গোড়ার দিকটা বাজে। তেমন কিছু নেই।

ঋতুপর্ণা হাসলেন। তুমি এখনও সেই অভ্যাসটা ছাড়তে পারোনি দেখছি। সরাসরি ঝাঁপ দিতে চাও !

দেখছ তো, দিচ্ছি না। আজকাল আমার শরীর কেন জানি না বরফের

চেয়ে ঠাণ্ডা। আমি আসলে জীবিতদের মধ্যে এক মৃত মানুষ।

ফিল্মটা রিওয়াইণ্ড করে পাশে এসে বসলেন ঋতুপর্ণা। চন্দ্রকান্তের কাঁধে হাত রাখলেন। চন্দ্রকান্ত রিমোটের বোতাম টিপে রিওয়াইণ্ড বন্ধ করে দিলেন। ফাস্ট ফরোয়ার্ডে বোতাম টিপলেন। বললেন, তোমাকে বললাম না? গোড়ার দিকটায় কিছু নেই।

ঋতুপর্ণা শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন, আমারও আজকাল এসব অসহ্য লাগে। কিন্তু অভ্যাস!

চন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বোতাম টিপে পর্দায় দেখে নিচ্ছিলেন কী ঘটছে। হঠাৎ বললেন, এ কী!

কী?

ছেলে-মেয়ে দুটো বদলে গেল। দৃশ্যও আলাদা। ভারতীয় মনে হচ্ছে। লক্ষ্য করো! বাঙালি চেহারা না? অবশ্য একটা ক্যাসেটে শর্ট ফিল্মও থাকে। কিন্তু মেয়েটিকে চেনা মনে হচ্ছে!

ঋতুপর্ণা চমকে উঠলেন। বললেন, ছেলেটিকেও আমার চেনা মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, ও তো রঞ্জন।

তুমি চিনতে পারছ?

হ্যাঁ। রঞ্জন। আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসে মাঝে মাঝে।

চন্দ্রনাথ বললেন, মেয়েটিকে চিনতে পারছি। কাল রাতে যার বডি লিফটে পড়ে ছিল। হ্যাঁ—সেই। চেহারায় তত পরিবর্তন হয়নি। আশ্চর্য! কিন্তু রঞ্জন কে?

বললাম তো! আমার স্বামীর কাছে মাঝে মাঝে আসে। টিনা ওকে পছন্দ করে। একদিন গাড়িতে লিফ্‌ট দিয়েছিল। তুমি তো জানো, আমি আমার স্বামীর বা মেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাই না। তবে টিনাকে ওর সম্পর্কে সাবধান করে দেব। আশ্চর্য! রঞ্জনকে প্রথম দেখার পরই মনে হয়েছিল, বাজে ছেলে।

আমার অবাক লাগছে। জেনিথ ফার্মাসিউটিক্যালসের চিফ এক্সিকিউটিভের স্ত্রী—চন্দ্রনাথ ফিল্ম বন্ধ করে উত্তেজিতভাবে বললেন, পর্ণা! আমি যার দিকে গুলি ছুঁড়েছিলাম, সে তোমার চেনা রঞ্জনই। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মুখটা দেখেছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত। এই ছবিতে যাকে দেখলুম, তারই মুখ আমি দেখেছি। আমি একটা টেলিফোন করতে চাই।

ঋতুপর্ণা তাঁর কাঁধে চাপ দিয়ে বললেন, এই সুন্দর রাতটাকে নষ্ট করো না। সব ভুলে যাও হুইস্কি ঢেলে দিচ্ছি। আমিও এক চুমুক খাব। প্রিয় ডার্লিং! আমার প্রাণ!

চন্দ্রনাথ সিগারেট ধরিয়ে বললেন, এবার বুঝতে পেরেছি ওই শুওরের বাচ্চা

আমার কাছে এই ক্যাসেটটা হাতাতেই আসছিল। মিসেস দাশগুপ্ত জানত তার উদ্দেশ্য কী। তাই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে গ্রাহ্য করছি না বুঝতে পেরে সে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসছিল। লিফ্‌টে ওঠার পর ওই শুওরের বাচ্চা তাকে গুলি করে মুখ বন্ধ করে দেয়। এর পর সে আমার ঘরে আসছিল। আমার হাতে রিভলভার না থাকলে সে আমাকেও গুলি করে—ওঃ!

ঋতুপর্ণা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিলেন। সোডা এবং আইসকিউবসহ চন্দ্রনাথের হাতে গ্লাসটা তুলে দিলেন। তারপর নিজের গ্লাসেও একটু হুইস্কি ঢাললেন।

চন্দ্রনাথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিয়ার্স বলে হুইস্কিতে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, রঞ্জন কেমন করে জানতে পারল এই ক্যাসেটে তার এবং মিসেস দাশ-গুপ্তের মিলনদৃশ্য আছে? রঙ্গনাথন আমাকে ক্যাসেটটা দিয়েছিল। রঞ্জন কি রঙ্গনাথনের পরিচিত? রঙ্গনাথন কি তাকে বলেছিল এই ক্যাসেটটা এখন আমার কাছে আছে?

তুমি চুপ না করলে আমি গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ব ডার্লিং!

অগত্যা চন্দ্রনাথ ঋতুপর্ণার কাঁধে হাত রেখে আলতোভাবে চুম্বন করলেন। বললেন, ঠিক বলেছ। সব কিছু ভুলে যাওয়ার জন্যই তোমার কাছে এসেছি পর্ণা!

ঋতুপর্ণা চন্দ্রনাথের হাত থেকে রিমোটটা নিয়ে সুইচ টিপলেন। একটু হেসে বললেন, রঞ্জনের কীর্তি দেখি। তুমিও দেখ। কোনও-কোনও সময় সেক্স জীবনকে অর্থপূর্ণ করে। প্রকৃতির উপহার। তাই না প্রিয় ডার্লিং?

ইয়া।

দুজনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন। ঋতুপর্ণা চাপা চঞ্চল কণ্ঠস্বরে বললেন, ড্রিঙ্ক শেষ করো শিগগির! আমার ঘুম পাচ্ছে। হুইস্কি আমার সহ্য হয় না। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

কথাটা চন্দ্রনাথ বুঝলেন। ঋতুপর্ণা এই বয়সেও একই আছে। এই আতিশয্যই চন্দ্রনাথের কাছে বাইশ বছর আগে লিভ টুগেদারকে অসহনীয় করে ফেলেছিল। এখন চন্দ্রনাথ নিরুত্তাপ। নিজের শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেছেন দিনে দিনে। হঠাৎ অসহায় বোধ করলেন। কিন্তু ইচ্ছে করেই বাঘিনীর খাঁচায় ঢুকেছেন।

ছবিটা বন্ধ করে ঋতুপর্ণা উঠে দাঁড়ালেন। চন্দ্রনাথকে টেনে ওঠালেন। চন্দ্রনাথ বলতে চাইছিলেন, ক্যাসেটটা বের করে নিই। বলার সুযোগ দিল না। বাঘিনী শিকারের ঘাড় কামড়ে ধরে নিয়ে যেতে চাইছে আড়ালে।

ঠিক সেই সময় টেলিফোন বাজল। ঋতুপর্ণা খাপ্পা হয়ে একটা অশালীন শব্দ উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, রিং হোক। একটু পরে থেমে যাবে।

কিন্তু বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছেন, তখনও রিং হয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রনাথ বললেন, তুমি এখানে আসছ তোমার স্বামী জানেন?

না।

অন্য কেউ?

মলিনা জানে। এখানে এলে তাকে বলে আসি। বিশ্বাসী মেডসারভ্যান্ট। টিনা তার কাছে শুনেই এখানে এসেছে।

মনে হচ্ছে, তোমার মেডসারভ্যান্টের জরুরি ফোন। তা না হলে এখনও রিং হতো না। ফোনটা ধরো।

আমার মেজাজ নষ্ট করে দিল! কী এমন জরুরি যে—আমি মেয়েটাকে তাড়াব।

ফোনটা ধরো। বাইরের ফোন হলে থেমে যেত। তা ছাড়া এখন রাত সাড়ে দশটা বাজে।

ঋতুপর্ণা ফুঁসতে ফুঁসতে ড্রয়িংরুমে গেলেন। চন্দ্রনাথ তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন।

ঋতুপর্ণা ফোন তুলেই ধমকের সুরে বললেন, মলি?

পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সরি টু ডিসটার্ব য়ু ম্যাডাম!

হু দা হেল য়ু আর?

আমি নিউ আলিপুর পুলিশ স্টেশন থেকে অফিসার-ইন-চার্জ শোভন চ্যাটার্জি বলছি। আপনি কি মিসেস ঋতুপর্ণা মুখার্জি?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার? চমকে উঠে ঋতুপর্ণা চন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন।

আপনাকে একটু কষ্ট করে আপনাদের নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে আসতে হবে ম্যাডাম। একটু অপেক্ষা করুন। পুলিশভ্যান পাঠিয়েছি। আপনাকে এবং আপনার মেয়েকে এসকর্ট করে আনবে।

ঋতুপর্ণা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, কেন? কী হয়েছে? পুলিশভ্যান এসকর্ট করতে আসছে কেন?

ডাঃ মুখার্জি—আই মিন, ইওর হাজব্যান্ড ইজ ডেড।

মুহূর্তে ঋতুপর্ণা অস্বাভাবিক শান্ত এবং শক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর ঈষৎ বিকৃত। শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন, ডেড? য়ু মিন—

হ্যাঁ ম্যাডাম! ডাঃ মুখার্জি ফেস্‌ড অ্যান আনন্যাচারাল ডেথ। আই অ্যাম সরি টু—

সুইসাইড করেছে?

হি ইজ মার্ডারড্‌।

হো-য়া-ট? দ্যাটস ইমপসিবল! অনির্বাণকে কে মার্ডার করবে? কেন করবে?

আমি জানি আপনার নার্ভ স্ট্রং। হ্যাঁ, আধঘণ্টা আগে কেউ ওঁকে খুন

করেছে। আপনার মেয়েকে কথাটা বলার দরকার নেই। আপনি অপেক্ষা করুন। পুলিশভ্যান না পৌঁছালে আপনি যেন বেরুবেন না, প্লিজ!

ঋতুপর্ণার হাত থেকে চন্দ্রনাথ ফোন কেড়ে নিয়ে রেখে দিলেন। তারপর দ্রুত প্যাণ্ট-শার্ট পরে নিলেন। রাত-পোশাক স্যুটকেসে ভরলেন। ভি সি আর থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিয়ে এলেন। স্যুটকেসের ভেতর ঢুকিয়ে রিভলভার বের করলেন। অস্ত্রটা প্যাণ্টের পকেটে ভরে একটু ভাবলেন। স্কচের বোতল, সিগারেট প্যাকেট, লাইটার পড়ে আছে। সেগুলো যথাস্থানে ভরে নিয়ে নিজের হুইস্কির গ্লাসটা ডাইনিংয়ের বেসিনে ধুলেন। গ্লাসটা টেবিলে রেখে এসে দেখলেন, ঋতুপর্ণা পাশের ঘরে মেয়েকে জাগানোর চেষ্টা করছেন।

এখন সেণ্টিমেণ্টের প্রশ্ন অবান্তর এবং বিপজ্জনক। পুলিশভ্যান আসছে মা-মেয়েকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে। আর একমুহূর্ত দেরি করা ঠিক নয়। চন্দ্রনাথ বেরিয়ে গিয়ে ডান হাতে পকেটের রিভলভার স্পর্শ করলেন। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে।

নিচের গ্যারাজের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টে তাকালেন। এখনও বাড়িটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি। সামনেটা খোলা এবং স্টোনচিপস, ইট, হরেক সরঞ্জাম এলো-মেলো রাখা আছে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দ্রুত এলাকা ছাড়িয়ে গেলেন চন্দ্রনাথ।

রিভলভারটা বাঁ পাশে সিটের ওপর ফেলে রেখে চন্দ্রনাথ দেববর্মন ড্রাইভ করছিলেন। সল্টলেকের রাস্তা গোলকধাঁধা। কিন্তু তাঁর নখদর্পণে। ই সেক্টরের একটুকরো জমি কেনা আছে। সেখানে কোনোদিনই বাড়ি করবেন না আর ভাল দাম পেলে বেচে দেবেন।

এবং ঠিক এই কথাটা মাথায় এলে কেন যেন তাঁর মনে হলো, বেঁচে থাকার দরকার আছে তাঁর। জীবনের অন্য অনেক রকম মানে আছে। কেউ-কেউ বোঝে না। কেউ-কেউ বোঝে।...

দশ

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার দু'ঘণ্টা ছাদের বাগান পরিচর্যা করে এসে কফি খেতে খেতে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছিলেন। হোটেল কণ্টিনেণ্টাল এবং সানশাইনে দুটো খুনের খবর ছোট্ট করে ছেপেছে। পুলিশ সূত্রের খবর। কাকেও গ্রেফতার করা হয়নি। শুধু দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা জানিয়েছে, সানশাইনের খুনে সন্দেহক্রমে জনৈক ব্যক্তিকে জেরা করা হচ্ছে। দুটো খুনের খবর আলাদা ছাপা।

টেলিফোন বাজল। কর্নেল সাড়া দিলেন। শুভ্রাংশুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কর্নেল সরকার! কাল আপনি রিং করেছিলেন শুনলাম! আমাকে দুপুরে ব্যারাকপুর যেতে হয়েছিল। ফিরেছি প্রায় রাত এগারোটায়। অত রাতে আপনাকে ডিসটার্ব করতে চাইনি।

কর্নেল বললেন, একটা কথা জানতে চেয়েছিলাম।

বলুন স্যার!

আচ্ছা, আপনি রঞ্জন রায় নামে কাউকে চেনেন?

রঞ্জন রায়?

হ্যাঁ। ফিল্মমেকার।

কৈ না তো! এ নামে কোনও ফিল্মমেকারের কথা শুনিনি। তবে ফিল্ম-সার্কেলে আমার কিছু জানাশোনা লোক আছে। খোঁজ নেব?

নিন। আর 'ভিডিওজোন' কথাটা কি আপনার পরিচিত?

কী বললেন? ভিডিওজোন? নাহ্। কী সেটা?

একটা স্টুডিও। মানে, ভি ডি ও ক্যাসেট তৈরি হয় সেখানে।

কোথায় সেটা?

পার্ক স্ট্রিট এরিয়ার একটা গলিতে।

তাই বুঝি? তো স্যার, কোনও ক্লু পেলেন?

কর্নেল হাসলেন। ক্লু বলতে রঞ্জন রায় এবং ভিডিওজোন।

আই সি। আচ্ছা স্যার, তাহলে কি রঞ্জন রায়ই মউকে নিয়ে ব্লু ফিল্ম তুলেছিল?

আপনার কী ধারণা?

আমার তা-ই সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু মউ বলেছিল, হংকংয়ের এক ব্যবসায়ী ওকে ব্ল্যাকমেল করত। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, রঞ্জন রায় এবং সেই ব্যবসায়ীর মধ্যে কোনও যোগাযোগ আছে। তাই না স্যার?

আপনি বুদ্ধিমান মিঃ সোম! আজকের কাগজ দেখেছেন?

এখনও দেখা হয়নি। কেন স্যার?

মধুমিতার খুনের খবরের তলায় আরেকটা খবর আছে দেখবেন। হোটেল কন্টিনেন্টালে হংকংয়ের ব্যবসায়ী রঙ্গনাথন খুন।

বলেন কী! মউ যার কথা বলত—

হ্যাঁ। সেই ব্যবসায়ী। যাই হোক, আপনি আপনার চেনাজানা ফিল্মমহলে রঞ্জন রায় সম্পর্কে খোঁজ নিন। খোঁজ পেলেই আমাকে জানাবেন।

একটা কথা স্যার! রঙ্গনাথন না কী বললেন, তার কাছে কোনও ভি ডি ও ক্যাসেট পাওয়া যায়নি?

নাহ্।

ভেরি মিস্টিরিয়াস ! ক্যাসেটটা তার কাছে থাকা উচিত ছিল। স্যার ! দুটো খুনের মধ্যে লিঙ্ক তো স্পষ্ট।

ঠিক বলেছেন। আপনি বুদ্ধিমান !

রঞ্জন রায় রঙ্গনাথনকে খুন করে ক্যাসেটটা হাতিয়েছে—সিওর।

আমি সিওর নই অবশ্য।

স্যার ! সেই ক্যাসেটে মউয়ের মেলপার্টনার যদি রঞ্জন হয়, তাহলে ?

বাহ্ ! আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান মিঃ সোম ! আপনি মূল্যবান একটা ক্লু ধরিয়ে দিলেন। আমি এটা ভাবিনি। ধন্যবাদ !

আর একটা কথা স্যার ! যাকে হাতে নাতে ধরা হয়েছিল, হ্যাঁ চন্দ্রনাথ দেববর্মন, তার অ্যালিবাই কী ?

পুলিশ নিশ্চয় কোনও স্ট্রং অ্যালিবাই পেয়েছে। তাই পুলিশ রঞ্জন রায়কে খুঁজছে ! আচ্ছা ! রাখছি। আপনি যেন রঞ্জন রায় সম্পর্কে—

সিওর ! কিন্তু স্যার, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

বলুন !

চন্দ্রনাথবাবুর ঘর ভালভাবে সার্চ করা উচিত ছিল পুলিশের।

কেন ?

এমন হতে পারে, মউ তারই কাছে যাচ্ছিল।

হুঁ। কেন যাচ্ছিল বলে আপনার ধারণা ?

আমি সিওর নই। তবে এমন হতেই পারে, মউ জানতে পেরেছিল তার কাছে ওর ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট আছে। বোঝাপড়া করতে যেতেই পারে। আমি ডিটেকটিভ নই কর্নেল সায়েব ! কিন্তু আমার ইনটুইশন বলছে, রঙ্গনাথন এবং চন্দ্রনাথের মধ্যে চেনাজানা থাকা সম্ভব। রঙ্গনাথন চন্দ্রনাথের ঘরে গিয়েই মউকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে ! মউ বোঝাপড়া করতে যাচ্ছিল। সেইসময় তার স্বামী তাকে ফলো করে গিয়ে খুন করেছে। এটা কি সম্ভব নয় ? আপনি একটু ভেবে দেখবেন এটা।

দেখব'খন। রাখছি মিঃ সোম !

ফোন রেখে ঘড়ি দেখলেন কর্নেল। ন'টায় শান্তশীল দাশগুপ্তের কাছে তাঁর যাবার কথা। এখনই বেরুনো উচিত।··

সানশাইনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়া করা হয়েছে। রণধীর সিংহ সিকিউরিটি অফিসে ছিলেন। কর্নেলকে দেখে স্যালুট ঠুকলেন। কর্নেল বললেন, বি ব্লকে মিঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে রণধীর।

চলুন স্যার ! আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ধন্যবাদ রণধীর ! তুমি তোমার ডিউটি করো ! কর্নেল হঠাৎ থেমে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, চন্দ্রনাথ দেববর্মন কি ফিরেছেন ?

হ্যাঁ স্যার। গত রাতে সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফিরেছেন। পুলিশ ও’ ‘গতিবিধি সম্পর্কে খবর দিতে বলেছিল। আমি দিয়েছি।

ঠিক আছে।…

শান্তশীল অপেক্ষা করছিল। ড্রয়িংরুমে কর্নেলকে বসিয়ে বলল, এনি ড্রিংক?

ধন্যবাদ। কফি খেয়ে বেরিয়েছি।

শান্তশীল একটু চুপ করে থাকার পর বলল, আমি বলেছিলাম ‘মৃতেরা কথা বলে না’। আপনি বলেছিলেন, তারা আপনার কাছে কথা বলে। আপনি আমার স্ত্রীর কাগজপত্র খুঁজতে বলেছিলেন। খুঁজে কিছুক্ষণ আগে একটা নেমকার্ড পেলাম। কার্ডটা দেখে যেন মনে হলো, ডেডস সামটাইম রিয়্যালি স্পিক। হ্যাঁ—আপনি রঞ্জন রায় এবং ‘ভিডিওজোন’ বলেছিলেন। সেই কার্ড। এই নিন।

কর্নেল কার্ডটা দেখে পকেটস্থ করলেন এবং চুরুট ধরালেন।

শান্তশীল বলল, তবে এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনাকে কাল ফোন করেছিলাম। বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার এবং সেটা আমার অ্যাপার্টমেন্টেই বলা দরকার। কেন, তার আভাস দিচ্ছি। এই অ্যাপার্টমেন্টে বসলে আমার স্ত্রী সম্পর্কে অনেক কথা স্মরণ হতে পারে, যা বাইরে কোথাও বসে কথা বললে হবে না। কোনও কোনও ঘটনা তুচ্ছ মনে হয়েছে কত সময়। এখন মনে হচ্ছে, সেগুলোর তাৎপর্য ছিল।

সে চুপ করলে কর্নেল বললেন, যেমন?

কিছুক্ষণ আগে বেডরুমের একটা জানালার নিচে—বাংলায় কী যেন একটা কথা আছে, ওই জায়গাটা—ওই যে বনসাই টবটা আছে—

কর্নেল হাসলেন। হুঁ। পুরনো বাংলা শব্দ। ‘গোবরাট’।

হ্যাঁ। গোবরাট। সেখানে একটু ছাই দেখেছিলাম। সিগারেটের ছাই। আমি একসময় বেশি সিগারেট খেতাম। এখন খুবই কম। তাহলেও সিগারেটের ছাই আমি চিনি। আমি ভুলেও সিগারেটের ছাই বাইরে ফেলি না। বেডরুমে সিগারেট খাই না। খেলে এখানে বসে খাই। যাই হোক, মউকে জিজ্ঞেস করিনি। আসলে ব্যক্তিগত জীবনে একটুও ডিসটার্বড হওয়া আমার পছন্দ নয়। তাতে আমার কাজের ক্ষতি হয়।

আপনার স্ত্রী সিগারেট খেতেন না?

নাহ্‌। শান্তশীল আবার একটু চুপ করে থাকার পর বলল, গত সপ্তাহে অফিস থেকে দুপুরে মউকে ফোন করেছিলাম। রিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফোন তুলে বলল, তোমার এই জেকিল-হাইড গেমটা—বলেই ‘হ্যালো। ও! তুমি?’ ইত্যাদি। কর্নেল সরকার ‘তোমার এই জেকিল-হাইড গেমটা’—এই কথাটা

ফোন তুলেই কেন বলবে? তাই না? অন্য কাউকে বলছিল। ডিবেটিং টোন। উত্তেজনা ছিল।

আপনি জিজ্ঞেস করেননি কিছু?

নাহ্। তখন গুরুত্বই দিইনি। গত একমাস ধরে লক্ষ্য করছিলাম একটু হিস্টেরিক টাইপ হয়ে যাচ্ছে মউ। সব সময় নয়। যে রাতে ও খুন হয়ে গেল, ভীষণ শান্ত মনে হচ্ছিল আপাতদৃষ্টে। কথা বলছিল আস্তে। কিন্তু চাপা উত্তেজনা ছিল—সেটা পরে মনে হয়েছে।

কর্নেল চোখ বুজে কথা শুনছিলেন। চোখ খুলে বললেন, জেকিল-হাইড গেম?

হ্যাঁ।

'ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড'! ডুয়াল পার্সোনালিটি!

বইটা পড়েছি। ফিল্মও দেখেছি। শান্তশীল একটা সিগারেট ধরাল। একটু পরে বলল, আমাদের কাজের মেয়েটি—ললিতার আগামীকাল আসার কথা। গতকাল এবং আজ তাকে ছুটি দিয়েছিল মউ। কারণ বহরমপুর যাওয়ার কথা ছিল আমাদের। কাল ললিতা এলে পুলিশ ওকে জেরা করলে জানা সম্ভব, হু ওয়াজ দ্যাট গাই? ললিতার না জানার কথা নয়। সমস্যা হলো, মেয়েটা কোথায় থাকে জানি না। সানশাইন হাউজিং কমিটির নির্দেশ আছে, কাজের লোকেদের ফটো এবং ঠিকানা অফিসে জমা রাখতে হবে। আমি এত ব্যস্ত যে ওসব দিকে মন দিতে পারিনি।

আর কিছু?

শান্তশীল সোজা হয়ে বসল। কর্নেল সরকার! মউয়ের ফিল্ম কেরিয়ারের আমি একটুও বাধা সৃষ্টি করতে চাইনি। সে তা ভাল জানত। কিন্তু বোম্বে থেকে কয়েকবার বড় অফার এলো এবং ওরা বারবার এসে ওকে সেধেছিল। অথচ মউ ওদের মুখের ওপর না করে দিত। ফিল্মসম্পর্কে হঠাৎ একটা যেন প্রচণ্ড অ্যালার্জি। তখন ভাবতাম, সে হাউসওয়াইফ হওয়াটাই প্রেফার করেছে এবং আমার মুখ চেয়েই এটা করেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, দেয়ার ওয়াজ সামথিং রং ইন ইট। কোনও তিক্ত—কুৎসিত অভিজ্ঞতা।

মিঃ দাশগুপ্ত! আপনাকে কাল ব্লু ফিল্মের কথা বলেছিলাম!

হ্যাঁ। আমি তখন বিশ্বাস করিনি আপনার কথা। এখন ঠিক ওই কথাটা আমিই আপনাকে বলছি। ব্লু ফিল্ম অ্যান্ড ব্ল্যাকমেলিং।

আপনাকে একটা ড্রাগের কথাও বলেছিলাম!

শান্তশীল তাকাল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, আমি কোম্পানির কেমিস্ট ডিপার্টমেন্টের চিফ ডঃ রণেন্দ্র বোসের সঙ্গে কথা বলেছি। হি ইজ এ ফেমাস মেডি-ক্যাল সায়েন্টিস্ট। আন্তর্জাতিক সুনাম আছে। উনি বললেন, ওরকম ড্রাগ

আছে। তরল পদার্থে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়। হ্যালুসিনেটরি পার্সেপশন তৈরি করে ব্রেনের নার্ভে। এক মিনিট! পেটেন্টের ছদ্মনাম বলছি। বলে সে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে দিল কর্নেলকে।

কর্নেল পড়ে বললেন, নাইটেক্স থি!

সেডাটিভ ওষুধ লেখা থাকে। কিন্তু অ্যাকচুয়্যালি নিছক ঘুমের ওষুধ নয়। চোরাপথে হংকং থেকে এ দেশে আসে।

কর্নেল হাসলেন। হংকং শব্দটা বলতেই এখন আমার কাছে রঙ্গনাথন।

আমার কাছেও। বাট হু ইজ দিস গাই রঞ্জন রায়?

পুলিশ খুঁজছে তাকে। দেখা যাক। আমি উঠি মিঃ দাশগুপ্ত।

শান্তশীল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার যেন আরও কিছু বলার কথা ছিল। মনে পড়ছে না।

মনে পড়লে জানাবেন। তবে আমার মনে হচ্ছে, আপাতত এই যথেষ্ট।…

কর্নেল নমস্কার বিনিময় করে বেরিয়ে এলেন। তারপর ই ব্লকের দিকে হাঁটতে থাকলেন। বাড়িটা নির্জন নিঝুম হয়ে আছে। দোতলার ন'টা ঘরের কর্মীরা এখন কাজে চলে গেছে। অটোমেটিক লিফটে তিনতলায় পেঁছোলেন। সেই কুকুরটার হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। কর্নেল করিডর ঘুরে সোজা এগিয়ে ১৩ নম্বরে নক করলেন।

প্রথমে আইহোলে একটা চোখ। তারপর চেন আটকানো দরজা একটু ফাঁক হলো। মঙ্গলোয়েড চেহারার একটা মুখ। শীতল চাহনি।

কর্নেল তাঁর নেমকার্ড এগিয়ে দিলেন। চন্দ্রনাথ বাঁ হাতে সেটা নিয়ে দেখার পর বললেন, ইয়া?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনার ডানহাতে একটা ফায়ার আর্মস আছে মিঃ দেববর্মন! তবে আপনি আমার এই সাদা দাড়ি টেনে দেখতে পারেন, এটা রঞ্জন রায়ের ছদ্মবেশ নয়। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

আমি ব্যস্ত।

প্লিজ মিঃ দেববর্মন! আপনি বরং লালবাজারের ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ি কিংবা আপনাদের সিকিউরিটি অফিসার রণধীর সিংহকে ফোন করে আমার সম্পর্কে খোঁজ নিতে পারেন।

কী চান আমার কাছে?

রঞ্জন রায় সম্পর্কে কথা বলতে চাই।

তাকে আমি চিনি না।

ওয়েল মিঃ দেববর্মন, অনেক সময় আমরা জানি না যে আমরা কী জানি। আপনি যে এখনও বিপন্ন, তা ভুলে যাবেন না।

চন্দ্রনাথ একটু ইতস্তত করে দরজা খুলে বললেন, ওকে! কাম ইন!

কর্নেল ভেতরে ঢুকলে চন্দ্রনাথ দরজা লক করলেন। চন্দ্রনাথের হাতে খুদে আগ্নেয়াস্ত্র। ইশারায় সোফায় বসতে বললেন। তারপর একটু দূরে একটা চেয়ারে বসে বললেন, আপনি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল ?

হ্যাঁ। তবে রহস্য জিনিসটা আমাকে টানে। রহস্য ভেদ করা আমার একটা হবি। আপনার জীবনে সদ্য যা ঘটেছে, তা কি একটা জটিল রহস্য নয় ?

ইয়া।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জেবলে একটু হেসে বললেন, রঞ্জন রায় জানে আপনার কাছে একটা ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট আছে। আমার ধারণা, ওটা মিঃ রঙ্গনাথন আপনাকে দিয়েছিলেন !

ইয়া।

আমার আরও ধারণা, ওই ক্যাসেটে মিসেস দাশগুপ্ত এবং তার মেল পার্টনারের ছবি আছে।

ইয়া।

অ্যান্ড দা মেলপার্টনার ইজ রঞ্জন রায় ?

ইয়া।

আমি রঞ্জন রায়কে একবার দেখতে চাই।

চন্দ্রনাথ কষ্ট করে হাসলেন। আপনি কি কখনও ব্লু ফিল্ম দেখেছেন ?

নাহ্। কিন্তু প্রয়োজন আমাকে দেখতে বাধ্য করবে। প্লিজ স্টার্ট ! ··

এগারো

রঞ্জন-মধুমিতার এপিসোড মাত্র একমিনিট দেখেই কর্নেল বললেন, স্টপ ইট প্লিজ ! দ্যাটস এনাফ।

ক্যাসেট থামিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, এই ছবির রঞ্জন রায়কেই আমি দেখেছিলাম। সিওর।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, স্বীকার করছি আপনি দুঃসাহসী মানুষ মিঃ দেববর্মন ! কিন্তু রঞ্জন এখন মরিয়া। আপনি আপনার ফায়ারআর্মসের ওপব বড্ড বেশি নির্ভর কবছেন। সে-রাতে রঞ্জন তৈরি হয়েই আসছিল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তার হাতে গুলিভরা পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের ফায়ার-আর্মস রেডি ছিল। কিন্তু আপানি দুটো কারণে বেঁচে গেছেন। প্রথম কারণ, সে আপনাকে হঠাৎ ১০ নং অ্যাপার্টমেন্টের সামনে লিফটের মুখোমুখি দেখার আশা করেনি। দ্বিতীয় কারণ, কুকুরের চেঁচামেচি। সে পেশাদার খুনী নয়। তাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তখন তার দিকে আপনার ফায়ারআর্মসের নল। আত্মরক্ষার সহজাত বোধে সে সেই মুহূর্তে সিঁড়ির

দিকে ঝাঁপ দিয়েছিল। আপনি দৈবাৎ বেঁচে গেছেন। হ্যাঁ—এখানে গুলির লড়াই করার হিম্মত রঞ্জনের ছিল না। এটা একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। নিচে সিকিউরিটি গার্ডরা টহল দিয়ে বেড়ায়।

চন্দ্রনাথ শীতল কণ্ঠস্বরে বললেন, আপনি কী বলতে চান?

রঞ্জন এখন মারয়া এবং এই ক্যাসেটটাই আপনার পক্ষে ভীষণ বিপজ্জনক। এটা আপনি আমাকে দিতে না চান, এখনই পুলিশকে দিন। আমি পুলিশকে ডাকছি।

পুলিশ আমাকে ফাঁসাবে। আপনি জানেন, এ সব ক্যাসেট বে-আইনি।

কর্নেল হাসলেন। বে-আইনি! কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জঘন্য বে-আইনি কাজ নরহত্যা। আফটার অল, আপনি আসলে পুলিশকে সহযোগিতা করছেন। তাই না? মিঃ দেববর্মন! আপনার গায়ে আঁচড় লাগতে আমি দেব না। সব দায়িত্ব আমার। আমার ওপর নির্ভর করুন।

একটু ভেবে নিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, ও. কে। বাট ফার্স্ট লেট মি টক টু সিকিউরিটি অফিসার।

চন্দ্রনাথ সিকিউরিটিতে ফোন করে রণধীরকে এখন আসতে বললেন। কর্নেল বুঝতে পারছিলেন, এই লোকটি পোড়খাওয়া এবং নানা ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। তাই খুব সাবধানী।

কিছুক্ষণ পরে দরজায় কেউ নক করল। চন্দ্রনাথ উঠে গিয়ে আইহোলে দেখে নিলেন। তারপর দরজা খুলে রণধীরকে ভেতরে ঢোকালেন। রণধীর উদ্বিগ্নমুখে বললেন, এনিথিং রং স্যার!

চন্দ্রনাথ বললেন, এই ভদ্রলোককে আপনি চেনেন?

রণধীর ঢুকেই কর্নেলকে দেখে স্যালুট ঠুকেছিলেন। বললেন, হ্যাঁ। উনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

উনি পুলিশকে ফোন করতে চান।

পুলিশ চিফরা ওঁকে সম্মান করেন স্যার! এমন কি সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের বহু ডিপার্টমেণ্টের চিফরাও ওঁর হেল্প নেন।

চন্দ্রনাথ কর্নেলকে বললেন, ও কে! আপনি ফোন করুন। মিঃ সিংহ! আপনি একটু বসুন।

কর্নেল ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ির কোয়ার্টারে ফোন করলেন। লালবাজার গোয়েন্দা দফতরের অফিসাররা এগারোটার পর অফিসে যান। ফোনে সাড়া পেয়ে বললেন, অরিজিৎ! আমি সানশাইন থেকে বলছি।

হাই ওল্ড বস! নতুন কিছু বাধালেন নাকি? গতরাতে আবার এক কেলো নিউ আলিপুরে—

রঞ্জন রায়?

হ্যাঁ। সাম ডাক্তার অনির্বাণ মুখার্জিকে তাঁর বসার ঘরে শুইয়ে দিয়ে পালিয়েছে। মাথায় গুলি। ওঁর মেড সারভ্যাণ্ট প্রত্যক্ষদর্শী। সে রঞ্জনকে চেনে। গুলির শব্দ শুনে ছুটে এসেছিল মেয়েটি। রঞ্জনকে পালিয়ে যেতে দেখেছে। তাকে সে চেনে।

ডাঃ অনির্বাণ মুখার্জি কি ডেড?

স্পট ডেড।

অরিজিৎ! আমি সানশাইনে মিঃ চন্দ্রনাথ দেববর্মনের ঘরে আছি। একটা ভিডিওক্যাসেট তোমাদের হাতে তুলে দিতে চাই। ওতে রঞ্জনের ছবি আছে। এই ক্যাসেটটা নিতে আমার চেনা কোনও রেসপনসিবল অফিসার পাঠাও। কুইক ডার্লিং! রঞ্জন মরিয়া, মাইণ্ড দ্যাট! বিশেষ করে নিউ আলিপুরের ঘটনা শুনে মনে হচ্ছে, সে চূড়ান্ত ডেসপারেট হয়ে উঠেছে। আর একটা কথা। ক্যাসেট নিতে যাঁকে পাঠাবে, তিনি যেন পুলিশ ড্রেসে আসেন। উইথ আর্মস।

কর্নেল ফোন রাখলে চন্দ্রনাথ আস্তে বললেন, আপনি কার সঙ্গে কথা বললেন,?

ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ি।

নিউ আলিপুরের ডাক্তার মুখার্জিকে আমি চিনি। নাইস ম্যান। তাঁকে বাস্টার্ড রঞ্জন খুন করল কেন?

কর্নেল সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রণধীরকে বললেন, তুমি এখনই কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ড এই ব্লকের সামনে মোতায়েন করো। দুজন গার্ড নিচে লিফটের সামনে থাকে যেন। পুলিশ আসবে উর্দিপরে। সাদা পোশাকের কেউ যেন পুলিশ পরিচয় দিয়ে এই ব্লকে ঢুকতে না পারে।

রণধীর সিকিউরিটি অফিসে ফোন করে বললেন, আমি নিজে বরং লিফটের সামনে থাকছি।

বাট উইথ আর্মস!

ইয়েস স্যার! আই হ্যাভ মাই আর্মস।

স্যালুট করে বেরিয়ে গেলেন সিকিউরিটি অফিসার রণধীর সিংহ। তারপর চন্দ্রনাথ ভি সি পি থেকে ক্যাসেটটা বের করলেন। কর্নেল বললেন, ক্যাসেটটা একটু দেখতে চাই মিঃ দেববর্মন!

চন্দ্রনাথ ক্যাসেটটা দিলেন। কর্নেল সেটা দেখেই বললেন, মাই গুডনেস!

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, কী?

ক্যাসেটটার নাম 'ডেডস ডু নট স্পিক!' আশ্চর্য তো!

মোটেও আশ্চর্য নয় কর্নেল সরকার! সব ব্লু ফিল্মের ক্যাসেটের এ রকম অদ্ভুত নাম হয়। হরর ফিল্মের সঙ্গে মানানসই নামই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয়। প্রথমে কিছু সেই রকম ঘটনা থাকে। তারপর সেক্স সিন এসে পড়ে।

আমি একটা ব্লু ফিল্ম দেখেছিলাম 'দা নেকেড আই' নামে। অর্থহীন নাম। কিন্তু চমক আছে। কিংবা ধরুন, 'দা ফ্লাইং কার্পেট'। অর্ধেকটা অব্দি দেখেও বোঝা যায় না সেক্স সিন আছে।

কর্নেল বললেন, আমি একটা ফোন করতে চাই। আর্জেণ্ট!

করুন।

কর্নেল শান্তশীলের নাম্বার ডায়াল করলেন। সাড়া এলে বললেন, আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।

বলুন!

আপনি বলেছিলেন আমাকে 'ডেডস ডু নট স্পিক।' তাই না?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার?

কথাটা আপনি কোথাও পড়েছিলেন, নাকি—

মে বি ইটস আ ফ্রেজ। মনে পড়ছে না।

একটু ভেবে বলুন। দিস ইজ আর্জেণ্ট মিঃ দাশগুপ্ত!

সময় লাগবে।

আচ্ছা মিঃ দাশগুপ্ত, কথাটা আপনার স্ত্রীর মুখে শোনেন নি তো?

অ্যাঁ?…হ্যাঁ, হ্যাঁ। দ্যাটস রাইট। এক দিন রাতে আমি কম্পিউটাররুম থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। সেই সময় মউ টেলিফোনে কথা বলছিল। ওই কথাটা তার মুখেই শুনেছিলাম। তবে আপনাকে বলেছি, মউকে আমি—

থ্যাঙ্কস। রাখছি। বলে টেলিফোন রেখে কর্নেল একটা চুরুট ধরালেন। একটু হেসে চন্দ্রনাথকে বললেন, এটাই একটা পয়েণ্ট মিঃ দেববর্মন! অনেকসময় আমরা জানি না যে আমরা কী জানি। বাই দা বাই, আপনি তো অনেক ভিডিও ক্যাসেট দেখেছেন। এই ক্যাসেটের প্রিণ্ট সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

এটা ওরিজিন্যাল প্রিণ্ট নয় তবে ভাল প্রিণ্ট। প্রথম অংশটা—ইয়াঙ্কি বয় এবং তার গার্লফ্রেণ্ডের এপিসোডও ওরিজিন্যাল প্রিণ্ট নয়। হংকংয়ের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তোলা। লোকেশানটা আমার চেনা।

হংকং গিয়েছিলেন নাকি?

ইয়া। চন্দ্রনাথ সিগারেট ধরিয়ে বললেন, কজওয়ে বে-র ধারে তোলা ছবি। 'টাইগার বাম গার্ডেনসের' একটা অংশ দেখা যায়। এই গার্ডেনসের মালিক অ বুন হ। মলম বেচে কোটিপতি হওয়া লোক। ওকে য়ুরোপীয়ানরা বলে 'টাইগার বাম কিং'। বি এ এল এম বাম। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? ছবিতে উল্টোদিকের 'হ্যাপি ভ্যালি রেসকোর্স' দেখেছি। লোকেশানটা আমার পরিচিত। অবশ্য সেক্স সিন স্টুডিওতে তোলা।

মিঃ রঙ্গনাথনের আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন?

ইয়া। আপনি শুনে থাকবেন আমার মার্কেটিং রিসার্চের কারবার আছে।

একটা কোম্পানির কাজ নিয়ে গিয়েছিলাম। রঙ্গনাথনের বাড়িতে ছিলাম। শেক-ও বিচের ধারে ওর বাড়ি। রঙ্গনাথন ওয়াজ এ বিলিওনেয়ার। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা আছে ওর।

কর্নেল হাসলেন। কাজেই তিনি কাউকে দশ হাজার টাকার জন্য ব্ল্যাকমেল করতে কলকাতা আসবেন কেন?

চন্দ্রনাথ তাকালেন। ব্ল্যাকমেল? রঙ্গনাথন ব্ল্যাকমেল করবে কোন দুঃখে? তবে সে ছিল হাড়ে হাড়ে ব্যবসায়ী। আরব দেশগুলোতে ভারতীয় যুবক-যুবতীকে নিয়ে তোলা ব্লু ফিল্মের চাহিদা আছে। এ কথা সে আমাকে বলে-ছিল। আপনি জানেন ভারত থেকে আরব কাছে এবং হংকং থেকে দূরে। কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে আরব হংকং থেকে খুবই কাছে। নেক্সট্‌ডোর নেবার।

কথা বলে সময় কাটাতে চেয়েছিলেন কর্নেল। চন্দ্রনাথকে যতটা শীতল দেখায়, তিনি তত শীতল নন। ইংরেজিতে যাদের বলা হয় 'গুড টকার' সেই রকম মানুষ। কর্নেলের মনে হচ্ছিল, তবু লোকটির জীবনে কোথাও একটা ক্ষত আছে। সেই ক্ষত তাঁকে নিঃসঙ্গ এবং শীতল করে ফেলে মাঝে মাঝে।

প্রায় আধঘন্টা পরে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ হাজরা এলেন পুলিশের পোশাকে। সঙ্গে দু'জন আর্মড কনস্টেবল। 'ডেডস ডু নট স্পিক' নামের ভিডিও ক্যাসেটটা নিয়ে গেলেন।

চন্দ্রনাথকে সাবধানে থাকতে বলে কর্নেল তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরলেন ট্যাক্সি চেপে। ড্রয়িংরুমে ফ্যান চালিয়ে ইজিচেয়ারে বসেই বললেন, ষষ্ঠী! কফি।

টুপি খুলে টাকে হাওয়া খেতে খেতে কর্নেল ভাবলেন, শুভ্রাংশুর কথায় চন্দ্রনাথ দেববর্মনের দিকে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলেন। ঢিলটা লেগে গেছে। শুভ্রাংশু সত্যিই বুদ্ধিমান। তার হিসেব কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল।

শুভ্রাংশুকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওর বোনকে জানিয়ে রাখা উচিত, সে বাড়ি ফিরলেই যেন কর্নেলকে রিং করে কিংবা সোজা চলে আসে।

কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর সাড়া এল। কর্নেল বললেন, সুস্মিতা?

হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

দাদার সঙ্গে কথা বলবেন তো? দাদা অফিস থেকে একটু আগে ফিরে এসে ছিল। ওকে ডিমাপুরে ট্রান্সফার করেছে। সব গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। আপনাকে রিং করেছিল। পায়নি।

ও! আচ্ছা! কীসে গেল? প্লেনে নিশ্চয়?

হুঃ, কোম্পানি ওকে অত টাকা দেবে, তা হলেই হয়েছে। ট্রেনে যাবে। কোন ট্রেন আমি জানি না। রাখছি।...

ষষ্ঠী কফি আনল। কর্নেল বললেন, আমাকে কেউ ফোন করেছিল?

ষষ্ঠী নড়ে উঠল। কাঁচুমাচু মুখে বলল, ওই যাঃ! বলতে ভুলে গেছি। একটা ফোং এয়েছিল বটে। কিন্তু নাম বলল না। আপনি নেই শুনেই ছেড়ে দিল।...

তা হলে শুভ্রাংশু ট্রান্সফার অর্ডার ঠেকাতে পারল না! মউ বেঁচে থাকলে —কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'ডেডস ডু নট স্পিক।' মৃতেরা কথা বলে না।

ষষ্ঠী যেতে যেতে ঘুরে বলল, আজ্ঞে বাবামশাই?

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, তোর মুণ্ডু!

ষষ্ঠীচরণ বেজার হয়ে চলে গেল কিচেনের দিকে। কর্নেল চুপচাপ কফি খাওয়ার পর চুরুট ধরালেন। রঞ্জন তার চালে একটা গুরুতর ভুল করল কেন? একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রঙ্গনাথনকে সে ওই ভি ডি ও ক্যাসেটটা আগেই বিক্রি করেছিল। রঙ্গনাথন বিদেশে তার প্রিণ্ট বিক্রি করেছেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। একটা প্রিণ্ট রঞ্জনের প্রাপ্য ছিল। হোটেল কণ্টিনেণ্টালের ম্যানেজারের বিবরণ অনুসারে রঙ্গনাথন এবার কলকাতা আসেন ২৭ মার্চ সন্ধ্যায়। প্রিণ্টটা রঞ্জনের জন্যই এনেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে রঞ্জন যাওয়ার আগেই রঙ্গনাথন প্রিণ্টটা তাঁর বন্ধু চন্দ্রনাথকে দেখার জন্য দেন। চন্দ্রনাথ থাকেন সানশাইনে, যেখানে মউ থাকে। এবার রঙ্গনাথন রঞ্জনকে বলে থাকবেন —নিশ্চয় বলেছিলেন, ওটা একজনকে একদিনের জন্য দেখতে দিয়েছেন। রঞ্জন জানতে চাইতেই পারে, কাকে ওটা দেওয়া হয়েছে। কারণ কলকাতায় তার সেক্স সিন দেখানোর ঝুঁকি আছে। দৈবাৎ এমন কারও চোখে পড়তে পারে, যে রঞ্জনকে চেনে। কাজেই রঞ্জন রঙ্গনাথনের কাছে কাকে ক্যাসেট দেওয়া হয়েছে, তার নাম জানতে চাইবে এটা স্বাভাবিক। রঙ্গনাথন অত ভাবেননি। চন্দ্রনাথের নাম ঠিকানা দেন! রঞ্জন শোনামাত্র উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। বি ব্লকের পিছনেই ই ব্লক!

হ্যাঁ। এই ডিডাকশনের যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ।

আর একটা ব্যাপার স্পষ্ট। মউকে যখন সে ব্ল্যাকমেল করত, তখন ক্যাসেট তার হাতে ছিল না। এবার ক্যাসেট এসে গেছে। অতএব টাকার অঙ্ক বাড়ানো যায়। রঞ্জন ২৮ মার্চ সন্ধ্যা থেকে শান্তশীল ফিরে না আসা পর্যন্ত মউয়ের কাছে ছিল। পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করতেই গিয়েছিল এবং ক্যাসেট যে পাশের ই ব্লকে চন্দ্রনাথের কাছে আছে, তা-ও বলেছিল। চন্দ্রনাথের জবানবন্দিতে এটা জানা গেছে। মউ বুঝতে পেরেছিল। রঞ্জন তার কাছে টাকা না পেয়ে রুষ্ট এবং চন্দ্রনাথের কাছ থেকে ক্যাসেটটা যে-কোনও ভাবে আদায় করে এবার উল্টে শান্ত-শীলকেই ব্ল্যাকমেল বরবে। শান্তশীল স্ত্রীর সম্মান রক্ষার জন্য বাধ্য হবে রঞ্জনের দাবি মেনে নিতে। কিন্তু মউ নিজের সম্মান বাঁচাতে নিজেই তৎপর হয়ে উঠেছিল। চন্দ্রনাথকে ফোনে সাবধান করিয়ে দিয়ে শেষে ঝুঁকি নিয়েই ই ব্লকে

ছুটে গিয়েছিল। বেগতিক দেখে মরিয়া রঞ্জন তাকে মেরে মুখ বন্ধ করে দেয়। ডেডস ডু নট স্পিক। এবার তার ব্ল্যাকমেলের শিকার হতো শান্তশীল দাশগুপ্ত।

কর্নেল তাঁর এই তত্ত্বে নিশ্চিত হলেন। কোনও ফাঁক নেই ঘটনার এই ছকে। রঞ্জন জানত না চন্দ্রনাথ কেমন প্রকৃতির লোক এবং তাঁর হাতে ফায়ার আর্মস রেডি! প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার পর রঞ্জন একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিল।

মরিয়া এবং দিশেহারা রঞ্জনের পক্ষে এই ভুল স্বাভাবিক। ভুলটা হলো রঙ্গনাথনকে হত্যা।

চন্দ্রনাথ রঞ্জনকে দেখে ফেলেছিলেন। রঞ্জন আশঙ্কা করেছিল, চন্দ্রনাথ তাঁর হংকংবাসী বন্ধু রঙ্গনাথনকে জানিয়ে থাকবেন, তাঁর দেওয়া ক্যাসেটের পুরুষ-চরিত্র সশরীরে তাঁকে খুন করার জন্য হানা দিয়েছিল এবং সে তার ফিমেল পার্টনারকে হত্যাও করেছে। কর্নেলের মনে পড়ল, হোটেল কন্টিনেন্টালে রঙ্গনাথনের সুইটে দুটো মদের গ্লাস উল্টে পড়েছিল কার্পেটের ওপর। তার মানে, তর্কাতর্কি থেকে একটু হাতাহাতি, তারপর—

রঙ্গনাথন কি তক তর্কির সময় রঞ্জনকে শাসিয়েছিলেন, তাই রঞ্জন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তাঁকে গুলি করে?

আবার সেই কথাটা এসে পড়ছে, 'মৃতেরা কথা বলে না।'

কিন্তু কার্পেটে পড়ে থাকা দুটো মদের গ্লাস কথা বলছে। বলছে হাতাহাতি হয়েছিল।

কর্নেল টেলিফোন তুলে অরিজিৎ লাহিড়িকে অফিসে ফোন করলেন। অরিজিৎ! একটা কথা জানতে চাইছি।

বলুন বস্! সি পি-র ঘরে কনফারেন্স। একটু তাড়া আছে।

হোটেল কন্টিনেন্টালে রঙ্গনাথনের সুইটে 'নাইটেক্স থি' নামে কোনও ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল পাওয়া গেছে?

রঙ্গনাথনের বডির পাশে ইজিচেয়ারের তলায় দশটা ক্যাপসুলের একটা ফাইল পড়ে ছিল। আমাদের ড্রাগএক্সপার্টরা বলেছেন ঘুমের ওষুধ।

ফোরেন্সিক ল্যাবে পাঠাও। ওটা ঘুমের ওষুধ নয়। আর—ক্যাসেটটা

পেয়ে গেছি।

ক্যাসেট থেকে রঞ্জন রায়ের একটা ছবি প্রিন্ট করিয়ে—শুধু মুখের ছবিই যথেষ্ট, ছবিটা সব দৈনিক কাগজে 'ওয়ান্টেড'-এ হেডিং ছাপানোর ব্যবস্থা করো। কালকের কাগজেই যেন বেরোয়।

ও কে বস্।...

ফোন রেখে কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। তা হলে নিশ্চিত হওয়া গেল। 'নাইটেক্স থি' রঞ্জনকে যোগাতেন রঙ্গনাথন। তাঁকে মেরে রঞ্জন তাড়াহুড়োয় যতটা পারে হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

বিকেলে কর্নেল ছাদের বাগান পরিচর্যা করছিলেন। ষষ্ঠীচরণ গিয়ে বলল, বাবামশাই ফোং।

অন্য সময় হলে বিরক্ত হয়ে ভেংচি কাটতেন। এখন একটা ঘটনার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন। দ্রুত নেমে এসে সাড়া দিলেন। চন্দ্রনাথ দেববর্মন ইংরেজিতে বললেন, আপনাকে বলার দরকার মনে করিনি। এখন বলতে হচ্ছে। নিউ-আলিপুরের ডাঃ অনির্বাণ মুখার্জির স্ত্রী ঋতুপর্ণা আমার পরিচিত। এইমাত্র সে আমাকে জানাল, সেই জারজসন্তান রঞ্জন টেলিফোনে তাকে হুমকি দিয়েছে। তার মেয়ে টিনার একটা ব্লু ফিল্ম নাকি রঞ্জনের কাছে আছে। এক লাখ টাকা নগদ পেলে সে ক্যাসেটটা ফেরত দেবে। আর নমুনা-স্বরূপ একটা সেক্স সিনের স্টিল ছবি ইতিমধ্যেই লেটার বক্সে রেখে এসেছে। ঋতুপর্ণা আমাকে বলল, লেটার বক্সে সত্যিই খামের ভেতর টিনার ছবি পেয়েছে। তবে মেলপার্টনারের পেছন দিক দেখা যাচ্ছে। তাই তাকে চেনা যাচ্ছে না।

মিসেস মুখার্জি তাঁর মেয়েকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি?

করেছে। টিনা শুধু কাঁদছে। খুলে কিছু বলছে না। কাজেই ব্যাপারটা সত্য।

কখন কোথায় টাকা দিতে হবে রঞ্জন বলেছে?

বলেছে। একটা ঠিকানা দিয়েছে। বেলসুইট টিপলে একটি মেয়ে দরজা খুলবে। তার পরনে থাকবে জিনস-ব্যাগি শার্ট। ঘরে ঢুকে তাকে টাকা গুনে দিতে হবে। সে ক্যাসেটটা ফেরত দেবে। ইচ্ছে করলে ক্যাসেট চালিয়ে দেখে নিতে পারে ঋতুপর্ণা। কিন্তু মেয়েটিকে পুলিশের হাতে দিয়ে লাভ হবে না। মেয়েটি কলগার্ল। সে-ও জানে না রঞ্জন কোথায় আছে এবং কখন টাকা নিতে আসবে। হ্যাঁ। রঞ্জন আরও বলেছে, মেয়েটিকে ধরিয়ে দিয়েও লাভ নেই। কারণ ক্যাসেটের আরও প্রিন্ট রঞ্জনের কাছে আছে। সে কথা দিচ্ছে, টাকা পেলে সে সেই প্রিন্টগুলো এদেশে বেচবে না। বিদেশে যাওয়ার জন্যই তার টাকাটা দরকার।

কর্নেল আস্তে বললেন, কখন টাকা নিয়ে যেতে হবে?

রাত ন'টায়।

ঠিকানাটা কী?

ঋতুপর্ণা ফোনে বলেনি। আমাকে পরামর্শের জন্য ডেকেছে। তো আমার মনে হলো, ব্যাপারটা আপনাকে জানানো উচিত। পুলিশ হঠকারী, আমি জানি। তা ছাড়া আজকাল পুলিশের মধ্যে আগের দিনের দক্ষতা দেখি না। মনে রাখবেন আমার বয়স ষাট পেরিয়েছে। আমার যৌবনে পুলিশের যে দক্ষতা—

মিঃ দেববর্মন! আপনি কি ঋতুপর্ণার সঙ্গে যাবেন, যদি উনি টাকা দিতে রাজী হন?

আমি একটু দূরে গাড়িতে অপেক্ষা করলে অসুবিধে কী ?

আপনি যাবেন না প্রিন্স। মিসেস মুখার্জির বাড়িতে অপেক্ষা করবেন।

আমি ওই জারজসন্তানের পরোয়া করি না।

প্রিন্স মিঃ দেববর্মন! রঞ্জন চূড়ান্ত মরিয়া। আমার কথা শুনুন। বাকিটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।

একটু পরে চন্দ্রনাথ বললেন, ও কে। ঋতুপর্ণার বাড়ি থেকে রিং করে আপনাকে ঠিকানাটা জানিয়ে দেব বরং।

কর্নেল হাসলেন। রঞ্জনের দেওয়া ঠিকানাটা আমি সম্ভবত জানি মিঃ দেববর্মন! রাখছি।

চন্দ্রনাথকে আর কথা বলার সুযোগ দিলেন না কর্নেল। পোশাক বদলে এলেন। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। বেরুনোর আগে ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ীকে রিং করলেন। পেলেন না। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে নরেশ ধরকে পাওয়া গেল। নরেশবাবু কর্নেলের কথা শোনার পর মন্তব্য করলেন, হালা ঘুঘু দ্যাখছে, ফান্দ্ দ্যাখে নাই।..

বড় রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি পেতে একটু দেরি হয়েছিল। পাঁচটা বেজে গেছে। সারাপথ জ্যাম। পেঁাছোতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। সংকীর্ণ রাস্তায় দূরে-দূরে ল্যাম্পপোস্ট এবং জোট-বাঁধা-উঁচু-নিচু ফ্ল্যাটবাড়ি। সেই বাড়িটাব তলায় সারবন্ধ দোকান। পানের দোকানে নরেশ ধর পানের অর্ডার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পান মুখে দিয়েই কর্নেলকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে আরও একটু চুন চাইলেন। মিঠাপাতা দিবার কইছিলাম না? তোমাগো কারবার!

কর্নেল দোতলায় উঠে কলিংবেলের সুইচ টিপলেন। ঘরের ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কেউ বলল, কে?

আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকাব।

দরজা একটু ফাঁক হলো। ব্যাগি শার্ট-জিনস পরা আঠারো-উনিশ বছরের একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে, ঠোঁটে গাঢ় রঙ, নকল ভুরু, চোখের পাপড়ি গোনা যায়, দ্রুত বলল, দাদা তো ডিমাপুরে চলে গেছে।

কর্নেল দরজা ঠেলে ঢুকে রিভলভার বের করলেন। শুভ্রাংশু সোম ওরফে রঞ্জন রায়! চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। একটু নড়লেই ঠ্যাং ভেঙে দেব। আমার পেছনে পুলিশ আছে।

মেয়েটি দরজা দিয়ে পালাতে যাচ্ছিল। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর নরেশ ধরের গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। ফান্দে পড়ছ খুকি! হাঃ হাঃ হাঃ! খুব যে সেণ্ট মাখছ দেখি! এইটুকখানি বডিতে কয় গ্যালন সেণ্ট্ ঢালছ? না—না! কান্দে না! অ জগদীশ! মাইয়াডারে লইয়া যাও!

নরেশ ধর ভেতরে ঢুকে আসামির জামার কলার ধরলেন। কর্নেল তার প্যান্টের পকেট হাতড়ে পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের রিভলভারটা বের করে বললেন, রঙ্গনাথনের উপহার মনে হচ্ছে!

রিভলভারের বুলেটকেস খুলে কর্নেল দেখলেন তিনটে গুলি আছে। বাকি তিনটে যথাক্রমে মধুমিতা, রঙ্গনাথন এবং ডাঃ মুখার্জির মাথার ভেতর ঢুকেছে।

সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার কফি খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। রঞ্জনের ছবিটা 'ওয়ান্টেড' শিরোনামে আর ছাপার দরকার হয়নি। তাকে গ্রেফতারের খবর ছোট করে ছাপা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর। দৈনিক সত্যসেবক অবশ্য বিশ্বস্তসূত্রে বিখ্যাত রহস্যভেদী কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কৃতিত্ব উল্লেখ করেছে। গত রাতে ওদের রিপোর্টার ফোন করেছিল। কর্নেল বলেছিলেন, 'নো কমেন্ট।' সেই রিপোর্টারের অভিমানী কণ্ঠস্বর কানে লেগে আছে। 'জয়ন্তদা হলে স্যার অনেক কমেন্ট করতেন এবং একটা এক্সক্লুসিভ স্টোরিও আমরা পেতাম।'

জয়ন্ত চৌধুরি ফিরবে জুন মাসে। বোকা! বোকা! পুরো গরমটা ইউরোপে কাটিয়ে আসা ওর উচিত।

টেলিফোন বাজল। কর্নেল সাড়া দিলেন।

কর্নেল সরকার! আমি শান্তশীল বলছি।

মিঃ দাশগুপ্ত! কাগজে দেখেছেন কি আপনার স্ত্রীর খুনী ধরা পড়েছে?

দেখেছি। কিন্তু যেজন্য আপনাকে ফোন করলাম, বলি। আমাদের কাজের মেয়ে ললিতা এসেছে। খুব কান্নাকাটি করল। আমি ওকে পুলিশের ভয় দেখালাম। চুপ করল তখন। তারপর আমার জেরার জবাবে যা বলল, ভারী অদ্ভুত ব্যাপার! ২৮ মার্চ বিকেল থেকে আমার কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ শুভ্রাংশু সোম এখানে ছিল। ললিতা বাড়ি ফেরে ছ'টায়। ললিতা বলল, দুজনে খুব তর্কবিতর্ক হচ্ছিল। তাছাড়া শুভ্রাংশু প্রায়ই আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসেছে। ললিতা মউয়ের নিষেধ থাকায় আমাকে বলেনি। আই মাস্ট্ ডু সামথিং!

মিঃ দাশগুপ্ত! রঞ্জন রায় আপনার স্ত্রীর খুনী।

"হ্যাঁ, কাগজে তা তো দেখলাম।

রঞ্জন রায় এবং শুভ্রাংশু সোম একই লোক।

হো-য়া-ট?

'ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড' মিঃ দাশগুপ্ত। আপনি মধুমিতা দেবীর মুখে দৈবাৎ শুনেছিলেন, 'তোমার এই জেকিল অ্যান্ড হাইড গেমটা'—যাই হোক, সে আমার হেল্প নিতে গিয়েছিল। আপনার ওপর যাতে সন্দেহ জাগে

এবং সে সেফসাইডে থাকে। অনেক কেসে এভাবে অপরাধীরাই সাধু সাজার জন্য আমার দ্বারস্থ হয়।

মাই গড !

ফিল্মমেকার হিসেবে শুভ্রাংশু 'রঞ্জন রায়' এই ছদ্মনাম নিয়েছিল। দুরকম পেশার জন্য দুটো নাম ! বাই দা বাই, ডাঃ অনির্বাণ মুখার্জির সঙ্গে তার পরিচয় মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে। শুভ্রাংশু স্বীকার করেছে, তাঁর মেয়ে টিনাকে দেখার পর সে ডাঃ মুখার্জিকে তার ফিল্মি নামটা জানিয়েছিল। টিনাকে ফিল্মে অভিনয়ের সুযোগ দেবে বলেছিল। তাই ডাঃ মুখার্জি শুভ্রাংশুকে রঞ্জন রায় বলেই স্ত্রীর এবং মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। টিনা ইজ এ প্রবলেম-চাইল্ড। টিনার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাঁর দুশ্চিন্তা থাকা স্বাভাবিক। তাই ভেবেছিলেন, ফিল্মকেরিয়ার টিনার পক্ষে ভালই হবে।

কিন্তু শুভ্রাংশু ডাঃ মুখার্জিকে মারল কেন ?

একমাত্র তিনিই জানতেন শুভ্রাংশুর আর এক নাম রঞ্জন রায়। তাই শুভ্রাংশু যখন জানল, রঞ্জন রায়ই দু-দুটো খুন করেছে বলে পুলিশ তাকে খুঁজছে, তখন ডাঃ মুখার্জির মুখ বন্ধ করতে তাঁকেও মারল। সে ভেবেছিল, ডেডস ডু নট স্পিক।

লাইন কেটে গেল। কর্নেল বুঝলেন, জেনিথ ফার্মাসিউটিক্যালসের নবীন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শান্তশীল দাশগুপ্ত আবার এতক্ষণে 'ইয়াপি' হয়ে গেল। মৃতদের কথা শুনতে তার আর আগ্রহ থাকার কথা নয়। তার কাছে যারা মৃত, তারা মৃতই এবং মৃতেরা কথা বলে না।···

—ঃ০ঃ—